পদার্থের স্বরূপ



শ্রীসমর গুহ

পদার্থের স্বরূপ

ডক্টর শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি. এস্-সি.
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত

অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ, এম্. এস্-সি.
প্রণীত

AMC

এ, মুখার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড—কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬ সাল

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য—চার টাকা মাত্র

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই খুব কমই লেখা হয়েছে। অধ্যাপক সমর গুহের এই বইখানার পাণ্ডুলিপি প'ড়ে সেজন্য আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেছি। বইখানার নাম দেওয়া হয়েছে "পদার্থের স্বরূপ"—ইংরাজিতে যাকে বলা যেতে পারে—"Conceptions of matter"। এই নাম থেকেই বইখানার বিষয়-বস্তুর অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। যে বিচিত্র বস্তু-পুঞ্জ আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—মানুষের মনে আদিকাল থেকে তার স্বরূপ জান্‌বার আগ্রহ জেগেছে। এই বস্তুরাজির মূল উপাদান কি? মূল উপাদানগুলির প্রকৃতিই বা কি? পার্থিব বস্তু-রাশির নিত্য নব রূপান্তরের মূল রহস্যের মীমাংসা কোথায়? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে-সব পরীক্ষা ক'রে এসেছেন এবং যে সব পরিকল্পনা করেছেন, সেই সব তথ্য ও তত্ত্বের সুন্দর বিবৃতি এই বইখানিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তগুলি লেখক যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের কাছে মনোজ্ঞভাবে উপস্থিত করেছেন। বিষয়ের জটিলতার কথা স্মরণ রাখ্‌লে লেখকের প্রয়াস বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে।

বইখানায় পদার্থের স্বরূপ-সন্ধানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল সিদ্ধান্তগুলিই কেবল যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা নয়। বিজ্ঞানীর মনে একটির পর একটি প্রশ্ন কিভাবে দেখা দিল, তার সমাধানে কি কি পরীক্ষা করা প্রয়োজন হ'ল, তার ফলাফলই বা কি হ'ল, তথ্য এবং তত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষায় কি কি নূতন পরিকল্পনায় পৌঁছতে হ'ল—ত্রুটি ও সংশয়ের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানী কিভাবে আলোর সন্ধানে অগ্রসর হ'লেন—বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও চিন্তাধারার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস এই বইখানিতে পাওয়া যায়। এইখানেই এই বইটির বিশেষত্ব।

বইখানিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই চার ভাগের নাম—

(১) পদার্থের পরিচয়
(২) পদার্থের সংগঠন
(৩) পদার্থের রূপান্তর
(৪) পদার্থের নব পরিকল্পনা

"পদার্থের পরিচয়"-অধ্যায়ে প্রাচীন পঞ্চভূতের কল্পনা থেকে আরম্ভ ক'রে বৈজ্ঞানিক যুগের অণু-পরমাণু-বাদ সাধারণ ভাবে সহজ ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের ভেতর যে এক শৃঙ্খলা বর্ত্তমান সেই শৃঙ্খলার সন্ধানে বিজ্ঞানী এক পর্য্যাবৃত্ত তালিকা (Periodic table) রচনা করলেন। এই তালিকার পরিচয় ও সমালোচনায় পরমাণুবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীর অগ্রগতি বেশ স্থন্দর ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার ও পরিচয় এবং পদার্থের মৌলিক উপাদান ইলেকট্রন ও প্রোটনের আবিষ্কার সম্বন্ধেও আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

"পদার্থের সংগঠন"-অধ্যায়ে বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্তগুলি আলোচনার পূর্ব্বে ভূমিকা হিসেবে বিদ্যুৎ কি, বিদ্যুতের প্রকৃতি কি, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সম্বন্ধ কি এই সব প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাথোড্-রশ্মি ও পজিটিভ্-রশ্মির আবিষ্কার, এদের সঙ্গে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং পদার্থ-সংগঠনে বিদ্যুৎ-কণার স্থান—বিশদভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। পরমাণু-সংখ্যা (atomic number), পরমাণু-কেন্দ্র (nucleus), সমঘর (isotope), নিউট্রন, পজিট্রন ও মেসনের আবিষ্কার, পরমাণু-কেন্দ্রের সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এই অধ্যায়ে আমরা পাই। পরমাণু-সংগঠন সম্পর্কে অনেক আধুনিক সিদ্ধান্তও এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় "পদার্থের রূপান্তর"। রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগিক ও মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি ও বিলোপ এবং সেই সঙ্গে মিলনাঙ্ক (valency) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মিলনাঙ্কের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের সাহায্যেও পরমাণু-সংগঠন সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্বগুলির প্রয়োগে অণু-সংগঠনের ব্যাখ্যাও বিশদভাবে করা হয়েছে। অণুর রূপান্তরের কথার পর পরমাণুর রূপান্তর-সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরম্পরা, তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ুষ্কাল, তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজ বিকিরণ ও তার কারণ আলোচনার পর পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তরের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরমাণু-বিদারণের জন্য সাইক্লোট্রন (cyclotron) যন্ত্র ও তার মূল-নীতির কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। য়ুরেনিয়াম ফিসন্ (Uranium fission) ও পরমাণু-বোমার রহস্য সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা এই অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে। সাধারণ অবিজ্ঞানী পাঠকের কাছে এ আলোচনা যে কৌতূহলপ্রদ ও মনোজ্ঞ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে—"পদার্থের নব-পরিকল্পনা"। এই অধ্যায়টিকে চারটি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—যথা: পদার্থের দ্বৈতরূপ, শক্তি ও পদার্থ, বিশ্ব-পদার্থের সমগ্র পরিমাণ এবং অজানা পদার্থ। এই অধ্যায়ে পদার্থের দ্বৈতরূপ বিশ্লেষণে, পদার্থের কণাতরঙ্গবাদ আলোচিত হয়েছে। ইলেকট্রন-প্রোটনের কণারূপের পরীক্ষা, পদার্থের তরঙ্গরূপের সম্ভাবনায় দ্যব্রোগলির (de Broglie) গবেষণা, জলতরঙ্গের উদাহরণ, তরঙ্গ-বিসরণ ও তরঙ্গ ব্যতিচার (diffraction & interference), রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গরূপ, ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ প্রভৃতির পরীক্ষাগত সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা ক'রে কণাতরঙ্গবাদ বোঝাবার প্রয়াস প্রশংসনীয়ই বল্‌তে হবে। শক্তিকণাবাদ বা কোয়াণ্টাম্‌-তত্ত্ব (quantum theory) ও নব শক্তি-কণাবাদ বা নয়া কোয়াণ্টাম্‌-তত্ত্ব (new quantum theory) কিভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারায় পর পর এসে দাঁড়াল—এ জটিল বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। নূতন তত্ত্বের ফলে বিজ্ঞানের প্রাচীন মতবাদ, কার্য্য-কারণের নিয়ম ও নির্দ্দেশবাদ (causal law and determinism) কিভাবে বর্জ্জিত হ'ল তা'র সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। নব শক্তিকণাবাদ থেকে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা-তত্ত্বের কথাও আলোচিত হয়েছে।

শক্তি ও পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে শক্তি ও পদার্থের বিভিন্নরূপ, শক্তির বিচিত্র রূপান্তর, শক্তি ও পদার্থের সংরক্ষণ প্রভৃতি আলোচনার পর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে শক্তি ও পদার্থের অভিন্ন স্বরূপ ও তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্বের মোট পদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনায় আইনষ্টাইনের পরি-কল্পনা— সসীম ও অনন্ত বিশ্বের পরিচয়, জ্যোতিষ্কলোকের প্রকৃতি ও পরিচয় এবং পদার্থের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কথার অবতারণা করা হয়েছে।

'অজানা পদার্থ'-নামক উপ-অধ্যায়ে পদার্থের মূল স্বরূপ বিজ্ঞানীর অনধিগম্য এবং বিজ্ঞানীর জগতের বহির্ভূত এই কথাটাই বিশেষ ক'রেই বলা হয়েছে। বিজ্ঞানী যে 'প্রকৃতে'র সন্ধান করেন না, 'প্রকাশে'রই প্রয়াসে তিনি ব্যাপৃত—এইটেই হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানীর স্থির বিশ্বাস।

বইখানায় পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনা এক স্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় বইখানার মূল্য খুব বেশী হয়েছে ব'লে মনে করি। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে এই বইখানি বিশেষ স্থান লাভ করবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

লেখক রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারাবাসের দুঃখময় একাকীত্বের তিনি যে সদ্ব্যবহার করেছেন—বইখানি তার সাক্ষ্য দেবে।

এ বইখানি প্রকাশিত হ'লে সুধী-সমাজে এর আদর হবে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই। এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। পরিশেষে পরিভাষা-সম্পর্কে একটি কথা বলা সমীচীন মনে করি। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা একটু পরিবর্তিত ক'রে প্রকাশ করার কথা হয়ত উঠতে পারে। সাহিত্য-পরিষদ্ বিজ্ঞানের যে পরিভাষার খস্ড়া তৈরী করেছেন, মোটামুটি তা অনুসরণ ক'রে চলাই মনে হয় শ্রেয়ঃ। তবে কতকগুলি শব্দ লেখকের নিজস্ব এবং মনে হয় বিশেষ ভাবেই শ্রুতিমধুর ও উপযোগী।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

পরিচয়

এ বইটি লিখি বকসা জেলে। এক সহবন্দীর টেবিল থেকে বিজ্ঞানী হাসের (Hass) একখানি সাধারণ বিজ্ঞানের বই এনে পড়বার সময় এরূপ একটি বই লেখার কল্পনা জাগে। বিজ্ঞানী হাস তাঁর বইটিতে অংকের জটিলতায় না গিয়েও বেশ সহজ ও সরলভাবে বিজ্ঞানের বিষয়টি সাধারণের উপযোগী ক'রে বিবৃত করেছেন। তাঁর লেখায় বিষয়টির মূল গুরুত্ব ও গভীরতা ক্ষুণ্ণ হয়নি বা আধুনিক বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ের আলোচনা সাধারণ পাঠকের বোঝবার পক্ষে কঠিনও হয়নি। বইটি পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে—পদার্থ বা matter-এর অন্তিম কল্পনা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তুটি কি এমনি সহজভাবে বাংলা-ভাষীদের সামনে তুলে ধরা যায় না ?

এ যুগের গতি বিজ্ঞানমুখী। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে প্রগতি-সাধন সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়, যদি কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং অযৌক্তিকতার হাত থেকে জাতির সৃজনশীল মনীষাকে মুক্তি দিতে হয়, তা'হ'লে জাতীয় মনকে বিজ্ঞান মনোভাবাপন্ন ক'রে তোলা প্রয়োজন। কি আধুনিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য, কি সংস্কৃতির বিকাশাকাঙ্ক্ষাকে সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের মূল বিষয়টিকে লোকায়ত সাহিত্যে প্রকাশ করার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলা ভাষায় লোকায়ত বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার দিকে সবেমাত্র সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি পড়েছে। এরই মধ্যে লোকায়ত-বিজ্ঞানের কিছু কিছু বইও লেখা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর মধ্যে কয়েকটি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। বিজ্ঞান-সাহিত্য-পাঠে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে যে আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হচ্ছে তা' বিশেষ আশার লক্ষণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের লোকায়ত রচনার মধ্যে একটা রহস্যপ্রবণতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশ মন্ত্রতন্ত্রের দেশ। ভাল বিজ্ঞানকেও ধ্যান ধারণার মত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় ক'রে তোলার দিকে এ দেশে বহু যুগ-সঞ্চিত একটা সংস্কার রয়েছে। বিজ্ঞান যে একমাত্র পরীক্ষালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বের

উপর নির্ভরশীল এবং যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—এর মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয়তা ও রহস্যময়তার কোন অবকাশ নেই, একথাটি যেন সাধারণ পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারেন বিজ্ঞানের লোকায়ত সাহিত্যরচনায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পদার্থের স্বরূপ বা Conception of matter সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অংকের জটিলতা বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব এবং ধারাবাহিক পরীক্ষণ প্রণালীর বিষয় বাদ দেওয়া হয়নি। পদার্থ বা matter সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক পরিকল্পনাগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরবার সময় speculation বা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে বিজ্ঞানের তাথ্যিক অনুধাবনের পথ থেকে দুর্জ্ঞেয়তার দিকে পাঠকের মনকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও উপসংহারগুলি শুধু লোকায়ত ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক উপসংহারের দার্শনিক বিশ্লেষণ পাঠকের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। Conception of matter বা পদার্থের স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্তগুলির আলোচনায় স্বভাবতই speculation বা দার্শনিক কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার দিকে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ ক'রে আধুনিক বিজ্ঞান বস্তু বা পদার্থের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছে, তা'তে দার্শনিক কল্পনার অনেক অবকাশই রয়েছে। পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কি দার্শনিক ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন তা' দার্শনিকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই বইয়ে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত পদার্থের অন্তিম স্বরূপ সন্ধানে বিজ্ঞানীরা কি কি পরীক্ষা করেছেন এবং পরীক্ষার পর কি কি নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন শুধু ধারাবাহিক ভাবে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনায় অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের বিষয় লেখা হয়েছে যা বাংলা ভাষায় এর আগে হয়নি। সাধারণ পাঠকদের বোঝবার সুবিধার জন্য যে বিষয়টি অল্প কথায় বললেও চলে তাকেও গোড়া থেকে এবং একটু বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের অন্তিম স্বরূপ সম্বন্ধে কি তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছেন বাংলা-ভাষী পাঠকদের সে বিষয়ে পরিচিত করাই এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান-সাহিত্যের বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষাই হওয়া উচিত—দেশের

চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। লোকায়ত বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রচারে এ বইটিও কিছু কাজে লাগবে এই আশা পোষণ করি।

এ বইটি যে সত্যি ছেপে প্রকাশ করা হবে লেখবার সময় ততটা ভাবিনি। জেলখানার কর্মহীন নির্জনতায় সময় কাটানো এক বিষম দায়। জেলে এক সহবন্দীর কাছে বিজ্ঞানের দু'একটি বই পেয়েছিলাম এবং জেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে আরো দু'একটি বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। লেখার সময় তাই গুটিকয়েক বইয়ের সম্বল ছাড়া অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সহায়তা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও বইটি লেখবার অজুহাতে জেলের কর্মহীন একটানা সময়ের কয়েকটা মাস বেশ ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দেবার সুযোগ হয়েছিল। সময় কাটাবার প্রচেষ্টা ছাড়া লেখাটি যে কোনদিন কাজে লাগতে পারে সে কথা তখন মনে হয়নি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক ঘূর্ণীবাত্যার সাথে তাল দিতে দিতে লেখাটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রায় পাঁচ বছর পরে লেখাটি সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের কাছে উল্লেখ করি। তিনি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে লেখাটিকে ছাপানোর জন্য আমাকে উৎসাহ দেন। ডাঃ খাস্তগীরের উৎসাহে লেখাটি পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে দেখাই। ডাঃ ঘোষ পাণ্ডুলিপিটি প'ড়ে ভূমিকা লিখে দেন, এবং লেখাটি প্রকাশের কাজে সহায়তা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুত ডাঃ ঘোষের বিশেষ সহায়তা, ডাঃ খাস্তগীরের উৎসাহ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ স্নেহময় দত্তের সহযোগিতার ফলেই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল।

বইটি প্রকাশের কাজে বিভিন্নভাবে যাঁদের সহায়তা লাভ করেছি, তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীসমর গুহ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের পরিচয়

চোখ মেলে চেয়ে দেখি কত বড় আমাদের পৃথিবী। জীব, জন্তু, লতা, পাতা, গাছে ভরা এর সারা অংগ। আকাশ বাতাসের ওড়না দিয়ে মোড়া এর মাটির দেহ। এই মাটির পৃথিবীর আসরে অবিরাম চল্‌ছে প্রকৃতির কত লীলাখেলা। বস্তু আর শক্তির উপাদানে গড়া এই প্রকৃতি কত বিচিত্ররূপে ভুলিয়ে রেখেছে মানুষের মনকে। মানুষ দেখ্‌ছে শুন্‌ছে শক্তির প্রবাহ। ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছে বস্তুর নম্র কঠিন দেহ। মানুষের রসনায় ধরা দিচ্ছে বস্তু পৃথিবীর স্বাদ। গন্ধ হয়ে ভেসে আস্‌ছে বস্তুর স্বভাবের বার্তা। প্রকৃতি সহস্র পরিচয়ের বাস্তব মুখরতায় মূর্তিমতী হয়ে উঠ্‌ছে মানুষের কাছে।

মানুষ আদিমকাল থেকে দেখে আস্‌ছে বস্তুর পৃথিবী ঘিরে শক্তির খেলা। অনুভব করেছে তারা শীতে, গ্রীষ্মে, শৈত্য-উত্তাপের শীত-উষ্ণতা। তুষারে, জলে, বাষ্পে, দেখেছে উত্তাপের প্রকারভেদ। পাখীর গানে, বজ্রের গর্জনে, মানুষে মানুষে কথাবার্তায় শুনেছে তারা শব্দের কীর্তি। দু'হাত দিয়ে কান বন্ধ ক'রে দেখেছে তারা শব্দ আর তেমন শুনা যায় না। ভেবেছে তখন তারা বাতাসের সঙ্গে শব্দের সম্পর্কের কথা। বিস্ময়চকিত মনে তারা বিদ্যুতের প্রচণ্ড আক্রমণ দেখেছে পৃথিবীর বুকে। আলো এসে অবিরাম আঁধারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছে। তাদের দৃষ্টি দিয়েছে—উত্তাপও দিয়েছে। তারা অবশ্যি তখন রামধনু দেখেও জানেনি ঐ সাদা আলোর বুকে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন বর্ণের সাতটি আলো। তারা জান্‌বেই বা কী করে? আলো যে তরংগমাত্র আর এই তরংগ দেহের ছোট বড় গড়ন নিয়ে যে একই আলোকতরংগ দৃশ্য ও অদৃশ্যমান নানা বর্ণের নানা রকমের আলোতে পৃথক হতে পারে এ সন্ধান তো আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন মাত্র বিগত শতাব্দীতে। তবু পুরাকালের মানুষেরা আলোর বিচিত্র শক্তিকে অনুভব করেছে। শুধু তারা আলো, উত্তাপ ও বিদ্যুতের শক্তি প্রবাহই দেখে নি, তারা দেখেছে বস্তুকে হাতে তুল্‌লে ভার অনুভব হয়। জোরে গড়িয়ে যাওয়া বস্তুর ঢেলাকে থামাতে গেলে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হয়। বুঝেছে তারা বস্তুর বুকে স্থিতিতেও

শক্তি লুকিয়ে আছে—গতিতেও শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। নইলে ভার লাগে কেন? ধাক্কা লাগে কেন? বাতাস, জল, ঝড়-ঝঞ্ঝার বেগ দেখেছে। আগুনের দাহিকা স্বভাব দেখেছে। চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি দেখেছে। এমনি করে মানুষ পুরাকাল থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে প্রকৃতির রহস্য-বৈচিত্র্যের ভাণ্ডারকে। বিশ্লেষণে তারা জানতে পেরেছে প্রকৃতির মূল উপাদান হল শক্তি আর বস্তু বা পদার্থ।

কিন্তু তারা শক্তির তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান নিতে গিয়ে প্রতিবারই দেখেছে সিংহ দুয়ার পার হয়ে শক্তির অন্দর মহলের খবর নিতে হলে বস্তুর সাহায্য ছাড়া এক পাও এগুনো যায় না। বস্তু হয় শক্তির বাহক, নয়ত শক্তির সংবাদ-দাতা। তাই বস্তুকে অগ্রাহ্য করে শক্তির সংবাদ জানা কোনমতেই সম্ভব নয়। আলোর খবর জান্‌তে হলে—শুধু রক্ত মাংসের নয়, লোহা কাচের বস্তু-গড়া চোখও চাই। বাতাস ছাড়া তো শব্দ দু'পাও চল্‌তে পারে না। গতি সৃষ্টি করতে হলে তো বস্তুকেই গড়াতে হয়, নড়াতে হয়। উত্তপ্ত হয় কে?—শূন্য নয়, বস্তু। মানুষ দেখ্‌ল শক্তির সংবাদ জান্‌তে হলে আগে চাই বস্তুর সংবাদ। মানুষ তাই প্রশ্ন করল রুক্ষ-কঠিন নম্র পিণ্ড পিণ্ড পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু পদার্থের স্বরূপ কী? এর মূল উপাদানের পরিচয় কি?

মূল পদার্থের প্রাচীন কল্পনা

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ শ' বছর আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতের মূল উপাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা স্থির করেছিলেন বস্তুজগৎ ক্ষিতি, তেজ, অপ, মরুৎ, এবং ব্যোম অর্থাৎ মাটি, অগ্নি, জল, বাতাস, ও আকাশ দ্বারা গঠিত। গ্রীক পণ্ডিতেরাও মত দিয়েছিলেন বস্তুজগৎ মাটি, জল ও বাতাস দ্বারা তৈরী। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অগ্নি ও আকাশকে বস্তুজগতের মূল পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলে কল্পনা করেছিলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেড়শ' বছর আগেও বিজ্ঞানীরা অগ্নির যথার্থ স্বরূপের সন্ধান করতে পারেন নাই। আগুনের যথার্থ স্বরূপ জানা গেল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ার অক্‌সিজেন নামক বায়বীয় পদার্থের আবিষ্কার করলেন। আর আকাশের যথার্থ স্বরূপ তো মাত্র ১৯০৫ সালে বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের কাছে প্রথম ধরা পড়ে। যা হোক, প্রাচীন কাল থেকে মাটি, জল ও বাতাসকেই বস্তুজগতের মূল পদার্থ রূপে গণ্য

করা হয়ে আস্‌ছে। তামা ও টিনের পরিচয় এবং তামা ও টিনের সমবায় ব্রোঞ্জ নামক মিশাল ধাতুর ব্যবহার খৃষ্টের জন্মেরও বহু পূর্ব হতে মানুষ জান্‌ত। সোণা, রূপা ও পারদের ব্যবহারও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তবু তারা কঠিন বস্তুমাত্রকেই মাটির পর্যায়ে ফেলে 'মাটি' বলে একটি নামেই আখ্যা দিয়েছিল।

অণু পরমাণু বা এ্যাটম্

বস্তুজগৎ মাটি জল বাতাস দিয়ে তৈরী এ জেনেই প্রাচীনেরা খুসী হন নি। তাঁরা আরো প্রশ্ন করেছিলেন—এক ভাণ্ড জল গড়া কী দিয়ে? এক তাল মাটির মূল পদার্থের চেহারাটি কি রকম? ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কণাদ মাটি, জল, বাতাসের মূল চেহারার কল্পনা করে বলেছিলেন—চোখে দেখা যায় না এমনতর সূক্ষ্ম জলের কণা, বাতাসের কণা, সোণার কণা অর্থাৎ মাটির কণা দিয়েই পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুজগতের সৃষ্টি। কণাদ কল্পনা করলেন এক তাল মাটিকে যদি কেটে কেটে ভাগ করা যায়, আর প্রথম ভাগের এক একটা অংশ নিয়ে যদি আবার ভাগ করা যায় তাহলে এমনি ভাবে মাটিকে ভাগের পর ভাগ করতে করতে এমন একটা সময় আস্‌বে যখন মাটিকে আর ভাগ করা চল্‌বে না। মাটি ভাগ ভাগ হয়ে এই চরম অবস্থায় যে সব সূক্ষ্ম কণায় এসে ঠেক্‌বে, কণাদ তাদেরই প্রতিটি কণার নাম দিয়েছিলেন পরমাণু। কণাদের মতে এক তাল মাটিও যেমন মাটি, এক কণা মাটির পরমাণুও তেমনি চরম অবস্থায়ও থাকবে মাটিই অর্থাৎ পরমাণুর অবস্থাতেও মাটির স্বভাবের কোন তারতম্য হবে না।

এই পরমাণুগুলির দুটি কণা যখন পরস্পর ক্রমে মিলে তখন পদার্থের যে অতি ক্ষুদ্র দেহ গড়ে ওঠে কণাদ তার নাম দিলেন 'অণু', অর্থাৎ পদার্থের চরম অবস্থায় থাকে পরমাণু আর এই পরমাণুর আগের অবস্থাই হলো 'অণু'। এখানে বলে রাখা ভাল গ্রীক পণ্ডিত ডিমোক্রিটাসও পদার্থের মৌলিক কণা পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন এবং সেই মৌলিক কণার নাম দিয়েছিলেন 'এ্যাটম'।

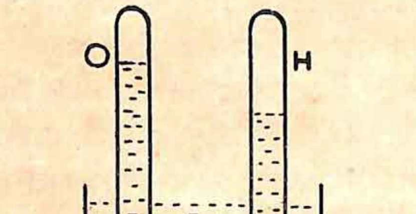
মাটি জল বাতাসের বিশ্লেষণ

আশ্চর্যের কথা, মাত্র দু'শ বছর আগেও মাটি জল বাতাসের মৌলিক-স্বরূপ জানবার জন্য ধারাবাহিক ভাবে এবং শৃংখলার সংগে তেমন কোন

প্রচেষ্টা হয়নি। অথচ তামা, টিন, সোনা, রূপা, পারদ, লোহা, চূণ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের ব্যবহার মানুষ বহুকাল ধরে করে আস্ছে। ভারতবর্ষের রসায়নশাস্ত্রীরা বহুভাবে এর প্রয়োগ করেছেন। অশোকের গড়া লৌহ স্তম্ভের লোহাতে কেন মরিচা পড়ে না আজো তা বিজ্ঞানীদের রহস্যের বিষয়। তা ছাড়া ঔষধী বিদ্যার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রীরা ওষুধ তৈরী করার কাজে গাছ, লতা, পাতা জীবজন্তুর চর্বি এবং বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার বহুভাবে করেছেন। প্রাচীনেরা বিভিন্ন ভাবে বস্তুর প্রয়োগ করেছেন বটে ব্যবহারিক জীবনে, কিন্তু বস্তুর মৌলিকস্বরূপ জানবার প্রচেষ্টায় যথাযথ প্রয়াস পাননি। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল এই বস্তু জগতের মূল উপাদান মাত্র তিনটি মৌলিক পদার্থ—জল, বাতাস, মাটি। এই জল, বাতাস ও মাটিই নানা ভাগে, নানা রকমে এবং নানা অনুপাতে মিলেমিশে এই বস্তুজগৎ গড়ে তুলেছে। জীবজন্তুর দেহ—এই জল, মাটি, বাতাসে গড়া। গাছ পাতা উদ্ভিদের দেহবস্তুও এই তিনটি মূল উপাদান ছাড়া আর কিছু নয়।

জল

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের আগেও জলকে অভাজ্য মৌলিক পদার্থরূপে গণ্য করা হ'ত। বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস ও ল্যাভয়সিয়ার প্রথম প্রমাণ করেন যে জল মৌলিক পদার্থ নয়, যৌগিক পদার্থ। জলের মৌলিক উপাদান হল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি মৌলিক পদার্থ। একটি পাত্র ভরা জল যদি কোনও তড়িৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসে তা'হলে দেখা যাবে জল ভেঙে ভেঙে গ্যাস হয়ে উবে যাচ্ছে। তারের যে মুখ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ জলে প্রবেশ করে সে মুখের অর্থাৎ পজিটিভ্ তড়িৎদ্বারের গা বেয়ে এক প্রকার গ্যাস জল থেকে উঠে আস্ছে, আর যে মুখ দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ জল ছেড়ে চলে যায় সে মুখের অর্থাৎ নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারের তারের গা বেয়ে আরেক প্রকার গ্যাস জল থেকে বেরুচ্ছে। এই দুই



জলের বিশ্লেষণ ; O = অক্সিজেন ;
H = হাইড্রোজেন

প্রকারের প্রত্যেকটির সবটুকু গ্যাস যদি আলাদা আলাদা করে ত্ব'টো পাত্রে সঞ্চয় করা যায় তা'হলে দেখা যাবে, সঞ্চিত ত্ব'টি গ্যাস আয়তনে এক প্রকার নয়। নেগেটিভ্ তড়িৎদ্বার বেয়ে যে গ্যাস উত্থিত হয়েছে তা পজিটিভ্ তড়িৎ-দ্বার বেয়ে ওঠা গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ। শুধু আয়তনেই দ্বিগুণ নয় স্বভাবের দিক দিয়েও তার যমজ গ্যাসটির চেয়ে উগ্র প্রকৃতির। আগুনের সংস্পর্শে এলে ভীষণ আওয়াজ করে দপ করে জ্বলে ওঠে সে। আর দ্বিতীয় গ্যাসটি আয়তনেও প্রথমটির অধিক এবং স্বভাবেও নম্র। আগুনের সংস্পর্শে এ গ্যাসটি জ্বলে ওঠে না। একটি দিয়াশলাইয়ের জ্বালান কাঠি এ গ্যাসের মধ্যে ধরে রাখলে যতক্ষণ পর্যন্ত দিয়াশলাইয়ের আগুন দ্বিতীয় গ্যাসটিকে না খেয়ে ফেলবে ততক্ষণ পর্যন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠিটি নিভবে না। প্রথমটিকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়েছেন হাইড্রোজেন আর দ্বিতীয়টির নাম অক্‌সিজেন।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন জল বিশ্লেষণ করলে অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন্ গ্যাস নির্গত হয়। কিন্তু এ প্রমাণেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন না যে জল একটি যৌগিক পদার্থ মাত্র। তাঁরা প্রশ্ন করলেন একভাগ অক্‌সিজেনের সংগে তুইগুণ আয়তনের হাইড্রোজেন মিশিয়ে কি জল বানান যায় না? বৈজ্ঞানিক ক্যাভেন্‌ডিস্ পরীক্ষাও করলেন। একটি পাত্রের ভিতর একভাগ অক্‌সিজেনের সংগে তুইভাগ আয়তনের হাইড্রোজেন মেশালেন। এই মিশ্রিত গ্যাসের মধ্য দিয়ে একটি ব্যাটারী থেকে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে দিলেন। ঝলৎ করে গ্যাসের মধ্যে একটি ছোট্ট আগুনের শিখা খেলে গেল। আর নিমেষের মধ্যে সমস্ত গ্যাস হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন, পাত্রের গায়ে লেগে রইল শুধু বিন্দু বিন্দু জলের কণা। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল প্রাকৃতিক জলের গুণাগুণের সংগে এই তৈরী করা জলের একটুকু পার্থক্য নেই।

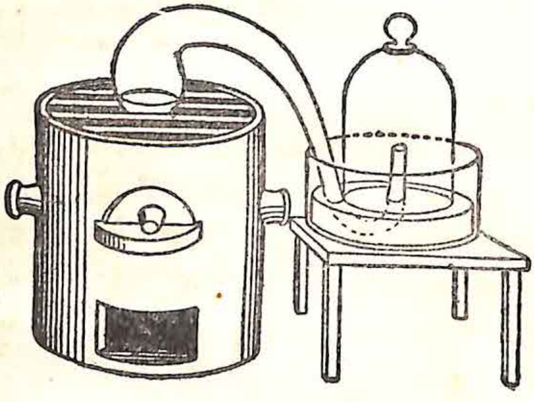
বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করলেন জল বস্তুজগতের মৌলিক পদার্থ নয়, একটি যৌগিক পদার্থ মাত্র। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য পুকুরের জল, কুয়োর জল, নদীর জল, ঝর্ণার জল, সমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল এমনিতর যত প্রকারের প্রাকৃতিক জল পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকটিকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রকৃতির জগতে পাওয়া জলের পরস্পরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। স্বাদে, বর্ণে, ঘনত্বে এবং স্বভাবে সব জলই একপ্রকার। আপাতদৃষ্টিতে জলে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ স্থান বিশেষে পাওয়া জলের সংগে অনেক প্রকার বস্তুর মিশ্রণ। যেমন সমুদ্রের জল লোণা।

কারণ সমুদ্রের একশ মণ জলে আড়াই মণ পরিমাণ লবণ মেশান আছে। এমনি করে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা হ'ল—জল একটি যৌগিক পদার্থ এবং অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন এই যৌগিক পদার্থের মূল উপাদান।

কিন্তু অক্‌সিজেন হাইড্রোজেনও কি কোন মৌলিক পদার্থ? অনেক পরীক্ষা করা হ'ল। অক্‌সিজেন বা হাইড্রোজেনকে ভাংগা গেল না অথবা অন্য কোন দু'টি মৌলিক পদার্থ মিশিয়ে এদের কাউকে তৈরী করাও সম্ভব হ'ল না। তাই অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেনের বুনিয়াদী ঘরাণা স্বীকার করতেই হ'ল। মান্‌তেই হ'ল এরা বস্তুজগতের মৌলিক পদার্থ।

বাতাস

জল যে মৌলিক পদার্থ নয় সে খবর তো জানা গেল। কিন্তু বাতাসও মৌলিক পদার্থ নয়। এবারেও প্রথম কৃতিত্ব বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ারের। একটি বাতাস ভরা কাচের পাত্রের মধ্যে কিছু পারদ পুরে এবং মুখ বন্ধ করে যদি কয়েকদিন ধরে কাচের পাত্রটিকে গরম করা যায় তা'হলে দেখা যাবে রূপালী ধরণের চক্‌চকানো পারদের গায়ে লাল সর পড়ে গেছে। কাচের পাত্র



ল্যাভয়সিয়ারের পরীক্ষা

ক—বাতাসভরা কাচের পাত্র ; খ—গ্যাস উনুন ; গ=পারদভরা কাচের পাত্র

দীর্ঘ উত্তাপের পরে ; (গ) এর ভিতরকার পারদের উপরে লাল সর পড়ে

থেকে তুলে এই লাল সরের স্তরটি খুব বেশি করে যদি আবার গরম করা যায় তা'হলে দেখা যাবে লাল সরের গা থেকে একরকম গ্যাস বেরিয়ে আস্‌ছে, আর তলানিরূপে পড়ে রয়েছে সেই আগেকার চক্‌চকানো পারদ। এই লাল

সর থেকে পাওয়া গ্যাসটি পরীক্ষা করে দেখা গেল বর্ণে, ওজনে এবং স্বভাবে এ সম্পূর্ণ অক্সিজেন গ্যাসের মত। অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে যেমন একটি আগুনের শিখা জলতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্যাস সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তেমনি এই লাল সর থেকে পাওয়া গ্যাসও আগুনের শিখাকে জ্বালাতে পারে। সব রকম পরীক্ষা করে স্থির হ'ল এ গ্যাসও অক্সিজেন গ্যাসই।

কাচের পাত্রে যে অবশিষ্ট বাতাস রইল তার অবস্থা কি হ'ল? দেখা গেল পারদ বাতাস থেকে শেষ অক্সিজেন কণাটুকু খেয়ে যখন লাল হয়ে গেছে, তখন সুরুতে পাত্রে যে পরিমাণ বাতাস ছিল তা আর নেই। বাতাসের পরিমাণ কমে চার ভাগের তিন ভাগ হয়ে গেছে। এই বাকী থাকা গ্যাসটি নিয়ে পরীক্ষা হ'ল। পরীক্ষায় দেখা গেল এ গ্যাসের মধ্যে আগুন জ্বলে না। জালান আগুনের শিখা এ গ্যাসের মধ্যে এনে ধরলে শিখাটি তৎক্ষণাৎ নিভে যায়। এতে বুঝা গেল এ গ্যাসটির স্বভাব অক্সিজেনের ঠিক বিপরীত। এতে শুধু আগুনই যে নিভে যায় তাই নয়, পোকা-মাকড় থেকে মায় মানুষকে পর্যন্ত যদি এ গ্যাসের মধ্যে আটকিয়ে রাখা যায় তবে সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যাবে মরে। তাই এ গ্যাসের নাম দেওয়া হ'ল অপ্রাণ বায়ু বা নাইট্রোজেন, অর্থাৎ এ গ্যাস মানুষেরও প্রাণ বাঁচাতে পারে না—আগুনেরও প্রাণ বাঁচাতে পারে না, এ নাইট্রোজেন অন্যধাতুর সংগে বড় একটা যুক্ত হয় না। একমাত্র ম্যাগনেসিয়াম ধাতু যদি নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রেখে গরম করা যায় তবে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রোজেনকে গিলে হজম করতে পারে।

এ পরীক্ষায় মোটামুটি বোঝা গেল বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামের দু'টি পদার্থের মিশাল বস্তু। পরিমাণে অক্সিজেন আছে বাতাসে এক ভাগ, আর নাইট্রোজেন তিন ভাগ। এ ছাড়া আরো অন্যান্য পদার্থও আছে বাতাসে।

একটা পাত্রের ভিতর যদি এক খণ্ড বরফের টুক্‌রো রেখে দেওয়া যায় তা' হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে পাত্রের বাইরের চারদিকটায় শিশিরের মত বিন্দু বিন্দু জলকণা জমে উঠেছে। এ জলকণা জম্‌লো কোথা থেকে?—জম্‌লো বাতাস থেকে। সাধারণতঃ একশ' ভাগ বাতাসে দেড় ভাগের মত জলীয় বাষ্প থাকে। পৃথিবী থেকে জল বাষ্প হয়ে উবে গিয়ে প্রায়ই বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ঠাণ্ডা পেলে

এই জলীয় বাষ্পকণা মেঘ হয়ে জমে ওঠে। আরো বেশি ঠাণ্ডা পেলে বৃষ্টি-জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ নামে আর একটি গ্যাস পাওয়া যায়। এক বাটি টলটলে স্বচ্ছ চুণের জল যদি বাতাসের মধ্যে খোলা রেখে দেওয়া যায়, তা'হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই চুণের জলের উপর একটা সাদা সর পড়তে থাকে। এই সাদা সরটা জমে—চূণের জলের মধ্যে গোলা চূণের সংগে বাতাসের কোন একটা পদার্থের যোগ হয় বলে। এই কোন-একটা-পদার্থ হল যৌগিক বস্তু—কার্বন-ডাই-অক্সাইড্। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি প্রায়ই জীবজগতের দান। জীবজগৎ নিশ্বাস রূপে বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় আর প্রশ্বাসরূপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ছেড়ে দেয় আকাশে।

দেখা গেল বাতাসের প্রায় শতকরা আটানব্বুই ভাগ অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নামক দু'টি মৌলিক পদার্থে তৈরী। এ দু'টি মৌলিক পদার্থের সংগে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও আছে কিছু কিছু। সুতরাং একটা বদ্ধ পাত্রের বাতাসের সবটুকু অক্সিজেন যদি পারদ চুষে নেয়, ম্যাগনেসিয়াম ধাতু যদি সবটুকু নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, জলীয় বাষ্প যদি ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ যদি চুণের জলে গুলে যায় তবে পাত্রের সবটুকু বাতাসই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় সবটুকু বাতাস নিঃশেষ হয় না; হোমিওপ্যাথি ওষুধের একশ যাট শিশি বাতাস যদি সুরুতে নেওয়া যায়, তবে সব গ্যাস নিঃশেষ হওয়ার পরেও এক শিশি পরিমাণ বাতাস বাকী থেকে যায় পাত্রে। বিশেষ পরীক্ষা করে জানা গেল এ অবশিষ্ট বাতাস অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কোনটাই নয়। তবে এই অবশিষ্ট গ্যাসটি কি জিনিষ? গত পঞ্চাশ বছরের নানাপ্রকার গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকেরা এ গ্যাসের পরিচয় পেয়েছেন। এই অবশিষ্ট গ্যাসগুলি ক্বচিৎ পাওয়া যায়—এমনতর কয়েকটি মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থের মিশাল। এদের সংখ্যা পাঁচ। সূর্যের আলো পরীক্ষা করে প্রথম সন্ধান পাওয়া গেছে বলে একটির নাম দেওয়া হয়েছে সৌরক বা হিলিয়াম। অপরটির নাম নিয়ন (বা নবাগত), ক্রিপটন বা পলাতক, জিনন (আগন্তুক) এবং আরগণ। এদের এমন সব বিচিত্র নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ প্রথম প্রথম এদের খুঁজে বের করাই বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে মুস্কিল ছিল। এই গ্যাসীয় পদার্থগুলি পরিমাণে খুব অল্প। একশ'

ভাগ বাতাসে সবাই মিলে এরা এক ভাগেরও কম। প্রত্যেকের পরিমাণ নীচে দেওয়া হ'ল।

১০০	ভাগ	বাতাসে	পাওয়া	যায়	এক ভাগ আরগণ।
১০০,০০০	"	"	"	"	১—২ ভাগ নিয়ন।
২৫০,০০০	"	"	"	"	১ হিলিয়াম।
১,০০০,০০০	"	"	"	"	১ ভাগ ক্রিপটন।
২০,০০০,০০০	"	"	"	"	১ " জিনন।

এই পাঁচটি গ্যাসীয় পদার্থের স্বভাব একরকম বলে ইংরাজীতে এদের একটি পারিবারিক নাম দেওয়া হয়েছে 'ইনার্ট গ্যাস' বা উদাসী গ্যাস। এরা প্রত্যেকেই অতিমাত্রায় একাচোরা, অন্য কোনও পদার্থের সঙ্গে মিল খায় না। তাই এই উদাসী পদার্থের সংগে অন্য কোন পদার্থের মিলিত কোন যৌগিক পদার্থই পৃথিবীর বস্তু পিণ্ডে পাওয়া যায় না। এদের কাউকে কাউকে বাতাস ছাড়া (যেমন হিলিয়াম) বিশেষ জাতীয় খনিজ বস্তুর গর্তে বা মেটেতেলের খনিতে আবদ্ধ গ্যাস হিসাবে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে—কিন্তু পরিমাণ খুব অল্প।

তা হ'লে জানা গেল গোটা বাতাসটা একটা অভাজ্য মৌলিক পদার্থ নয়—মিশাল বস্তু মাত্র। এবং বাতাসকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল কয়েকটি মৌলিক পদার্থ, যথা—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগণ, হিলিয়াম, নিয়ন, জিনন ও ক্রিপটন, আর সেই সংগে যৌগিক বস্তু জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড। বাতাসে এদের আনুপাতিক পরিমাণ—

অক্সিজেন	শতকরা	আয়তনে	২০.৬ ভাগ
নাইট্রোজেন	"	"	৭৭.১৬ "
উদাসী গ্যাস	"	"	.৪০ "
জলীয় বাষ্প	"	"	১.৪০ "
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	"	"	.০৪ "

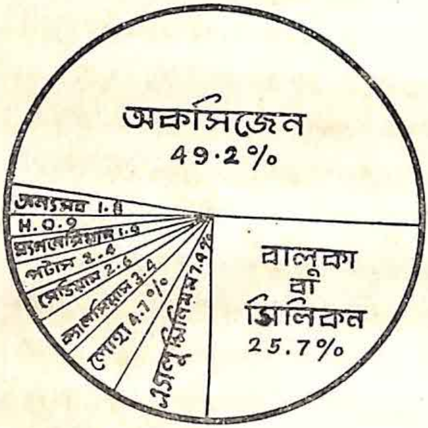
এ ছাড়া এ্যামোনিয়া, ওজন, নাইট্রিক অ্যাসিড্, সালফার ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদি গ্যাসগুলিও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বাতাসে।

মাটি

খুব প্রাচীনকালে মাটিকে মৌলিক পদার্থ বলা হ'লেও কার্যক্ষেত্রে মাটিকে মৌলিক্ পদার্থরূপে গ্রহণ করা হয়নি। সোনা, রূপা, তামা, টিন, লোহা,

সীসা, পারদ ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার প্রাচীনেরাও জান্‌তেন। তাঁরা এও জান্‌তেন যে এ সব পদার্থগুলিকে ভাঙা যায় না, গড়াও যায় না। পৃথিবীর উপরের মাটির পরাত বা ভূত্বকে এই সব ধাতুগুলি পাওয়া যায় বলেই হয়ত প্রাচীনেরা এদের একটা গোত্র নাম দিয়েছিলেন 'মাটি' বলে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা প্রশ্ন করলেন, যে মাটি দিয়ে ভূপৃষ্ঠ গড়া সেই মাটির মৌলিক উপাদান কি? আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় আঁঠালে মাটি, বালু, কংকর, প্রস্তর, মর্মর, স্লেট, চূণাপাথর, শিলা ও নানাপ্রকার গুঁড়া ও দানাদার খনিজ বস্তু দ্বারা গড়া এই ভূপৃষ্ঠ। কিন্তু এগুলির প্রায় সবই যৌগিক জিনিষ অর্থাৎ অনেকগুলি মৌলিক পদার্থ মিলে তৈরী হয়েছে এই জিনিষগুলি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংক বালু জাতীয় বস্তুর। পৃথিবীর বস্তু পিণ্ডকে চারভাগে ভাগ



করলে এর এক ভাগ হবে এই সিলিকা ও সিলিকেট বা বালুজাতীয় পদার্থ। কিন্তু বালু কি? বালুকে ভাংগবার চেষ্টা হল। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সংগে কিছু পরিমাণ বালু মিশিয়ে পোড়ান হল। দেখা গেল পোড়া বালিতে রূপালী রংয়ের ম্যাগনেসিয়াম সাদা পাউডারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর সাদা পাউডারের সংগে মিলে রয়েছে বাদামী রংয়ের আর এক রকম পাউডার। এই বাদামী রংয়ের পাউডারকে অনেক পরীক্ষা করেও আর কোন দু'টি নূতন জিনিষে ভাংগা গেল না বা অন্য কোন জিনিষের সাহায্যে গড়াও গেল না। স্থির হল এ জিনিষ একটি মৌলিক পদার্থ এবং এর নাম দেওয়া হল সিলিকন।

আবার, বক্সাইট নামক একটি খনিজ ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দেখা গেল বস্তুটি ভেংগে দুভাগ হয়ে গেছে। একটা ভাগ তার গ্যাস এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে একটা রূপালী আভার ধাতব বস্তু। পরীক্ষা করে জানা গেল গ্যাসটি আর কিছুই নয়, অকসিজেন গ্যাস মাত্র। বাকী জিনিষটা একটা অজানা ধাতব পদার্থ—যাকে ভাংগাও যায় না গড়াও যায় না। এই মৌলিক পদার্থের

নাম হল এ্যালুমিনিয়ম্। মানুষের জীবনে এ্যালুমিনিয়মের চাহিদা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। এই হাল্কা অথচ শক্ত পদার্থটি অচিরেই হয়ত লোহার বাজার দখল করে বস্‌বে। ভূপৃষ্ঠের অনেক বস্তুই এই সিলিকন ও এ্যালুমিনিয়মের সংগে অক্‌সিজেন, চূর্ণ গন্ধক ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ মিলে তৈরী হয়েছে।

এমনি করে মাটিকে বিশ্লেষণ করে অনেক নতুন নতুন পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল সোনা, রূপা, পারদ, প্লাটিনাম ইত্যাদি পদার্থগুলি একা একা এবং আলাদা মৌলিক পদার্থরূপে স্বাধীনভাবেই পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক জগতে অন্য কোন যৌগিক বস্তুকে ভেংগে এদের আবিষ্কার করতে হয়নি। এদের প্রত্যেকটিকে নিয়ে বহুভাবে পরীক্ষা করে স্থির হ'ল এরা প্রত্যেকেই এক একটি মৌলিক পদার্থ। এছাড়া আরও অনেক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল—যাদের মৌলিক পদার্থরূপে স্বতন্ত্র ও বিশুদ্ধভাবে কথনও পাওয়া যায় না প্রাকৃতিক জগতে। এরা অন্যান্য বস্তুর সংগে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে থাকে বস্তু-জগতে। এদের বিশুদ্ধরূপে পেতে হলে যৌগিক বস্তুগুলিকে ভেংগে তবে মৌলিক পদার্থকে বিশুদ্ধরূপে আলাদা করা যায়। যুক্ত পদার্থের বন্ধন থেকে মৌলিক পদার্থকে খালাস করে আনা যায়। মৈত্রী ভেংগে যৌগিক বস্তুকে মৌলিক পদার্থে আলাদা করে বিশ্লেষণ করবার অনেক উপায় আছে। উপায়গুলি এক একটি বস্তুর বেলায় এক এক রকমভাবে প্রযোজ্য। কোন যৌগিক বস্তুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলে বস্তুটি স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থে ভেংগে যায়। লবণের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালান হলে লবণ থেকে পাওয়া যায় সোডিয়াম নামক একটি ধাতব মৌলিক পদার্থ এবং ক্লোরিণ নামক আর একটি হল্‌দে রংয়ের গ্যাস। যে সব বস্তুর মধ্যে লোহা আছে সে সব বস্তুর সংগে পর্যাপ্ত কার্বন মিশিয়ে যদি পুড়িয়ে লাল করা যায় তবে দেখা যাবে কার্বন লোহার সংগে যুক্ত অন্য পদার্থগুলিকে নিজের সংগে যুক্ত করে নিয়েছে—আর লোহাকে মৌলিক পদার্থরূপে আলাদা করে সরিয়ে দিয়েছে। যদি কোন বস্তুর সংগে শুধুমাত্র অক্‌সিজেন মিলিত থাকে তা'হলে উত্তপ্ত বস্তু পিণ্ডের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিয়ে দিলে, হাইড্রোজেন বস্তু পিণ্ড থেকে অক্‌সিজেন কেড়ে নিয়ে জলীয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায় এবং বাকী পড়ে থাকে মৌলিক পদার্থটি মাত্র। এমনি করে যৌগিক বস্তুকে অন্য পদার্থের সংগে ভস্ম করে এ্যাসিডে পুড়িয়ে, আগুনে জ্বালিয়ে, জলে গুলে—নানাভাবে যৌগিক বস্তু থেকে মৌলিক পদার্থকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। লোহা, তামা, চূণ, জিঙ্ক, সোডিয়াম্,

পটাসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলির আবিষ্কার হয়েছে এমনি সব উপায় অবলম্বন করে। সোনা, রূপা, পারদ, প্লাটিনাম্, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এমনিতর কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া বেশির ভাগ মৌলিক পদার্থই পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে যৌগিক বস্তুরূপে। যৌগিক বস্তুকে না ভাঙ্তে পারলে এদের অস্তিত্বের খবরও পাওয়া যেত না।

জৈবিক বস্তু

দেখা গেল মাটি, জল, বাতাসের কোনটাই মৌলিক পদার্থ নয়। মাটি জল বাতাস ছাড়া প্রতিদিনকার পৃথিবীতে যে জিনিষগুলি বড় আকারে আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে—তারা হল লতা-পাতা-গাছ ও জীবজন্তু এবং এদের কাছ থেকে পাওয়া চাল, ডাল, আটা, তেল, দুধ ইত্যাদি বস্তুগুলি। উদ্ভিদ ও জীবের দেহ এবং তাদের দেহজাত বস্তু—এই উভয়কে একটি নাম দিয়ে বলা যায় জৈবিক বস্তু (organic matter)—এ সকল জৈবিক বস্তুর মূল উপাদান বিশ্লেষণেও প্রথম কৃতিত্ব ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ারের। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন জৈবিক বস্তুমাত্রই তিনটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গড়া—কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন হ'ল এই মৌলিক পদার্থত্রয়। পরে জানা যায় অনেক জৈবিক বস্তু, যেমন দুধে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংগে নাইট্রোজেন আছে। এ ছাড়া ছিটেফোঁটা চুণ, ফস্ফরাস্ গন্ধক ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলিও পাওয়া যায় কোন কোনও জৈবিক বস্তুতে। যে কোনও জৈবিক বস্তুকে যদি খুব জোর উত্তাপ দিয়ে পুড়িয়ে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে জৈবিক বস্তুটি গ্যাস হয়ে উড়ে গেছে, বাকী পড়ে রয়েছে মাত্র কিছুটা ছাই। সমস্ত জৈবিক বস্তুটির তুলনায় অবশিষ্ট ছাইয়ের পরিমাণ নগণ্য বললেও চলে। এই ছাইগুলি হল জৈবিক বস্তুতে যে ছিটেফোঁটা ধাতব পদার্থ আছে তার অবশেষ। আর গ্যাস হয়ে যা উড়ে গেল তার মধ্যে রয়েছে মাত্র দুটি যৌগিক গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ এবং জলীয় বাষ্প। জৈবিক বস্তুর কার্বন ও হাইড্রোজেন বস্তুর নিজ দেহের অক্সিজেন এবং বাতাসে পাওয়া অক্সিজেনের সংগে মিলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ও জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে। যে সব জৈবিক বস্তুতে নাইট্রোজেন আছে, সেগুলি থেকে কিছুটা এ্যামোনিয়া গ্যাসও তৈরী হয়।

এ্যামোনিয়া হ'ল তিনগুণ হাইড্রোজেনের সংগে এক ভাগ নাইট্রোজেনের মিলিত একটি যৌগিক গ্যাসীয় বস্তু।

যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ

প্রাকৃতিক জগতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মৌলিক পদার্থগুলির মিলে মিশে বসবাস করবার একটা বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। কখনো কখনো মৌলিক পদার্থেরা পরস্পর নিঃশেষে মিশে গিয়ে একেবারে একাত্ম হয়ে যায়। তাদের পৃথক পরিচয়ের একটু চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না মিলিত বস্তুটিতে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জল হয়। কিন্তু যেইমাত্র জল হয়ে গেল অমনি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আপন স্বভাবের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। জল তখন শুধু জলই। জলকে খুঁজলে আর তখন হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন কাউকেই পাওয়া যাবে না। এমনিতর নতুন বস্তুকে বলা হ'ল যৌগিক বস্তু (Compound)।

আর বাতাস? বাতাসে আছে—নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও পাঁচটি উদাসী গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ এবং সে সংগে আছে কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ও জলীয় বাষ্প। এরা প্রত্যেকেই বাতাসে আছে বটে, কিন্তু যার যাঁর গা বাঁচিয়ে নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে পরস্পর ভিড় ক'রে মিশে আছে বাতাসে। জলের মত মিলে গিয়ে একেবারে একাত্ম হয়ে যায়নি। বাতাসের মধ্যে এদের আলাদা আলাদা পরিচয় সব সময়েই পাওয়া যায়। একটু চেষ্টা করলেই অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড যাকে ইচ্ছে যখন তখন ভিড় থেকে আলাদা করে টেনে নিয়ে আসা যায়; বাতাসের মত এমনিতর বস্তু, যার মধ্যে মৌলিক পদার্থেরা পরস্পর ভিড় করে মিশে আছে বটে, কিন্তু মিলে গিয়ে একেবারে একান্ত নতুন বস্তুতে পরিণত হয়নি। তাদের বলা হয় মিশাল বস্তু (mixture)। মৌলিক বস্তুকে ভাঙলে তাপের স্থষ্টি হয়। আর মৌলিক পদার্থ নিয়ে যৌগিক বস্তু গড়তে হ'লে উত্তাপের জোগান দেওয়ার দরকার হয়। কিন্তু মিশাল বস্তুকে ভাঙতে গড়তে কোন অবস্থায়ই উত্তাপের প্রয়োজন পড়ে না। যে যে মৌলিক পদার্থ নিয়ে যৌগিক বস্তু গড়া তাদের পরস্পরের পরিমাণ পাকাপাকিভাবে বাঁধা। শুধু তাই নয়, যৌগিক বস্তু গড়তে হ'লে রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। জল বানাতে হ'লে দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ আয়তনের অক্সিজেন মেশাতে হবে। শুধু মিলিয়ে রাখলেই হবে না, একশ' বছর অপেক্ষা করলেও হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা আলাদা মিশাল গ্যাস রূপেই থেকে যাবে কিন্তু এদের মিশলে এক ঝলক বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালেই মুহূর্তের মধ্যে মিশাল গ্যাস জলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যদি দুইভাগ আর এক ভাগের পরিমাণে না মিশিয়ে যে কোন একটি গ্যাস এমন কি এক তিলও বেশি করে মিশানো যায় তবে বিদ্যুৎ-ঝলকের পর দেখা যাবে, বেশি গ্যাসটুকু গ্যাস হিসাবেই রয়ে গেছে, জল হয় নি। কিন্তু মিশাল বস্তুর মধ্যে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে, তাদের পরিমাণের একটু আধটু বেশি কমে কিছু আসে যায় না। প্রকৃতি জগতের নানা জায়গা থেকে বাতাস এনে পরীক্ষা করে দেখা গেছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরস্পরের পরিমাণটা ঠিক থাকছে না, কম বেশি হচ্ছে। এছাড়া মিশাল বস্তুর পদার্থগুলি মিশাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা উত্তাপের কোন প্রয়োজন পড়ে না। ভিড় করে মিশিয়ে দিলেই হলো। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প মিশিয়ে দিলেই বাতাস বানান যায়। এ বানান বাতাসের সঙ্গে প্রাকৃতিক বাতাসের বড় একটা পার্থক্য হয় না।

মৌলিক পদার্থ

এমনি করে বস্তু জগতের মূল উপাদানের সন্ধান চলতে লাগল। সাত লক্ষ কোটী কোটী টন ওজনের পদার্থ পিণ্ড যে অজস্র যৌগিক বস্তুরূপে পৃথিবীতে নানা জিনিষ হয়ে ছড়িয়ে আছে তাদের এক একটিকে ধরে বৈজ্ঞানিক খবর নিতে লাগলেন। যৌগিক পদার্থকে ভেংগে অন্দরমহলের খোঁজ করলেন। একের পর একে তাঁদের হাতে অনেক নতুন খবর সংগৃহীত হ'ল। এ খবরগুলি পড়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে বস্তুপৃথিবী, মাটি, জল ও বাতাসের মত মাত্র তিনটি সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া নয়। আবার বস্তু-পৃথিবীর মূল উপাদান পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য যৌগিক বস্তুর মত অজস্রও নয়। উনিশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিকেরা খবর পেলেন তিরিশটি মৌলিক পদার্থের। প্রায় একশ' বছরের পরীক্ষা ও গবেষণার পর

উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে আরো পঞ্চাশটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হ'ল। তিরিশটি আর পঞ্চাশটি মিলে হ'ল মোট আশীটি মৌলিক পদার্থ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারলেন এই বস্তুপৃথিবীর মূল উপাদান রূপে আছে মাত্র বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ।

প্রশ্ন হতে পারে বিরানব্বুইটির বেশিও তো মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে যার সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা আজো পাননি? উত্তরে বলা যায়, হাঁ, আরো মৌলিক পদার্থ থাকতেও বা পারে। তবে আজকাল বিজ্ঞানের গবেষণা প্রণালীর এত উন্নতি হয়েছে এবং বিভিন্ন বস্তুকে এত তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিকেরা একরকম নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এই বিরানব্বুইটির বেশি মৌলিক পদার্থ শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, জ্যোতিষ্কপুঞ্জেও নেই। এ সংগে আরো প্রশ্ন হতে পারে আজকের মৌলিক পদার্থ ভেংগে ভবিষ্যতে যে দুটো নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধান বের করা যাবে না তার প্রমাণ কি? উনিশ শতাব্দীর প্রথমে হয়ত বৈজ্ঞানিকেরা এর নির্ভুল জবাব দিতে পারতেন না, কিন্তু আজকের বৈজ্ঞানিকেরা জোর করে বলতে পারেন যে এই বিরানব্বুইটি পদার্থের প্রত্যেকটিই মৌলিক, যৌগিক নয়। বিষয়টিকে বুঝতে হলে পদার্থের অন্দরমহলের খবর জানা দরকার। তাই পরের অধ্যায়ে এ প্রশ্নের জবাব আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখা যায় যে এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের তিনটি মৌলিক পদার্থ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, তবু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে এই তিনটির অস্তিত্ব একদিন না একদিন অবশ্যই লোকের চোখে ধরা পড়বে।

পরমাণু বা এ্যাটম

একটি মস্তবড় দালান দেখে যদি কেউ প্রশ্ন করে এটি কি দিয়ে গড়া? তবে উত্তরে বলতে হবে এক একটি খণ্ড ইট দিয়ে গড়া এই দালানটি। এমনিতর একতাল সোনা দেখে যদি কেউ প্রশ্ন করে কি দিয়ে গড়া এই সোনার তালটি? তখনও উত্তর হবে কোটী কোটী অতি সূক্ষ্ম পরমাণু কণা দিয়ে গড়া এই সোনার তালটি। শুধুমাত্র সোনা নয়, প্রতিটি মৌলিক পদার্থের মূলে আছে এরূপ পরমাণু কণা বা এ্যাটম। পরমাণু কণার সমষ্টি রূপেই গড়ে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ মৌলিক পদার্থ। বিরানব্বুইটি পদার্থের

মূলে আছে বিরানব্বুই রকমের পরমাণু। বিভিন্ন জাতের পরমাণু কণাগুলি পর পর মিলে মিশেই গড়ে তুলেছে এই পৃথিবীর জীবিত ও নিষ্প্রাণ বস্তুগুলি। যখন কোন নতুন বস্তু গড়ে ওঠে, কোন নতুন জিনিষ রচিত হয়, বৈজ্ঞানিক তখন শুধু দেখেন মৌলিক পদার্থের পরমাণু কণাগুলি একদল ভেংগে আবার পরস্পর মিলে মিশে নতুন জিনিষরূপে নতুন দল গড়ে তুলল। নতুন কোন বস্তু রচনা করার অর্থ বিভিন্ন জাতের পরমাণু কণাগুলিকে নতুনভাবে গুছিয়ে সাজান মাত্র। এই পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে এদের চোখে দেখা অসম্ভব। এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও এদের দেখা যায় না। পরমাণুগুলির অবয়ব সম্ভবত কণার মত সূক্ষ্ম। এবং এদের গড়ন সম্ভবত কঠিন ও গোল। 'সম্ভবত' বলা হ'ল এজন্যে যে এদের খাঁটি চেহারাটির পরিচয় বৈজ্ঞানিকেরা এখনো পাননি। মোটামুটি আন্দাজ করে বলা যায় যে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটি লাইনের উপর বড় জোর দশ লক্ষ থেকে এক কোটীর মত পরমাণু গায়ে গায়ে লাগিয়ে একসারে পাশাপাশি বসান যেতে পারে। আরো একটু এগিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় একজন সাধারণ মানুষের দেহ কতটি পরমাণু দিয়ে গড়া তার উত্তর হবে প্রায় ১০০০,০০০০০০০০,০০০০০০০,০০০০০০০০টি অর্থাৎ দশ হাজার কোটীর কোটীর কোটী পরমাণুর ইট দিয়ে গড়া একজন মানুষের দৈহিক অট্টালিকা।

বিরানব্বুইটি মৌলিক পরমাণুর জাত ও স্বভাব কিন্তু একরকম নয়। ওজনে ও স্বভাবে এদের প্রকৃতিতে কারো সঙ্গে কারো মিলে না। সবাই আলাদা আলাদা। বিরানব্বুইটি পরমাণু পরস্পরের দেহের গড়ন ও স্বভাব এক রকমের না হ'লেও নিজ নিজ জাতের পরমাণুরা ওজনে, গুণে ও স্বভাবে সবাই একরকম। কোলার খনি, দক্ষিণ আমেরিকার খনি, গংগার তট বা যে কোন জায়গায় পাওয়া সোনার পরমাণুগুলি স্বভাবে ও গুণে একই রকম। এই বিরানব্বুই জাতের বিভিন্ন পরমাণুর একটি পরমাণুকেও ভাংগাও যায় না গড়াও যায় না। এরা অজর ও অমর এবং বস্তুজগতের আদিম বাসিন্দা। উনিশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক পদার্থ পরমাণুর এরূপ পরিচয়ই পেয়েছিলেন। পরমাণুর প্রত্যেকের ওজনের কারো সংগে কারো মিল নেই। প্রত্যেকের ওজনও প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা। বিষয়টি আরো খুলে বলা দরকার। সমান বাটির এক বাটি সোনা এবং এক বাটি লোহার ওজন সমান নয়। এ সাধারণ পার্থক্যটি সবারই জানা। কারণ সবাই জানে সোনা লোহার

চেয়ে ভারী। এ জানা কথা থেকে মোটামুটি বুঝতে পারি একটি সোনার পরমাণু লোহার পরমাণুর চেয়ে ভারী। পরমাণুরা আকারে যেমন সূক্ষ্ম, ওজনে তেমনি ক্ষীণ। হাইড্রোজেন হ'ল বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হ'ল •০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১৪ গ্রাম অর্থাৎ এক গ্রামকে দশ কোটীর কোটী ভাগ করলে যা হয় তার চোদ্দ ভাগের সমান। এরূপ ক্ষীণ ওজন—যার কল্পনা করাই মুশকিল—তাকে নিয়ে বিজ্ঞানে হামেশা গোনা ও মাপার কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের ওজনের একটা ডাক নাম বের করেছেন। হাইড্রোজেন সব চেয়ে হালকা পদার্থ। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ধরা হয়েছে এক। হাইড্রোজেনের চেয়ে যত গুণ ভারী হবে অপর কোন মৌলিক পদার্থ, হাইড্রোজেনের পরমাণুর তত গুণকে ধরা হবে সেই মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন সংখ্যা। অক্‌সিজেন হাইড্রোজেনের চেয়ে ষোল-গুণ বেশি ভারী। তাই অক্‌সিজেনের পরমাণুর ওজন সংখ্যা ধরা হয়েছে—১৬। লোহা হাইড্রোজেনের চেয়ে ছাপ্পান্ন গুণ ভারী। সুতরাং লোহার পরমাণুর ওজন সংখ্যা হ'ল—৫৬, সোনার—১৯৭ এবং সীসার—২০৭। বিজ্ঞানে কোন বস্তুর পরমাণবিক ওজনের কথা যখনই উল্লেখ করা হবে তখনই বুঝতে হবে হাইড্রোজেনের অনুপাতে পরমাণুর ওজনের কথা। পরমাণুর আসল ওজন না ধ'রে এই আনুপাতিক সংখ্যাটিকে পরমাণবিক ওজন ধরা হয়। যদি বলা হয় রূপার পরমাণবিক ওজন ১০৮ তবে বুঝতে হবে ১০৮ গ্রাম নয়, রূপার পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর ১০৮ গুণ ভারী। পরে পরমাণুর ওজন মাপার নিয়ম একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। কায়দা ও নীতি একই রকম রয়ে গেছে। শুধু ওজনগুলিকে হাইড্রোজেনের সংগে তুলনা না ক'রে অক্‌সিজেনের পরমাণবিক ওজন ধরা হয়েছে ষোল এবং অন্য মৌলিক পদার্থগুলির ওজন অক্‌সিজেনের সংগে তুলনা ক'রে ঠিক করা হয়েছে। আগে হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজন ছিল এক এখন অক্‌সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজন হ'ল ১•০০৮। এই পরিবর্তনটি করা হয়েছে পরমাণবিক ওজনের মাপার কাজটি সহজ ও নির্ভুল করার জন্য। মৌলিক পদার্থ গুলির নাম, নামের সংক্ষিপ্ত প্রতীক ও পরমাণবিক ওজনের একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

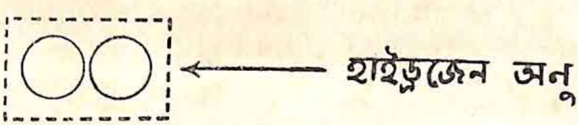
মৌলিক পদার্থের নাম, সাংকেতিক নাম ও পরমাণবিক ওজন সংখ্যা

সংখ্যা	নাম	সাংকেতিক নাম	পরমাণবিক ওজন	সংখ্যা	নাম	সাংকেতিক নাম	পরমাণবিক ওজন
১	হাইড্রোজেন	H	১·০০৮	৩৯	ইট্রিয়াম	Y	৮৯·৬
২	হিলিয়াম	He	৪·০০	৪০	জারকনিয়াম	Zr	৯০·৬
৩	লিথিয়াম	Li	৬·৯	৪১	নিওবিয়াম	Nb	৯৩·৫
৪	বেরিলিয়াম	Be	৯·১	৪২	মলিবডেনাম	Mo	৯৬·০
৫	বোরন	B	১১	৪৩			
৬	কার্বন	C	১২·০	৪৪	রুথেনিয়াম	Ru	১০১·৭
৭	নাইট্রোজেন	N	১৪	৪৫	রোডিয়াম	Rh	১০২·৯
৮	অক্সিজেন	O	১৬	৪৬	প্যালাডিয়াম	Pd	১০৬·৭
৯	ফ্লোরিণ	F	১৯	৪৭	রূপা	Ag	১০৭·৮
১০	নিয়ন	Ne	২০·২	৪৮	ক্যাডমিয়াম	Gd	১১২·৮
১১	সোডিয়াম	Na	২৩·০	৪৯	ইণ্ডিয়াম	In	১১৪·৮
১২	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	২৪·৩	৫০	টিন	Sn	১১৮·৭
১৩	এ্যালুমিনিয়াম	Al	২৬·৯	৫১	এ্যন্টীমনি	Sb	১২১·৭
১৪	সিলিকন	Si	২৮·১	৫২	টেলুরিয়াম	Te	১২৭·৫
১৫	ফসফরাস	P	৩১·০৪	৫৩	আইডিন	I	১২৬·৯
১৬	গন্ধক	S	৩২·০৬	৫৪	জিনন	X	১৩০·২
১৭	ক্লোরিণ	Cl	৩৫·৪	৫৫	সিজিয়াম	Cs	১৩২·৮
১৮	আরগণ	A	৩৯·৪	৫৬	বেরিয়াম	Ba	১৩৭·৩
১৯	পটাসিয়াম	K	৩৯·১	৫৭	ল্যানথেনাম	La	১৩৭
২০	ক্যালসিয়াম	Ca	৪০·০	৫৮	সিরিয়াম	Ce	১৪০·২
২১	স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	৪১·১	৫৯	প্রেসিওডিমিয়াম	Pr	১৪০·৯
২২	টাইটেনিয়াম	Ti	৪৮·১	৬০	নিওডিসিয়াম	Nd	১৪৪ ৩
২৩	ভেনাডিয়াম	V	৫১·০	৬১			
২৪	ক্রোমিয়াম	Cr	৫২·০	৬২	সামারিয়াম	Sm	১৫০·৪
২৫	ম্যাঙ্গানিজ	Mn	৫৪·৯	৬৩	য়ুরপিয়াম	Eu	১৫২
২৬	লোহা	Fe	৫৫·৮	৬৪	গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	১৫৭·৩
২৭	কোবল্ট	Co	৫৮·৯	৬৫	টেরবিয়াম	Tb	১৫৯·২
২৮	নিকেল	Ni	৫৮·৬	৬৬	ডিসপ্রাসিয়াম	Dy	১৬২·৫
২৯	তামা	Cu	৬৩·৫	৬৭	হলমিয়াম	Ho	১৬৩·৫
৩০	জিঙ্ক	Zn	৬৫·৩	৬৮	এরবিয়াম	Er	১৬৭·৭
৩১	গ্যালিয়াম	Ga	৭০·১	৬৯	থুলিয়াম	Tm	১৬৪·৫
৩২	জারমেনিয়াম	Ge	৭২·৫	৭০	ইটারবিয়াম	Yb	১৭৩ ৫
৩৩	আরসেনিক	As	৭৪·৯	৭১	লুটেসিয়াম	Lu	১৭৫·০
৩৪	সিলেনিয়াম	Se	৭৯·২	৭২	হাফনিয়াম	Hf	
৩৫	ব্রোমিন	Br	৭৯·৯	৭৩	ট্যাণ্টেসাম	Ta	১৮১·৫
৩৬	ক্রিপটন	Kr	৮২·৯	৭৪	ট্যাংগষ্টেন	W	১৮৪·০
৩৭	রুবিডিয়াম	Rb	৮৫·৪	৭৫		Re	
৩৮	ষ্ট্রনসিয়াম	Sr	৮৭·৬	৭৬	অসমিয়াম	Os	১৯০·৯

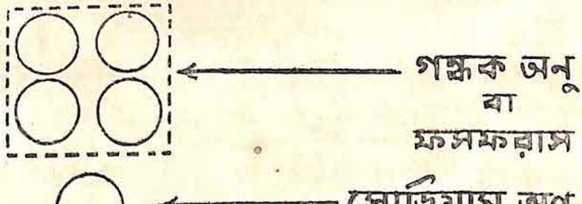
সংখ্যা	নাম	সাংকেতিক নাম	পরমাণবিক ওজন	সংখ্যা	নাম	সাংকেতিক নাম	পরমাণবিক ওজন
৭৭	ইরিডিয়াম	Ir	১৯৩·১	৮৫			
৭৮	প্লাটিনাম	Pt	১৯৫·২	৮৬	নিটন	Rn	
৭৯	সোনা	Au	১৯৭·২	৮৭			
৮০	পারদ	Hg	২০০·৬	৮৮	রেডিয়াম	Ra	২২৬·০
৮২	থেলিয়াম	Tl	২০৪·০	৮৯	এ্যাকটিনিয়াম	Ac	২২৬
৮১	সীসা	Pb	২০৭·২	৯০	থোরিয়াম	Th	২৩২·১
৮৩	বিসমাত	Bi	২০৯·০	৯১	প্রটোঅ্যাকটিনিয়াম	Pa	২৩০
৮৪	পোলোনিয়াম	Po	২১০ (?)	৯২	য়ুরেনাম	U	২৩৮·২

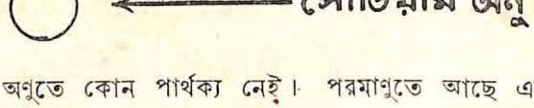
অণু (Molecules)

দেখা গেল বস্তুজগতের মূল বাসিন্দা হ'ল বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু। এরা বস্তুজগতের আদি ও অকৃত্রিম বাসিন্দা হ'লেও এরা কিন্তু পরমাণুরূপে সাধারণতঃ বাস করে না। বাস করে অণু বা 'মলিকুল' রূপে। প্রকৃতি-জগতে কয়েকটি জাতের ছাড়া বাকী পরমাণুরা সবাই বাস করে দল



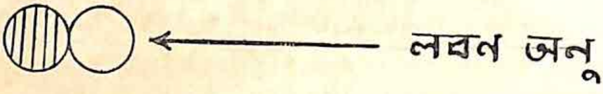
বেঁধে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সোনা, রূপা, সীসা, পারদ ইত্যাদি ধাতব জাতের পরমাণুরা স্বাধীনভাবেই বাস করতে পারে বস্তুজগতে। এদের





পরমাণু এবং অণুতে কোন পার্থক্য নেই। পরমাণুতে আছে একটি কণা, অণুতেও আছে একটি কণা। ইচ্ছে করলেও অনেক অধাতব পরমাণু একা

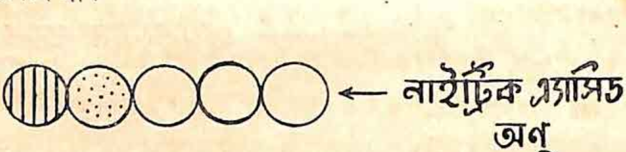
একা স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে না। দল বেঁধেই বাস করতে হবে এদের। পরমাণুর এরূপ দলের নামই হ'ল অণু, যার ইংরেজী নাম হ'ল 'মলিকুল' (Molecule)। পরমাণুরা তুরকম ভাবে দল গ'ড়তে পারে।



একরকম হ'ল এক জাতেরই একটি পরমাণুতে একটি দল গড়া অথবা তুটি, তিনটি বা চারটি পর্যন্ত একজাতের পরমাণু নিয়ে দল গড়া। হাইড্রোজেন অণু তুটি পরমাণু দিয়ে গড়া। তুটির বেশি হাইড্রোজেন পরমাণু কোন



অবস্থায়ই হাইড্রোজেন অণুতে পাওয়া যাবে না। ফসফরাস ও আরসেনিক অণুতে আছে চার চারটি পরমাণু। ফসফরাস বা আরসেনিক অণুকে চারটে পরমাণু নিয়ে দল বাঁধতে হবে, একটি বেশিও নেওয়া চলবে না, একটি কমও নেওয়া চলবে না।



দ্বিতীয় রকমের অণু হ'ল যৌগিক অণু। তুই, তিন, চার এমন কি হাজার হাজার পরমাণু নিয়ে যৌগিক অণু গ'ড়ে উঠতে পারে। লবণ একটি খুব সহজ অণু। লবণে আছে একটি সোডিয়াম পরমাণু এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু। জলে আছে তুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু। নাইট্রিক এ্যাসিড অণুতে আছে একটি হাইড্রোজেন, একটি নাইট্রোজেন এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু। চিনির অণু খুঁজলে পাওয়া যাবে চারটি কারবন, বাইশটি হাইড্রোজেন ও এগারটি অক্সিজেন পরমাণু। একটি অণুতে পরমাণুর সংখ্যা যে হাজারের বেশিও হতে পারে তার প্রমাণ আলু, চাল বা বার্লি অর্থাৎ

স্টার্চ জাতীয় বস্তুর অণু! একটি আলুর অণুতে আছে বারশ' কারবন, বিশশ' হাইড্রোজেন, দশশ' অক্সিজেন পরমাণু। বস্তু জগতে এ'রকম অজস্র যৌগিক বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে যার মূলে রয়েছে এমনিতর যৌগিক অণু। প্রতিদিন বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে এরূপ যৌগিক অণুর সন্ধান চলছে—কোন্ অণুতে কয়টি পরমাণু আছে, তারা ঘর বেঁধে আছেই বা কেমন ক'রে। সহস্র সহস্র যৌগিক অণুর অন্দরমহলের সংবাদ ও সংগঠনের পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু আজও লক্ষ লক্ষ যৌগিক অণুর পরিচয় মেলেনি। কয়লা কয়টি পরমাণু দিয়ে গড়া? কয়লার মধ্যে পরমাণুরা সার বেঁধে আছে কোন্ নকসায়? গাছপালা মানুষের দেহ কারবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন দিয়ে গড়া। কিন্তু এসব দেহে অণুর দানা কয়টি পরমাণু দিয়ে গড়া? কেমনতর নমুনায় গড়া? আজও বিজ্ঞান এর উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু অবিরাম চলছে প্রকৃতির রাজ্যে অজস্রভাবে ছড়িয়ে থাকা এই সব মৌলিক অণুর পারিবারিক পরিচয়ের অন্বেষণ। এসব অণুকণার আয়তন বা আকারের পরিমাপ কী? উদাহরণ দিয়ে বললে উত্তরটি ধারণাযোগ্য হবে। কল্পনা করা যাক এক ফোঁটা জল বেলুনের মত ফুলিয়ে ফুলিয়ে আমাদের পৃথিবীর মত বড় আকারের করা হ'ল। এক ফোঁটা জলকে এমনিতর পৃথিবীর মত বড় করতে পারা গেলে জলের অণুগুলিকে আমরা দেখতে পেতাম এক একটি ক্রিকেট বলের মত। এই ক্রিকেট বলগুলির সংখ্যা হ'ত কত? আমাদের পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোক যদি সেকেণ্ডে এরূপ তিনটি ক'রে ক্রিকেট বল গুণতে পারে, তা'হ'লে পৃথিবীর মোট দু'শ কোটী লোক যদি দশহাজার বছর ধ'রে গুণে যায় তবে এই বলগুলির মোট সংখ্যার হিসেব আমাদের বলতে পারবে, অর্থাৎ এক ফোঁটা জলে রয়েছে প্রায় দুই লক্ষ কোটী কোটী জলের অণুকণা।

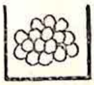
তা' হ'লে জানা গেল এই বস্তু জগতের মূলে রয়েছে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থেরা বস্তুজগতে ছড়িয়ে রয়েছে মৌলিক বা যৌগিক অণুরূপে। বস্তুর যে অজস্র রূপ তা মৌলিক পদার্থেরই অণুরূপ। মানুষ বস্তুর যে প্রথম পরিচয় লাভ করে তা' এই অণুকণারই পরিচয়। তাই মানুষ খোলাখুলিভাবে মৌলিক পদার্থগুলিকে দেখতে পায় না, দেখতে পায় জল, মাটি, বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তুর দেহের মধ্যে পুঞ্জীভূত পদার্থের অণুকণাগুলিকে। সোনা, রূপা, টিন, পারদ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুকে মৌলিক পদার্থরূপেই বস্তুজগতে স্বাধীনভাবে পাওয়া যায় বটে,

কিন্তু বেশির ভাগ মৌলিক পদার্থ ই লুকিয়ে আছে অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। স্বাধীনভাবে এদের পাওয়াই যায় না বস্তুজগতে। এই যৌগিক বস্তুগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রেই তবে মৌলিক পদার্থগুলির অস্তিত্বের প্রথম পরিচয় পেয়েছেন বৈজ্ঞানিকেরা। লোহা ও এ্যালুমিনিয়মের মত এত কাজের জিনিষের অস্তিত্বের প্রথম খবর পেতে হয়েছে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ ক'রে।

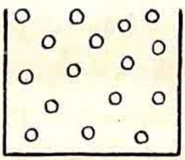
মৌলিক পদার্থের শৃংখলা

মৌলিক পদার্থের খবর যখন জানা গেল তখন বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগল,—এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে কি ঐক্য আছে? ওজনে তো এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে ভিন্ন এটা জানাই গেছে, কিন্তু দেখা যায় বস্তুজগতে বসবাস করবার বেলায় এবং একে অন্যের সঙ্গে মিলে যৌগিক বস্তু গড়ে তোলবার বেলায় এদের অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা মিল আছে। সাধারণ অবস্থায় কোন কোন মৌলিক পদার্থ থাকে গ্যাসরূপে, কোন কোনটি থাকে তরল পদার্থরূপে, আবার কাউকে কাউকে কঠিন পদার্থরূপেও পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, উদাসী গ্যাস ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় গ্যাসরূপে, পারদ ও সিজিয়ামকে মিলে তরলরূপে, আবার সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদিকে মিলে কঠিন পদার্থরূপে। কিন্তু ঐরূপ অবস্থার মিলটা বস্তুদের পরস্পরের ঐক্যের কোন পাকাপাকি ইঙ্গিত নয়। বরফকে গরম করলে গ'লে যায় তরল জলে, আবার জলকে উত্তপ্ত করলে জল রূপান্তরিত হয়ে যায় জলীয় বাষ্পরূপে। এমনিতর যে কোন কঠিন পদার্থকে—লোহা হ'ক বা সোনাই হ'ক—যদি ক্রমে ক্রমে তাপ দেওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে কঠিন বস্তু প্রথমে গ'লে গিয়েছে তরল পদার্থে। তরল পদার্থ আবার রূপান্তরিত হয়েছে গ্যাসে। উল্টো দিক দিয়ে যে কোন গ্যাসকে ঠাণ্ডা ক'রে জমান যায় তরল বস্তুতে। আগে ঠাণ্ডা ক'রে তরল পদার্থকে শক্ত ক'রে তোলা যায় কঠিন পদার্থে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, উদাসী গ্যাস বা যে কোন গ্যাসকে ঠাণ্ডা ক'রে জলের মত তরল করা যায় এবং তরল করা পদার্থকে আরো ঠাণ্ডা ক'রে একেবারে শক্ত ইটের মত ক'রে জমান যায়। যে ঠাণ্ডাতে বরফ জমে তার চেয়ে যদি আরো দুশ' তিয়াত্তর (২৭৩°) ডিগ্রী নীচে তাপ কমান যায় অর্থাৎ ঠাণ্ডা করা যায় তবে এমন কোন গ্যাস নেই যা জ'মে বরফের মত

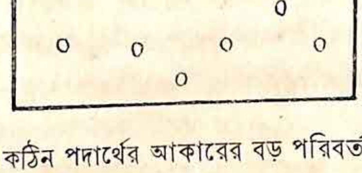
শক্ত হয়ে না যাবে। তাই কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় সাধারণতঃ পদার্থগুলিকে পাওয়া যায়—কিন্তু কঠিন, তরল ও গ্যাসের দেয়াল দিয়ে বস্তুকে কোনপ্রকার পাকাপাকি ভাগ করা সম্ভব নয়। পদার্থগুলি পরমাণুকণা দ্বারা গঠিত একথা স্মরণ রাখলে বস্তুর এরূপ তিন অবস্থা কেন তা' সহজেই বলা



যায়। যে সব পরমাণু নিয়ে বস্তু গড়া সেই পরমাণু-কণাগুলি দুষ্ট শিশুর মত সদাচঞ্চল। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি এদের চলছেই সব সময়ে। পদার্থ যখন



কঠিন অবস্থায় থাকে তখন পরমাণু বা অণুকণাগুলির চাঞ্চল্য এত কম থাকে যে তাদের প্রকৃতিটি শান্ত ও স্থির স্বভাবেরই বলা চলে। তাই স্বাভাবিক



অবস্থায় কঠিন পদার্থের আকারের বড় পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তরল অবস্থায় পরমাণু-কণাগুলি চঞ্চল হয়ে এদিকে সেদিকে জোর কদমে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে। যদি কোন কঠিন পদার্থ এদের হাঁটা চলাতে বেড়া হয়ে বাধা না দেয় তবে এরা চলতেই থাকে এদিকে সেদিকে। অবশ্যি পরস্পরের প্রতি একটা টান আছে বলে একেবারে চিরকালের মত একে অন্যকে ছেড়ে যেতে পারে না। তাই তরল পদার্থকে যেই কোন পাত্রে রাখা যায় তরল পদার্থটি

অমনি পাত্রের আকার ধারণ করে। পরমাণুর চাঞ্চল্য যখন বেসামাল হয়ে যায় তখন কণাগুলি এদিকে সেদিকে বিষম বেগে ছোটাছুটি করতে থাকে। পরস্পরের প্রতি কোন মায়া কোন টানই আর এদের টেনে রাখতে পারে না। যদি কোন কঠিন পাত্রের বেড়া দিয়ে এঁটে না রাখা যায় তবে যেদিক দিয়ে খোলা রাস্তা পাবে সেদিক দিয়েই বুলেটের মত ছুটে পালিয়ে যাবে আকাশের দিকে গ্যাস হয়ে। সুতরাং পদার্থের অবস্থান্তরটি কিছুই নয়, পরমাণুর চঞ্চলতার তারতম্য মাত্র।

ধাতু, অধাতু ও উপধাতু

পদার্থের মধ্যে আরেক রকমের পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন পদার্থ চকচকে কঠিন, ঘা খেলে বেশ কনকনে আওয়াজ দেয়, হাতুড়ি মেরে নানা আকারে গড়ে পিটে নেওয়া যায়। শুধু তাই নয় গরম করলে এরা চটপট গরম হয় আবার চটপট ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বহন করতেও কোন দ্বিধা করে না। আর পজিটিভ তড়িতের দিকে এদের টানটাও বেশি। তাই এই সব পদার্থগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ধাতব পদার্থ। যেমন সোনা, রূপা, লোহা ধাতব পদার্থ। যে পদার্থের স্বভাব ধাতব পদার্থের মত নয় তাদের বলা হয় অধাতব পদার্থ। হাইড্রোজেন, গন্ধক, অক্সিজেন ইত্যাদি অধাতব বস্তু। আবার এ্যান্টিমনি ও আরসেনিকের মত পদার্থও আছে যারা এ-দলেও নয় ও-দলেও নয়। এদের নাম দেওয়া যায় উপধাতু।

পর্যাবৃত্ত তালিকা (Periodic Table)

মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজন একে একে জানা গেলে মৌলিক পদার্থের অনেকের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখা গেল। দেখা গেল স্বভাব চরিত্রে কারো কারো মধ্যে বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা ভাবলেন এ মিলটা কি পদার্থের খামখেয়ালীপনা, না পদার্থের গুণাগুন ও স্বভাবের সঙ্গে পরমাণুর ওজনের একটা যোগ রয়েছে? আরো ভাবলেন পদার্থের স্বভাবের চাবিকাঠি কি পরমাণুর ওজনে? মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মিলমিশ দেখে দেখে বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দলে দলে ভাগ করার চেষ্টা করলেন। মৌলিক পদার্থগুলিকে সুশৃংখল ভাবে সার বেঁধে সাজান গুছানর কাজে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃতিত্বের

পর্যাবৃত্ত তালিকা (Periodic Table)

		১ম পরিবার		২য় পরিবার		৩য় পরিবার		৪র্থ পরিবার		৫ম পরিবার		৬ষ্ঠ পরিবার		৭ম পরিবার		৮ম পরিবার	উদাসী পরিবার
		(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর	(ক) ঘর	(খ) ঘর		
১ম সার		H															He
২য় সার		Li		Be		B			C		N		O		F		Ne
৩য় সার		Na		Mg		Ae			Li		P		S		Cl		A
৪র্থ সার	জোড় পংক্তি	K		Ca		Se		Ti		V		Cr		Mn		Fe Co Ni	X
	বেজোড় পংক্তি		Cu		Zn		Ga		Ge		As		Se		Br		
৫ম সার	জোড় পংক্তি	Rb		Sr		Y		Zr		Nb		Mo		*		Rn Rh Pd	Kr
	বেজোড় পংক্তি		Ag		Cd		In		Sn		Sb		Te		I		
৬ষ্ঠ সার	জোড় পংক্তি	Cs		Ba						Ta		W		*		Os Ir Pt	Em
	বেজোড় পংক্তি		An		Hg		Te		Pb		Bi		Po		*		
৭ম সার		87		Ra		Ac		Th		Pa		U					
বিরল মাটি		La Tb		Ce Ds		Pr Ho		Nd Er		* Tu I		Sm Ad		Eu Cp		Gd Tu II	

পরিচয় দিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক লোথারমেয়ার ও রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলিফ। এঁরা কাজটি করলেন কেউ কারো গবেষণার খবর না জেনেই। গবেষণার কাজ প্রকাশ হলে বোঝা গেল দু'জনে আলাদা আলাদা প্রায় একই বিষয় আবিষ্কার করেছেন।

বৈজ্ঞানিকদ্বয় লক্ষ্য করলেন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলছে। এই ক্রমে ক্রমে ওজন বেড়ে যাওয়া মৌলিক পদার্থগুলিকে একটার পর একটা সার বেঁধে সাজিয়ে বসালে পদার্থদের মধ্যে একটা আশ্চর্য রকম মিল দেখা গেল। হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজন এক, তাই হাইড্রোজেনকে বসান হ'ল সবার আগে। হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন চার। একের এবং চারের মধ্যে আর কোন পরমাণবিক ওজনের পদার্থ নেই। তাই হাইড্রোজেনের পর বসান হ'ল হিলিয়ামকে; হিলিয়ামের পরে সাত পরমাণবিক ওজনের লিথিয়ামকে, লিথিয়ামের পর নয় পরমাণবিক ওজনের বোরণকে। এমনি ক'রে পর পর বেড়ে যাওয়া পরমাণবিক ওজনের মৌলিক পদার্থগুলিকে সারে সারে বসান হ'ল। দু'শ আটত্রিশ (২৩৮) পরমাণবিক ওজনের সব চেয়ে ভারী পদার্থ য়ুরেনামের আসন দেওয়া হ'ল সবার শেষে। বিরানব্বুইটি পদার্থকে সাতটি সারে পর পর একটির নীচে আরেকটি বসিয়ে বেশ একটা সুশৃংখল তালিকা তৈরী করা হ'ল। প্রথম সারে বসল দুটি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারে আটটি। চতুর্থ ও পঞ্চম সারে আঠারটি। ষষ্ঠ সারে বত্রিশটি এবং সপ্তম সারে বসল ছয়টি মৌলিক পদার্থ। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারের মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এক একটি লম্বা সারকে দুটি সারে সাজান হ'ল। এমনি করে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজান হ'লে দেখা গেল পদার্থগুলি কয়েকটি পরিবারে ভাগ হয়ে গেছে। উপর থেকে নীচে খাড়াভাবে বসে আছে এক এক পরিবারের সভ্যেরা। উদাসী পরিবারে রয়েছে উদাসী গ্যাসগুলি। উদাসী পরিবার এবং শেষের পরিবারটি ছাড়া বাকী সাতটি পরিবারকে আবার ভাগ ভাগ ক'রে দুটি সারে গুছান হ'ল। মেণ্ডেলিফের এই তালিকায় প্রতিটি পরিবারের নিজ সভ্যদের পরমাণবিক ওজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য পাওয়া গেল। প্রথম পরিবারে (ক) সারের সোডিয়ামের পরমাণবিক ওজনের সংগে ষোল যোগ দিলে ঠিক নীচে বসা পটাসিয়ামের পরমাণবিক ওজন পাওয়া যায়। আবার পটাসিয়ামের সংগে ষোল যোগ দিলে মিলে রুবিডিয়ামের সংখ্যা। রুবিডিয়ামের সঙ্গে ষোল যোগ দিলে মিলে সিজিয়ামের সংখ্যা,

অর্থাৎ পর পর উপরে নীচে বসা যে কোন দুটি সভ্যের পরমাণবিক ওজনের মোটামুটি পার্থক্য হ'ল যোল। শুধু প্রথম পরিবারেই নয়, যে কোন পরিবারের এক এবং যে কোন ঘরের পর পর উপরে নীচে বসা দুটি সভ্যের পরমাণবিক ওজনের পার্থক্য পাওয়া যাবে যোল। মেণ্ডেলিফ চট ক'রে প্রশ্ন করলেন, এই যোল সংখ্যাটির অর্থ কি? মেণ্ডেলিফ একে একে প্রত্যেকটি পরিবারের এবং প্রত্যেকটি ঘরের সভ্যদের গুণাগুণ ও স্বভাব তুলনা ক'রে দেখতে লাগলেন। তুলনা শেষ ক'রে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন প্রত্যেক পরিবারের এবং প্রত্যেক ঘরের সভ্যদের স্বভাবচরিত্রে একটা আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে। সভ্যদের ধাতব-চরিত্র প্রায় একই রকমের। তা' ছাড়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সংগে বন্ধুত্ব পাতাবার ক্ষমতায়ও বিশেষ ঐক্য রয়েছে। উদাসী পরিবারের সব কয়টি মৌলিক পদার্থ একেবারে নিরেট, বেরসিক এবং একাচোরা। কারো সংগে এরা মিলতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত এমন একটি যৌগিক বস্তু পাওয়া যায়নি যার মধ্যে উদাসী গ্যাসের কোন সভ্য যুক্ত হয়ে আছে। গবেষণাগারেও উদাসী গ্যাসদের কারো সংগে অন্য কোনো মৌলিক পদার্থের মেলান সম্ভব হয়নি। প্রথম পরিবারের কাউকে যদি অক্সিজেনের সংগে জোট বাঁধতে হয় তবে একটি অক্সিজেন পরমাণুর জন্য যে কোন সভ্যকে দুটি পরমাণু খরচ করতে হবে। দ্বিতীয় পরিবারের যে কোন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সংগে মাত্র একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলতে পারে। তৃতীয় পরিবারের যে কোন পদার্থের পরমাণুর সংগে মিলতে হ'লে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু লাগবে। এমনি ক'রে পর পর ডান দিকের পরিবারের দিকে এগুলে দেখা যাবে সভ্যদের অক্সিজেনের সংগে মিলবার ক্ষমতাটি বেড়ে গিয়ে অষ্টম পরিবারে চার পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এক পরিবারের সভ্যদের জোট বাঁধবার ক্ষমতা সবারই এক রয়ে গেছে। সবাই অক্সিজেনের সংগে মিলবার ক্ষমতায় সমান শক্তিমান। জোট বাঁধবার ক্ষমতা ছাড়া এক পরিবারের প্রতিটি সভ্যের প্রত্যেকেরই পজিটিভ বিদ্যুতের দিকে ঝোঁকটা প্রায় সমান এবং ডান দিকের পরিবারের সভ্যদের পজিটিভ বিদ্যুতের দিকে ঝোঁকটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলছে। তা' ছাড়া এক পরিবারের সভ্যদের প্রকৃতিতে প্রায় যেন একই অবস্থায় পাওয়া যায়। একজন সভ্য গ্যাসীয় হলে বাকী সব সভ্যের গ্যাসীয় হবার দিকে ঝোঁক থাকে। যেমন উদাসী গ্যাসেরা। একজন তরল হ'লে পরিবারের বাকী পদার্থদের তরল হওয়ার দিকে, কঠিন হ'লে

কঠিন হওয়ার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। অষ্টম পরিবারের সভ্যেরা প্রায় সবাই শক্ত ও কঠিন।

এ সমস্ত মিল দেখে মেণ্ডেলিফ সিদ্ধান্ত করলেন মৌলিক পদার্থের স্বভাব ও গুণ নির্ভর করে পদার্থের পরমাণবিক ওজনের ওপর এবং পদার্থের গুণাগুণ ও স্বভাব পরমাণবিক ওজন বাড়বার সংগে সংগে চাকার মত ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে অর্থাৎ বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের স্বভাব আলাদা আলাদা প্রায় নয় রকমের।

মেণ্ডেলিফের সময়ে অনেক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার বাকী ছিল তবু মোটামুটি জানা গিয়েছিল সর্বসাকল্যে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বিরানব্বুইটির বেশি হবে না। বাকী অজানা মৌলিক পদার্থগুলি যেদিনই আবিষ্কৃত হ'ক না কেন, তাদের পরমাণবিক ওজন য়ুরেনামের চেয়ে বেশি হবে না। তিনি বিরানব্বুইটি পদার্থেরই একটি তালিকা করলেন এবং যে যে মৌলিক পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হয়নি তখনো, তিনি সেই অজ্ঞাতদের জন্য জায়গায় জায়গায় ফাঁক রেখে দিলেন। এই তালিকার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে কয়েকটি পদার্থ তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হলেও তাদের পরমাণবিক ওজন ও স্বভাবসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেণ্ডেলিফের সময় চতুর্থ সারের স্ক্যাণ্ডিয়াম, গেলিয়াম ও জারমেনিয়াম আবিষ্কৃত হয়নি। রাম না জন্মাতে রামায়ণ রচনার মত মেণ্ডেলিফ কিন্তু আগেই এদের নাম ও কোষ্ঠী ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। গেলিয়ামের নাম দিয়েছিলেন একা-এ্যালুমিনিয়াম এবং জারমেনিয়ামের নাম একা-সিলিকন, অর্থাৎ তিনি আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন অনাবিষ্কৃত পদার্থগুলি গুণে ও স্বভাবে বোরণ, এ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকনের মত হবে। শুধু তাই নয় এদের পরমাণবিক ওজন কত হবে, এদের ঘনত্ব কত হবে, দেখতে কেমন হবে, কত ডিগ্রী উত্তাপে এরা গ'লে তরল হবে, অন্যান্য পদার্থের সংগে এদের মিলবার ক্ষমতা কেমন হবে—এমনি তর সব ভবিষ্যৎ বাণী তিনি আগে থেকেই ক'রে রেখেছিলেন। পদার্থগুলি আবিষ্কৃত হলে মেণ্ডেলিফের কথা আশ্চর্য ভাবে প্রায় হুবহু মিলে গেল। মেণ্ডেলিফ আরো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এই তালিকা রচনা ক'রে। তিনি যখন তালিকা রচনা করেছিলেন তখন বেরিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন ঠিক করা হয়েছিল তের (১৩) এবং ইণ্ডিয়ামের ছিয়াত্তর (৭৬). বেরিলিয়ামের 'ষোল' সংখ্যার রহস্য অনুযায়ী তিনি দেখলেন চৌদ্দ এবং বার এর

মাঝে কোন পরমাণবিক ওজনের মৌলিক পদার্থ থাকাই সম্ভব নয়। তখন তিনি জোর ক'রে বললেন বেরিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন তের (১৩) হ'তেই পারে না, হবে নয় (৯)। তিনি দেখালেন তালিকার শৃংখলা অনুযায়ী বেরিলিয়ামের আসন হবে লিথিয়াম ও বোরণের মাঝখানে, কারবন ও নাইট্রোজেনের মাঝখানে নয়। ইণ্ডিয়ামের বেলায়ও তিনি বললেন ইণ্ডিয়ামের পরমাণবিক ওজন ছিয়াত্তর (৭৬) হবে না—হবে একশ চৌদ্দ (১১৪) এবং এর আসন হবে ক্যাড্মিয়াম ও টিনের মাঝখানে। পরে মেণ্ডেলিফের কথাই সত্য হল। দেখা গেল মেণ্ডেলিফের আগের বৈজ্ঞানিকেরা বেরিলিয়াম ও ইণ্ডিয়ামের পরমাণবিক ওজন মাপায় ভুল করেছিলেন। মেণ্ডেলিফের তালিকার জয়জয়কার হ'ল।

কেউ অবশ্যি প্রশ্ন করতে পারেন ম্যাগনেসিয়ামের পরমাণবিক ওজন হ'ল চব্বিশ এবং এর পাশের পদার্থ এ্যালুমিনিয়ামের পরমাণবিক ওজন হ'ল সাতাশ। কিন্তু পঁচিশ বা ছাব্বিশ পরমাণবিক ওজনের কোন মৌলিক পদার্থ তো একদিন আবিষ্কৃত হতে পারে? কিন্তু মেণ্ডেলিফের তালিকা যদি মানতে হয় তা' হ'লে বলতে হবে এরূপ ওজনের কোন পদার্থ কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না। কারণ আসলে এদের অস্তিত্বই নেই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এখন নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মেণ্ডেলিফের তালিকার যে কোন দুটি পদার্থের মাঝখানে বসবার মত নতুন কোন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বই নেই এবং মৌলিক পদার্থের সংখ্যাও বিরানব্বুইটির বেশি নয়। [যে মৌলিক পদার্থগুলি তখনো আবিষ্কৃত হয় নি মেণ্ডেলিফ নিজেই তাদের জন্য খালি আসন রেখে দিয়েছিলেন।]

মেণ্ডেলিফ ও লোথারমেয়ার রসায়নবিজ্ঞানে এক যুগান্তর এনে দিলেন। তাঁদের আবিষ্কারের ফলে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের সমাজে একটা সুশৃংখল ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল। রসায়নবিজ্ঞানের প্রগতির পথ খুলে গেল। এই পর্যাবৃত্ত তালিকার তাই এত নামডাক।

মৌলিক পদার্থের পর্যাবৃত্ত তালিকা তো রচিত হ'ল কিন্তু পরবর্তী বৈজ্ঞানিকেরা তন্ন তন্ন ক'রে এর পরীক্ষা করতে ছাড়লেন না। পরীক্ষাতে অনেকগুলি ত্রুটি ধরা পড়ল। প্রথম প্রশ্ন হ'ল, মৌলিক পদার্থগুলিকে আটটি, আঠারটি বা বত্রিশটি ক'রে ভাগ ভাগ ক'রে সার বাঁধা হ'ল কোন্ যুক্তির বলে? সাতটি, ন'টি, পনরটি ক'রেই বা সার বাঁধা হ'ল না কেন?

এর কোন যুক্তিসংগত উত্তর মেণ্ডেলিফের তালিকায় পাওয়া যায় না। তাছাড়া হাইড্রোজেনের আসন কোন্ পরিবারে হবে সেও এক সমস্যা। পটাসিয়াম আরগণের চেয়ে ওজনে কম হয়েও কেন যে আরগণের আগে বসবে, আইডিন কেন টেলুরিয়ামের আগে বসবে—এমনতর কয়েকটি মৌলিক পদার্থের আসনের পংক্তি ঠিক করার বেলায় মেণ্ডেলিফের নিজের যুক্তিই নিজের কাছে টিকল না। কারণ তিনি তালিকা রচনার সময় বলেছেন মৌলিক পদার্থের যার যত বেশি পরমাণবিক ওজন তারা তত বেশি আগে আসন পাবে। মেণ্ডেলিফের মৃত্যুর পরে অনাবিষ্কৃত পদার্থগুলির মধ্যে ষোলটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হ'ল। পরিমাণে এরা খুব কম মিলে পৃথিবীতে এবং এদের গুণাগুণ ও স্বভাব বিশেষভাবে একরকম। তাই এদের নাম হ'ল 'বিরলমাটি'। এই 'বিরলমাটি' মৌলিক পদার্থগুলির আবিষ্কারের পর এক মহা-মুশকিল হ'ল এদের আসন নিয়ে। মেণ্ডেলিফের তালিকায় এদের কোন ঠাঁই-ই দেওয়া চলে না। এই তালিকার কোন্ আসনে যে এদের বসান যায় এ নিয়ে নানা তর্ক উঠল বিজ্ঞানীদের মাঝে। কিন্তু মেণ্ডেলিফের তালিকা মেনে নিয়ে এর কোন মীমাংসা হ'ল না।

এত প্রশ্ন এবং ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু বলতে হবে মেণ্ডেলিফের পর্যাবৃত্ত তালিকা বিজ্ঞানের এক অজানা রাজ্যের সিংহ দুয়ার দিল খুলে।

পদার্থের পরিচয়

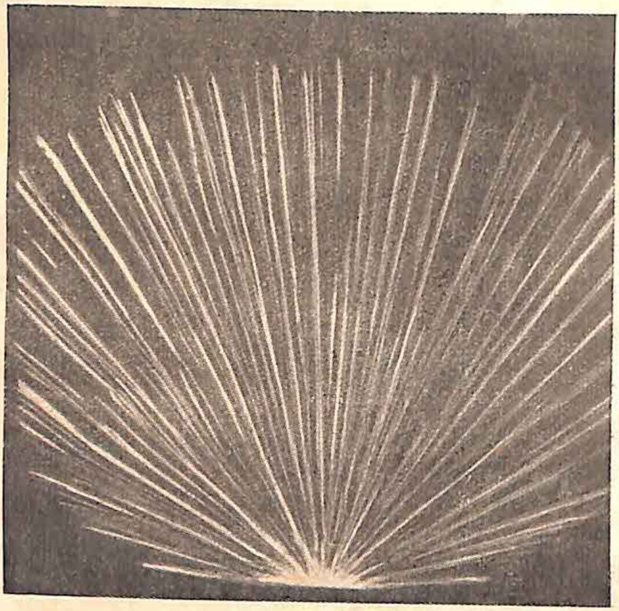
পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা মেণ্ডেলিফের তালিকা পর্যন্ত এসে কিছুকালের জন্য থেমে রইল। আপাতত বিজ্ঞানীরা মনে করলেন বস্তু বা পদার্থের মূল উপাদানের বুঝি একটা সন্ধান পাওয়া গেল। মাটি, জল, বাতাস ভেংগে ও বিশ্লেষণ ক'রে যেন বস্তুজগতের মূল উপাদানের পরিচয় জানা হ'ল। মৌলিক উপাদানের পরিচয়টি আর অজানা রইল না। কয়েকটি মৌলিক পদার্থ হাতে হাতে ধ'রে দেখা গেল না বটে, তবে তারা যে পালিয়ে পালিয়ে চিরদিন থাকতে পারবে না, একদিন না একদিন বিজ্ঞানীর হাতে ধরা পড়বেই সেকথা খুব সুস্পষ্ট ভাবেই জানা গেল। আরো জানা গেল বস্তুজগতের মৌলিক উপাদানের সংখ্যা বিরানব্বুইটি (৯২)। এর একটিও কম নয়। এমনি ভাবে বস্তুপদার্থের পৃথিবীটি ভাগ ভাগ হয়ে গেল বিরানব্বুইটি পৃথক সত্তায়। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড একমেবাদ্বিতীয়ম্ রইল না,

হ'ল বিরানব্বুই রকমের। এমনি ক'রে বস্তুজগৎকে ভেংগে বস্তু উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেলে ক্ষণিকের জন্য মনে হ'ল পদার্থের চূড়ান্ত খবর বুঝি জানা হয়ে গেল। কিন্তু পদার্থের চূড়ান্ত স্বরূপ জানার নিশ্চয় বিশ্বাসে প্রথম ঘা পড়ল মৌলিক পদার্থের পর্যাবৃত্ত তালিকা রচনার পরে। মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা তালিকা রচনা করলেন এবং হাতে হাতে এর নির্ভুলতা সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেলেন বটে। কিন্তু তবু কতগুলি ছোটখাট ত্রুটিও রয়ে গেল যার কোন মীমাংসাই সম্ভব হ'ল না। একটু ভুল বা তিল পরিমাণ সন্দেহও যদি রয়ে যায় কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে, তবে সে সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলা চলে না। মেণ্ডেলিফের তালিকার নির্ভুলতায় তাই প্রশ্ন রয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কি কায়দায় তিনি মৌলিক পদার্থের তালিকার নক্‌সা আঁকলেন, তার পিছনে কি যুক্তি, কি তার কারণ, তার কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। তবু হাতে-কলমে ফল পাওয়া যায় দেখে একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে মেণ্ডেলিফের তালিকার পিছনে একটা গভীর রহস্যময় সত্য লুকিয়ে আছে।

এই রহস্যকে জানবার প্রয়াসে প্রথম প্রশ্ন হ'ল মৌলিক পদার্থগুলি নিজেরাই যদি বস্তুর চরম উপাদান তবে এদের পরস্পরের স্বভাবে সামঞ্জস্য দেখা যাবে কেন? এরা যদি হয় আদি ও অকৃত্রিম, এদের যদি জরা ও মৃত্যু না থাকে এবং এক এক জন যদি হয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তবে স্বভাবে এবং গুণে এদের আবার পরিবারে পরিবারে ভাগ করা যাবে কেন? এক জাতের পদার্থের সংগে আরেক জাতের তো মিল হ'তে পারে না। তা' হ'লে স্বভাবে গুণে এক পরিবারের মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে মিল দেখা যায় কেন? পরস্পরের মিলের রহস্য জানবার প্রয়াসে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠছে তখন দেখা গেল মেণ্ডেলিফের তালিকায় পর পর সাজান মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণবিক ওজনের পার্থক্য কোন দুটি মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে একেরও কম আবার অপর এক জোড়ের ক্ষেত্রে চারের বেশি। পর পর সাজান কোবল্ট ও নিকেলের মধ্যে পরমাণবিক ওজনের পার্থক্য একেরও কম, আবার স্ক্যাণ্ডিয়ামের পরমাণবিক ওজন পটাসিয়াম হ'তে চারেরও বেশি। এরূপ খামখেয়ালী পার্থক্যের কারণ কি? পর পর সাজান মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণবিক ওজনে যে পার্থক্য রয়েছে তা' সকলের বেলায়ই এক রকম নয় কেন? পরমাণবিক ওজনে এরূপ বিশৃংখলতার কারণ কি?

তেজস্ক্রিয় পদার্থ

মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব নিয়ে যখন বিজ্ঞানী মহলে অনেক প্রশ্ন গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে তখন প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেকারেল মৌলিক পদার্থ য়ুরেনামের গুণের এক অভিনব সন্ধান দিলেন বিজ্ঞান-জগৎকে। এই অভিনব পদার্থটি হ'ল সব চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ য়ুরেনাম। তিনি দেখালেন অকারণে য়ুরেনাম ধাতুটির গা থেকে একপ্রকার রশ্মিকণা দুর্দান্ত বেগে তুবড়ীর মত ফেটে বেরিয়ে পড়ছে চারদিকে। বিচ্ছুরিত রশ্মিকণাগুলো অহরহই



তেজস্ক্রিয় পদার্থের গা থেকে জ্যোতির্ময় রশ্মিকণা
তুবড়ীর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে

ছুটে বেরুচ্ছে। বাইরে থেকে চেষ্টা ক'রেও এ বিচ্ছুরণকে কমানও যায় না বাড়ানও যায় না। কালো কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখলেও য়ুরেনামের গা থেকে রশ্মি ছুটে বের হয়। এ রশ্মি খালি চোখে দেখা যায় না বটে তবে ফটোগ্রাফের প্লেটে ধরা পড়ে। এর দুই বছর পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পিচ্‌ব্লেণ্ডি নামে একপ্রকার খনিজ ধাতু থেকে ম্যাডাম কুরি ও তাঁর স্বামী মঁসিয়ে কুরি রেডিয়াম নামক

আরেকটি মৌলিক ধাতুর আবিষ্কার করলেন। দেখা গেল রেডিয়ামও য়ুরেনামের মত তেজস্ক্রিয় (Radio-active), কিন্তু রেডিয়ামের তেজ বিকিরণের ক্ষমতা য়ুরেনাম থেকে প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি। এর ছু'বছর পর বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড আরো এক চমৎকার নতুন ঘটনা লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন রেডিয়াম ও য়ুরেনাম তেজস্ক্রিয় ধাতু ভেংগে গিয়ে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করছে; শুধু তাই নয় পরীক্ষার পর আরো জানা গেল যে, রশ্মিকণাগুলো তেজস্ক্রিয় পদার্থের গা থেকে ছুটে বেরোয় তাদের যদি আটক করা যায় তবে তাদের মাঝ থেকে পাওয়া যায় অনেক কালের পরিচিত মৌলিক পদার্থ হিলিয়াম-কণা।

মৌলিক পদার্থের নতুন পরিচয়

এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির আবিষ্কারের ফলে মৌলিক পদার্থের অমরতা সম্বন্ধে মুহূর্তের মধ্যে এক ভোজবাজী হয়ে গেল। জানা গেল মৌলিক পদার্থ অমর নয়, অপরিবর্তনশীলও নয়—সুতরাং তারা মৌলিক হবে কি ক'রে? এখন প্রশ্ন জাগল একটি মৌলিক পদার্থ ভেংগে যখন আরেকটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হ'তে পারে তখন নিশ্চয়ই এত কাল থেকে যারা মৌলিক পদার্থ ব'লে মান পেয়ে এসেছে তারা আসলে মৌলিক নয়—অন্য কোন যথার্থ মৌলিক পদার্থ দিয়ে গড়া যৌগিক বস্তু মাত্র। কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞান জানিয়ে দিল এত কালের জানা মৌলিক পদার্থরা সত্যিকারের মৌলিক নয়, মাত্র ছু'রকম মৌলিক উপাদানে গড়া। এই মৌলিক উপাদান ছুটি হ'ল—পজিটিভ বিছ্যুৎ-রেণু এবং নেগেটিভ বিছ্যুৎ-রেণু।

মেণ্ডেলিফের সাজান পদার্থগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর মিল দেখে তথাকথিত মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে সন্দেহ জেগেছিল বিজ্ঞানীদের মনে, বিশ বছরের সাধনায় সে সন্দেহ সত্য ব'লে প্রমাণ হ'ল। তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা বস্তুর স্বরূপসন্ধানের মণিকোঠা উন্মোচন করবার জন্যে চাবিকাঠি দিয়ে দিল বিজ্ঞানীদের হাতে। বিজ্ঞানীরা খবর পেলেন বস্তুর মণিকোঠায় আছে মাত্র ছু'রকমের মৌলিক রেণু—পজিটিভ বিছ্যুৎ-রেণু ও নেগেটিভ বিছ্যুৎ-রেণু। এ ছু'রকম বিছ্যুৎ-রেণু দিয়েই গড়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তু। এ আবিষ্কারের ফলে প্রতিদিনের জানা বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ ভেংগে গেল মাত্র ছুটি মৌলিক পদার্থে। এত বিচিত্র, এত নিগূঢ়, এত ব্যাপক

পদার্থজগৎ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে স্বচ্ছ ও সরস হয়ে গিয়ে জানিয়ে দিল—এ বিরাট পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জ দু'রকম পদার্থের একটি বিরাট সমাবেশ মাত্র। কিন্তু মাত্র এরূপ দু'টি মৌলিক উপাদান দিয়ে এই বৈচিত্রময় পৃথিবীর বিচিত্রতর বস্তুপুঞ্জ এবং বস্তুপুঞ্জের অণু-পরমাণুর সংগঠন কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এ সমস্যা সমাধানের গবেষণাই হ'ল বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের প্রধান সাধনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থের সংগঠন

বিদ্যুৎ কি ?

বিদ্যুতের সংগে মানুষের পরিচয় বহুকালের। আকাশে বিজুলী ঝল্‌সে যায়। মেঘে মেঘে ঠোকা খেয়ে দেয়া ডাক দেয়। দুরন্ত বেগে আকাশ থেকে ছুটে এসে বাজ পড়ে পৃথিবীতে। এ ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেছে সবাই। আরো লক্ষ্য করেছে বাজকে চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু বাজের আঘাত করবার ক্ষমতা দুর্দান্ত, ছুটে চলবার বেগ প্রচণ্ড। দেয়ার ডাক শুনতে না শুনতে বাজ এসে পড়ে পৃথিবীতে ; গাছপালার উপরে বা মানুষের গায়ে এসে যদি পড়ে তা' হ'লে বাজের আঘাতের হাত থেকে কারুরই রক্ষা নেই। কিন্তু মাটিতে এসে যদি পড়ে তা' হ'লে মাটি যেন অনায়াসেই তাকে গিলে ফেলে। বিজলী, দেয়া ও বাজের মূলে যে বিদ্যুৎ রয়েছে—এ কথা ভাসাভাসা ভাবে আমাদের দেশের প্রাচীন কালের বিজ্ঞানীরাও কল্পনা করেছিলেন। দু'শ বছর আগে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বিদ্যুতের স্বভাবটি জানবার জন্যে আকাশে দিয়েছিলেন ঘুড়ি উড়িয়ে। ঘুড়ি উড়ে গিয়ে যেই মেঘের গায়ে ঠেক্‌ল—সুতো বেয়ে কি যেন দিয়ে গেল লাটাইয়ের গায়ে এক ধাক্কা। বিজ্ঞানী ভাব্‌লেন বিদ্যুতের এক প্রচণ্ড ঘা মারবার শক্তি আছে। বিজ্ঞানী তখন প্রশ্ন করলেন—আকাশ ছাড়া পৃথিবীতে কি বিদ্যুতের সন্ধান করা যায় না ?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ এক টুক্‌রা সিল্কের কাপড় দিয়ে একখণ্ড কাচের গায়ে ঘষতে গিয়ে দেখলেন কাচের গায়ে এবং সিল্কের ভিতর একপ্রকার শক্তি জন্ম লাভ করেছে। শক্তিটি মূলে এক জাতের হ'লেও রকমে যেন আলাদা। পরে জানা গেল সিল্ক ও কাচের গায়ে যে শক্তি জন্ম লাভ করেছে তা' আর কিছুই নয়—বিদ্যুৎ মাত্র। সিল্কের গায়ে যে বিদ্যুৎ জন্মেছে তার নাম দেওয়া হ'ল পজিটিভ বা হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ আর কাচের গায়ে যে বিদ্যুৎ রয়েছে তার নাম দেওয়া হ'ল নেগেটিভ বা না-ধর্মী। বিদ্যুৎ সৃষ্টি করার পর কাচের সংগে যদি সিল্কের কাপড়টি এনে এক সংগে মিলিয়ে একজোট করা যায় তা'হ'লে দেখা যায় কাচ ও সিল্ক থেকে যেন বিদ্যুৎ একেবারে

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিদ্যুতের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণই নেই সিল্ক বা কাচে। কাচের গা থেকে সিল্ককে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার যদি দূরে সরিয়ে রাখা যায় তাহলে মুহূর্তের মধ্যে যেন সিল্ক ও কাচের মধ্যে বিদ্যুৎ এসে জমা হয়। এই সাধারণ পরীক্ষা থেকে দেখা যায় সমান জোরের কিন্তু একেবারে উল্টো স্বভাবের বিদ্যুৎ রয়েছে কাচে ও সিল্কে। এরা পরস্পর যখন মেলে তখন এরা পরস্পরকে এমনভাবে জব্দ ক'রে রাখে যে বিদ্যুতের অস্তিত্বের একটু চিহ্নও পাওয়া যায় না। এ পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানী মোটামুটি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করলেন।

এমনি একটি সাধারণ পরীক্ষা দিয়ে বিদ্যুতের যে খবর পাওয়া গেল তা'কে মূলধন ক'রে গত দেড়শ দু'শ বছর ধ'রে চলেছে বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের সাধনা। এ সাধনার ফলে পাওয়া গেছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সংবাদ। এ জ্ঞানকে হাতে-কলমে কাজে লাগান হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধার জন্যে। আজকের সভ্য জগতের চলবার শক্তি যেন বিদ্যুতের হাতের মুঠোয় বাঁধা। শুধু তাই নয়, গত একশ' বছরের সাধনায় জানা গেছে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পুঞ্জ পুঞ্জ পদার্থরাশি এবং এই পদার্থরাশিকে ঘেরা আলো, উত্তাপ সবই বিদ্যুৎময়— এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যুতের লীলাখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিদ্যুতের প্রকৃতি

বিদ্যুতের এই আশ্চর্য প্রকৃতির সংবাদ কি করে জানা গেল সে কাহিনী জানবার আগে বিদ্যুতের স্বভাব ও প্রকৃতির মূল কথা কয়টি জানা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ দুই প্রকারের—পজিটিভ বিদ্যুৎ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ। একই রকম বিদ্যুৎ পরস্পরকে ঠেলে সরিয়ে দেয় দূরে, কিন্তু ভিন্ন রকমের দুটি বিদ্যুৎ আকর্ষণ ক'রে টেনে আনে পরস্পরকে। পজিটিভ বিদ্যুৎ পজিটিভ বিদ্যুতকে বা নেগেটিভ নেগেটিভকে দূরে সরিয়ে দেবে ধাক্কা দিয়ে, কাছে ঘেঁষতে দেবে না কখনো। কিন্তু পজিটিভ বিদ্যুৎ নেগেটিভ বিদ্যুতকে কাছে পেলেই একে অন্যকে টেনে এক হয়ে যেতে চাইবে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ক্ষমতার পরিমাণ নির্ভর করে বিদ্যুতের পরস্পরের পরিমাণ এবং একের কাছ থেকে অপরের দূরত্বের উপরে। পরিমাণ যদি বাড়ে তা' হ'লে টানের জোরও বেড়ে যায় সংগে সংগে। কিন্তু দূরত্ব যদি বাড়ে তা' হ'লে পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্ষমতাটি যায় ক'মে। আবার দূরত্ব যদি কমে তা' হ'লে এই ক্ষমতাটিও যায়

বেড়ে। এই বাড়া কমার ক্ষমতাটি নির্ভর করে দূরত্বের বাড়া কমার উপর। যে এলাকা জুড়ে এ শক্তির প্রভাবটি বিস্তৃত হয় সে এলাকাটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বিদ্যুতের ক্ষেত্র।

বিদ্যুৎ ও চুম্বক

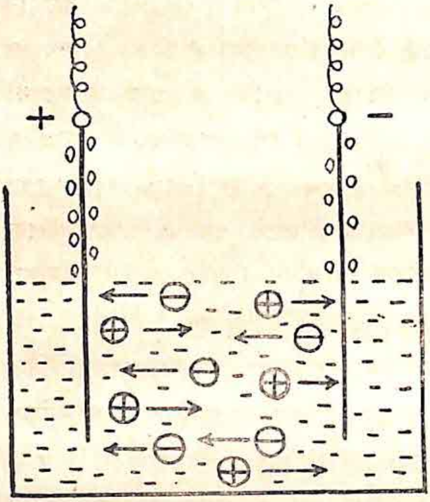
বিদ্যুতের সংগে চুম্বকের একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্য রয়েছে। চুম্বকের প্রভাবও দু'রকমের—পজিটিভ ও নেগেটিভ। চুম্বকের বেলায়ও নেগেটিভ পজিটিভকে টানে কিন্তু এক রকমের দুটি চুম্বক পরস্পরকে ঠেলে দেয় দূরে। বিদ্যুতের মত একই নিয়মে বাঁধা চুম্বকের পরস্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করবার ক্ষমতা। স্বভাবের এই মিল দেখে বেশ জোর ক'রে বলা যায় যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। চুম্বকের স্বভাব ও প্রভাব বিদ্যুতের চেয়ে বিশেষ ভিন্ন নয়। প্রবাহিত অবস্থায় বিদ্যুৎ চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে। কোন বিদ্যুৎ-চলার পথের কাছে চুম্বক আনা হলে বিদ্যুৎ-চলার সোজা পথটি বেঁকে যায় এবং কোন্‌দিকে বেঁকে যায় তা' নির্ভর করে চুম্বকের পজিটিভ বা নেগেটিভ প্রকৃতির উপরে।

বিদ্যুৎ বা চুম্বক যেখানেই থাক না কেন অনেক দূর থেকে তার উপস্থিতির খবরটা পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ এবং চুম্বক দুইই তাদের চারপাশে এক শক্তির প্রভাব বিস্তার ক'রে রাখে। সমস্ত ক্ষেত্রব্যাপী বিদ্যুৎ বা চুম্বকের প্রভাবের জোর কেমন হবে, চারপাশের কতদূর এলাকা পর্যন্ত এ প্রভাব ছড়িয়ে থাকবে তা' নির্ভর করে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মূলধন, অর্থাৎ শক্তির পরিমাণের উপর। গরম কোন জায়গায় থার্মোমিটার আনলেই যেমন থার্মোমিটারের পারদ উত্তাপের পরিমাণ জানিয়ে দেয়, তেমনি চুম্বক বা বিদ্যুতের প্রভাবাধীন এলাকার বিদ্যুৎ বা চুম্বক মাপবার যন্ত্র বা ইলেকট্রোমিটার আনলেই এদের প্রভাবের পরিচয় জানিয়ে দেয় যন্ত্রের নির্দেশক কাঁটাটি।

বিদ্যুতের কণারূপ

একদিকে চললো বিদ্যুতের নানাগুণের আবিষ্কার এবং সে আবিষ্কারগুলিকে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা, অপর দিকে বিদ্যুতের আসল রূপটিকে জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা উঠে প'ড়ে লাগলেন গবেষণার পর গবেষণায়।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন বিদ্যুতের যেন একটি প্রবাহিকা শক্তি আছে—জল যেমন খালের গা বেয়ে বেয়ে এঁকে বেঁকে চলে যেতে পারে—বিদ্যুৎ যেন তেমনি ধাতব তারের গা বেয়ে জলস্রোতের মত অনায়াসে বিষম বেগে চলে যেতে পারে এক মুখ থেকে আরেক মুখে। হাজার হাজার মাইল তার বেয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ তো নিমেষের মধ্যে চলে যায় তারবার্ত্তায়। বিদ্যুতের এরূপ দ্রুত কিলবিল ক'রে চলবার শক্তি দেখে বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করলেন—বিদ্যুৎ কি জলের মতই একপ্রকার নতুন তরল পদার্থ যা ধাতবতারের অণু পরমাণুর ভিড় ভেদ ক'রে অনায়াসেই পথ ক'রে চলতে পারে। না, কণা কণা বস্তুপুঞ্জের দেহে ভর ক'রে রয়েছে রেণু রেণু বিদ্যুৎগুলি এবং এই বিদ্যুৎ-রেণুগুলিই বিদ্যুৎ-প্রবাহে বস্তু-পরমাণুর গা বেয়ে বেয়ে এক কোণ থেকে আরেক কোণে চলে যায় নিমেষের মধ্যে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন বিদ্যুৎ কি জলের মত, না অতি সূক্ষ্ম কণার মত ?



⊕ = হাইড্রজেন আয়ন
⊖ = ক্লোরিন আয়ন

প্রায় দু'শ বছর আগে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন ভাসা ভাসা আন্দাজ ক'রে বলেছিলেন যে বিদ্যুৎ হ'ল রেণু রেণু বস্তুকণার মত অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার বৈদ্যুতিক পদার্থ। এ বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক পদার্থ এত সূক্ষ্ম এবং এত অভিনব যে অনায়াসেই অণু-পরমাণু-ঘন সাধারণ বস্তুর ভিতর দিয়ে পথ ক'রে চলতে পারে। বিদ্যুতের কণিকারূপের প্রথম পরীক্ষায়-পাওয়া সমর্থন এল বিজ্ঞানী ফ্যারাডের কাছ থেকে। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে সকল তরল, পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে পারে সে সকল পদার্থের অণুগুলি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সংস্পর্শে ভেংগে যায়। যেমন, লবণ-গোলা জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে, লবণ ভেংগে যায় ক্লোরিণ ও সোডিয়াম নামের দুটি পদার্থে, (কারণ একটি অণু লবণ এক কণা সোডিয়াম ও এক কণা ক্লোরিণ দিয়ে গড়া)। যেইমাত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ 'ব্যাটারী' থেকে তার বেয়ে লবণ-গোলা জলে

এসে ঢুকল অমনি লবণ-গোলা ভেংগে যায় ক্লোরিণ ও সোডিয়াম কণায়। এই দুই রকমের কণা কণা বস্তুরাই এক এক কণা বিদ্যুৎকে পিঠে ক'রে নিয়ে নিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহকে তরল লবণ-গোলা জল পার করতে থাকে। এই বিদ্যুৎকণা-বাহকেরা পজিটিভ ও নেগেটিভ দুরকম বিদ্যুৎকণা বহন ক'রে দু'দলে যায় দু'দিকে—একরেণু পজিটিভ বিদ্যুৎরেণু নিয়ে সোডিয়াম কণাগুলি যায় নেগেটিভ বিদ্যুত-দ্বারের দিকে। আর এক কণা নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু নিয়ে ক্লোরিণ যায় পজিটিভের দিকে। বাহকের কাজ শেষ ক'রে ওরা আবার নতুন ক'রে লবণ বনতে পারে না। ক্লোরিণ গ্যাস হ'য়ে উড়ে যায় জল ছেড়ে আর সোডিয়াম জলের সংগে মিলে ক্ষার হয়ে যায়। ক্লোরিণ ও সোডিয়াম কণাদের কে কত কণা বিদ্যুৎরেণু বহন করতে পারে তার ক্ষমতা নির্ভর করে এদের হাইড্রোজেনের সাথে মিলবার ক্ষমতার উপর। ক্লোরিণ ও সোডিয়াম উভয়েই মাত্র এক একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংগে জোট বাঁধবার ক্ষমতা রাখে ব'লে এরা প্রত্যেকেই একটির বেশি বিদ্যুৎরেণু বহন করতে পারে না। এই পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণাগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করবার বিরাট ক্ষমতা রাখে—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে প্রত্যেক বস্তুকণা প্রত্যেক কণাকে আকর্ষণ করে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণের তুলনায় বিদ্যুতের আকর্ষণের জোর কোটী কোটী গুণ বেশি। অন্যান্য তরল পদার্থ যারা বিদ্যুৎ প্রবাহকে চালু রাখতে পারে তাদের প্রত্যেকের বেলায়ই এই একই ধরণের বিদ্যুৎবহন-ক্রিয়া দেখা যায়।

ফ্যারাডে বললেন, বস্তুর মূলে যেমন রয়েছে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুকণা তেমনি বৈদ্যুতিক পদার্থের মূলে রয়েছে অতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-রেণু। পরমাণু যেমন বস্তুর চরমরূপ, বিদ্যুৎ-রেণুও তেমনি বৈদ্যুতিক পদার্থের চরমরূপ। বিদ্যুৎ-কণাকে আর ভাগ করা চলে না। এই আদি ও অখণ্ড বিদ্যুৎকণা নিয়ে বৈদ্যুতিক পদার্থ গড়া। কিন্তু বিদ্যুতের এই চরম কণারূপকে হাতেকলমে যতটা না জানা গেল ফ্যারাডে তার চেয়ে কল্পনা করলেন অনেক বেশি। বিদ্যুতের আসল রূপ যদি হয় কতগুলি বিদ্যুৎকণার সমাবেশ তবে এই বিদ্যুৎ-রেণুগুলির ওজন কত, এসব প্রাথমিক বিদ্যুৎরেণুদের (Elementary quantum of electricity) বৈদ্যুতিক জোরের বা চার্জের পরিমাণই বা কত—এইসব প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া গেল না ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণ পরীক্ষা থেকে।

ক্যাথোড রশ্মি

ফ্যারাডের গবেষণার পর বিদ্যুতের কণারূপ সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হ'ল ক্যাথোড বা নেগেটিভ রশ্মির আবিষ্কার। আঠারো শতাব্দীর পঞ্চদশকে বৈজ্ঞানিক ম্যাসন ও প্লুকর কাচের চোঙার ভিতর থেকে বাতাস বের ক'রে নিয়ে খালি চোঙার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে দিয়ে দেখলেন চোঙের ভিতর নানাপ্রকার রঙিন আলোর স্থষ্টি হয়েছে। এরূপ খালি চোঙের ভিতর নানা বর্ণের স্থষ্টি ক'রে ক্যাথোড রশ্মির আবিষ্কার সম্ভব হ'ল। কিন্তু এরূপ আলো বিচ্ছুরণের কারণ কি এবং এসব আলোক-রশ্মিগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতিই বা কি, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা তখনো সিদ্ধান্ত করতে পারেননি।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক প্লুকর প্রথম ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কার করেন। যে পরীক্ষায় প্লুকর ক্যাথোড রশ্মির সন্ধান পেলেন তার একটা সাধারণ বিবরণ দেওয়া যাব। একটা লম্বা কাচের চোঙার ভিতর ছদিকে ছটি ধাতব চাকতি



ক্যাথোড রশ্মি

আঁটলেন প্লুকর। এই ধাতব চাকতি ছটির সংগে ছটি তার সংযোগ ক'রে লাগিয়ে দিলেন একটি ব্যাটারীর সঙ্গে। তারপর চোঙের ভিতর থেকে পাম্পের সাহায্যে প্রায় সবটুকু বাতাস বের ক'রে নিয়ে চোঙটিকে একেবারে খালি ক'রে ফেলে প্লুকর বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেন চোঙের ভিতর। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হ'লে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো চোঙের ভিতর। দেখা গেল যে চাকতিটি ব্যাটারীর নেগেটিভ-বিদ্যুৎ-মুখের সংগে সংযুক্ত, সেই ধাতব চাকতিটি থেকে গ্যাসের স্রোতের মতো একরকম সূক্ষ্ম পদার্থ বেরিয়ে আসছে এবং সোজা সরল রেখায় ছুটে চলছে সামনের দিকে। চাকতি থেকে উৎসারিত রশ্মি স্রোতের পথে যদি কোন বেড়া খাড়া করা যায়, তা'হলে দেখা যায় বেড়ার পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেড়াটির একটি স্পষ্ট ছায়া পড়েছে চোঙের মধ্যে। এই রশ্মিগুলি যে শুধু সোজাই চলে তাই নয়, কোন একটি চুম্বক বা বিদ্যুৎ-বাহী অন্য একটি তার যদি চোঙটির কাছে

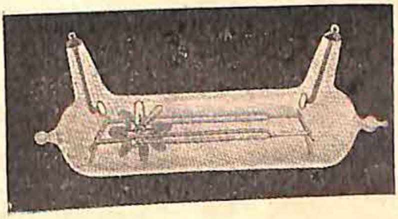
আনা যায় তা' হ'লে রশ্মি-স্রোতটি সোজাপথ ছেড়ে অন্যদিকে বেঁকে যায়। যদি চুম্বকটির নেগেটিভ মুখ এনে ধরা হয় চোঙার সামনে তা হ'লে রশ্মি-স্রোতটি চুম্বকের উল্টো দিকে যায় বেঁকে। আর যদি পজিটিভ চুম্বক-মুখ ধরা যায়, তা'হলে রশ্মি-স্রোতটি চুম্বকের দিকে আসে বেঁকে। এই সাধারণ পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় রশ্মি-স্রোতটি নেগেটিভ বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন। এই



ক্যাথোড রশ্মি-স্রোতের সামনে
চুম্বকের পজিটিভ মুখ রাখায় রশ্মি স্রোতটি চুম্বকের দিকে বেঁকে গেছে।

রশ্মি-স্রোতটি নেগেটিভ চাকতি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে ব'লে এই নতুন আবিষ্কৃত রশ্মি-স্রোতের নাম দেওয়া হ'ল ক্যাথোড বা নেগেটিভ রশ্মি। চোঙার কাচের গায় এসে যখন এই রশ্মি-স্রোত আঘাত করে তখন কাচের গা থেকে সুন্দর আলোক-প্রভা সৃষ্টি করে।

ক্যাথোড রশ্মির এইসব গুণাবলী লক্ষ্য ক'রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই ক্যাথোড রশ্মিগুলি আর কিছুই নয় কতগুলি বিদ্যুৎবাহী সূক্ষ্ম বস্তুকণা মাত্র। ক্যাথোড রশ্মিগুলি যে বিদ্যুৎবাহী বস্তুকণা ঐ সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানী ক্রুকসের গবেষণাটিও বিশেষভাবে সাহায্য করছে। ক্রুকস ক্যাথোডরশ্মি সৃষ্টি করবার চোঙার চাকতি দুটির মাঝপথে একটি শলা ঢোকালেন এবং শলার মধ্যে খুব পাতলা পাখাওয়ালা একটি চাকা বসালেন। স্টীমারের তলায় জলটানা পাখার



ক্রুকসের পরীক্ষা
ক্যাথোডরশ্মির আঘাতে চোঙের ভিতরকার পাখাটি ঘুরতে থাকে।

মতই ক্রুকসের পাখাটি, এবং একটু কিছুতেই ঘুরিয়ে দিলে ভনভন ক'রে শলাকাটিকে অক্ষ ক'রে পাখাগুলি ঘুরতে পারে। ক্রুকস ভাবলেন যদি ক্যাথোড রশ্মি একটি সাধারণ আলোকরশ্মি না হয়ে কতগুলি অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণাসমষ্টি

হয়, তা'হলে দুরন্ত বেগে সেই রশ্মিগুলি পাখার ওপরে এসে পড়বে, অমনি পাখাটিও ঘুরতে থাকবে শলার চার দিকে। ক্রুকস পরীক্ষা ক'রে দেখলেন সত্যি ক্যাথোড রশ্মির আঘাত খেয়ে পাখাওয়ালা চাকাটি ঘুরতে থাকে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় ক্যাথোড রশ্মিগুলি সূর্যের আলোর মত কোন নতুন ধরণের আলো নয়, ক্যাথোড রশ্মি কতগুলি বিদ্যুৎবাহী বস্তুকণা মাত্র।

তা'হ'লে দেখা গেল ক্যাথোডরশ্মি যে কোন পাতলা ধাতবপাত অনায়াসেই ভেদ করতে পারে, অন্যকোন বস্তুর উপরে প'ড়ে এবং বস্তুটির গায় এক পরদা ধূলোর মতো জ'মে সে বস্তুটিকেও বিদ্যুৎসম্পন্ন ক'রে তুলতে পারে, এবং পদার্থ-কণার মতো চাপ দেবার ক্ষমতাও রাখে। ক্যাথোড রশ্মির সব রকমের স্বভাব পরখ ক'রে নিশ্চয় করা হ'ল এই ক্যাথোড রশ্মিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎবাহী বস্তুকণার সমষ্টি মাত্র। এই পদার্থ-কণাগুলি পদার্থের পরমাণু-কণার চেয়ে আকারে অনেক অনেক ছোট। এই বৈদ্যুতিক পদার্থ-কণাগুলির নাম দেওয়া হ'ল ইলেকট্রন। এর পর এই ক্যাথোড কণাগুলির চলার বেগ বের করা হ'লে দেখা গেল কণাগুলি প্রতি সেকেণ্ডে আটত্রিশ হাজার মাইল থেকে বাষট্টি হাজার মাইল পর্য্যন্ত দৌড়তে পারে। অর্থাৎ ক্যাথোড রশ্মির গতিবেগ সূর্য্যের আলোর এক পঞ্চমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক পদার্থকণাগুলির আকারও বের করা হ'লে দেখা গে'ল এই বৈদ্যুতিক পদার্থকণাগুলি আকারে, পদার্থকণার মধ্যে সবচেয়ে যে হালকা পদার্থ-কণা হাইড্রোজেন, সেই হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে প্রায় দুহাজার গুণ ছোট। ১৮৪৬টি ইলেকট্রন রেণু যদি একত্র করা যায় তবে ওজনে হবে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। অর্থাৎ একটি ইলেকট্রনের ওজন হ'ল হাইড্রোজেন পরমাণুর $\frac{১}{১৮৪৬}$ ভাগ। এই ইলেকট্রন রেণুগুলির প্রকৃতি এমন আশ্চর্য যে ক্যাথোড রশ্মিরূপে যে কোন ধাতুতে গড়া চাকতি থেকেই পাওয়া যাক্না কেন সব সময়ে সব চাকতি থেকে একই রকম ইলেকট্রন পাওয়া যায়। লোহা, প্লাটিনাম, তামা, সোনা ইত্যাদি যে কোন ধাতুর চাকতি থেকে পাওয়া ইলেকট্রন রেণুগুলি জাতে ও প্রকৃতিতে হুবহু একপ্রকার।

পজিটিভ রশ্মি

ক্যাথোড রশ্মির আবিষ্কারের পরে দেখা গেল যে চাকতি থেকেই আর এক প্রকার রশ্মিও নির্গত হয়। কিন্তু স্বভাবে ও গুণে এই রশ্মিগুলি ক্যাথোড

রশ্মির একেবারে বিপরীত। ক্যাথোড রশ্মি যায় সামনের দিকে, এরা ছোটে পেছন দিকে। চুম্বকের সামনে ক্যাথোড রশ্মি যেদিকে বেঁকে যায় এরা বেঁকে যায় ঠিক তার উল্টো দিকে। শুধু তাই নয় এই বৈদ্যুতিক পদার্থ-কণাগুলির দৌড়বার ক্ষমতাও ক্যাথোড রশ্মি থেকে অনেক কম। সূর্যের আলোর একশ ভাগের এক ভাগের মত এরা দৌড়তে পারে প্রতি সেকেণ্ডে। এ থেকেই প্রমাণ হয় ক্যাথোড রশ্মি থেকে এরা আয়তনে অনেক স্থূল। ক্যাথোড রশ্মি যেমন ইলেকট্রন নামের অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক পদার্থরেণুর সমষ্টি এই নতুন রশ্মিগুলিও তেমনি বৈদ্যুতিক পদার্থকণার সমষ্টি মাত্র। তবে এরা পজিটিভ তড়িৎগুণসম্পন্ন। তাই এই নতুন রশ্মিকণার নাম দেওয়া হল পজিটিভ রশ্মি। এই পজিটিভ রশ্মিকণাগুলি কি পরিমাণ বিদ্যুৎরেণু গ্রহণ করতে পারে? দেখা গেল ফ্যারাডে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করবার সময় (তড়িৎ বিশ্লেষণ বিজ্ঞানে যার নাম দেওয়া হল 'আয়ন' অর্থাৎ যা ডাকপিয়নের মত বিদ্যুৎকণা বহন করে নিয়ে যায়) একটি হাইড্রোজেন অণু যে পরিমাণে তড়িৎ বহন করে সেই পরিমাণ তড়িৎই বহন করে এক একটি পজিটিভ বৈদ্যুতিক পদার্থের কণা। এবং এই পজিটিভ কণাগুলি ওজনে প্রায় একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। এই পজিটিভ কণার নাম হল প্রোটন।

বিদ্যুতের নয়া রূপ

ইলেকট্রন ও পজিটিভ বিদ্যুৎকণার আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বে এক নয়া জ্ঞান লাভ হ'ল। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা কল্পনা করলেন প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যেই ইলেকট্রন ও প্রোটন আছে। চরম অবস্থায় একটি ইলেকট্রন রেণু এবং একটি প্রোটন কণার বৈদ্যুতিক জোর সমান ব'লে সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুতে তড়িতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। কারণ এই দুই জাতের বৈদ্যুতিক কণাগুলি পরস্পরকে জব্দ ক'রে মানসিক ভাবে নিজেদের বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে রাখে। যদি কোনমতে কয়েকটি বিদ্যুৎকণা খামচিয়ে টেনে নিয়ে আসা যায় বস্তুটির গা থেকে তবে মুহূর্তের মধ্যে বস্তুটির সারা অংগে বৈদ্যুতিক প্রভাব প্রকাশ হয়ে যায়। ফ্রাঙ্কলিন সিল্ক দিয়ে কাচের গা ঘষে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেছিলেন তা' আর কিছুই নয়। সিল্কের গা থেকে কতগুলি ইলেকট্রন বেরিয়ে চলে যায় কাচের গায়ে। এই ইলেকট্রনগুলি কাচের গায়ে

গিয়ে কাচের গায়ে নেগেটিভ বিদ্যুতের প্রভাব বিস্তার করে এবং সিল্কের গা থেকে যতগুলি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় ততগুলি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। তাই সিল্কে যে পজিটিভ বিদ্যুতের অস্তিত্ব পাওয়া গেল সেগুলি মুক্ত পজিটিভ বিদ্যুৎকণারই বৈদ্যুতিক প্রভাবের ফল।

পদার্থের সংগঠনে বিদ্যুৎকণা

ইলেকট্রনের আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। পদার্থের সংগে বিদ্যুতের সম্পর্ক কি? বিদ্যুতের আদিম রূপকণার মত এ সিদ্ধান্ত অনেক পরীক্ষার পর পাকাপাকিভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবুও এ যাবৎ বিজ্ঞানীরা বিদ্যুতের উল্লেখ করতে হ'লেই বলতেন বিদ্যুৎবাহী কণা বা বিদ্যুৎগুণ-সম্পন্ন-কণা। ইলেকট্রন-কণার সংখ্যা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বললেন ইলেকট্রন হ'ল হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে প্রায় দু'হাজার গুণ ছোট একটি অভিনব পদার্থকণা যার গায়ে জড়িয়ে আছে এককণা প্রাথমিক বিদ্যুৎরেণু (Elementary quantum of electricity), অর্থাৎ যদিও ইলেকট্রনের মধ্যে বিদ্যুৎ ও বস্তুর অস্তিত্ব অচ্ছেদ্য তথাপি তখনকার দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ ও বস্তুকে আলাদা আলাদা সত্তার পৃথক জিনিষ রূপেই কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় নিঃসন্দেহেই কল্পনা করেছিলেন যে সকল বস্তুর মধ্যেই ইলেকট্রনের অস্তিত্ব রয়েছে।

ক্যাথোড রশ্মি দিয়ে গ্যাসীয় পদার্থের গায় আঘাত করলে সেই পদার্থ থেকে একপ্রকার নতুন ক্যাথোড রশ্মির সৃষ্টি হয়। এই নয়া ক্যাথোড রশ্মিগুলির ছুটে চলবার গতিবেগ কম, কিন্তু মূল উপাদানে এরাও আদি ক্যাথোড রশ্মির মত ইলেকট্রনই। ক্যাথোড রশ্মির বদলে রঞ্জন রশ্মিদ্বারা কোন পদার্থের গায়ে আঘাত করলে সেই পদার্থ থেকেও ইলেকট্রনের জন্ম হয়। এইভাবে বিভিন্ন পদার্থ থেকে উত্তাপের সাহায্যে, আলোক রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন আবিষ্কার করা সম্ভব হ'লে দেখা গেল বৈদ্যুতিক জোরে বা চার্জের পরিমাণে এবং ওজনে ও গুণে এই বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া ইলেকট্রনগুলির মধ্যে তিলমাত্র পার্থক্যও নেই। তখন বিজ্ঞানীদের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হ'ল—সাব্যস্ত হ'ল ইলেকট্রন পদার্থ মাত্রেরই একটি মৌলিক উপাদান। এই সিদ্ধান্তে এতকালের জানা পদার্থের মৌলিক উপাদানের কল্পনায় প্রথম আঘাত পড়ল। পৃথিবীর পদার্থরাশি বিভিন্ন জাতের

এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের মৌলিক পরমাণু দিয়ে গড়া যাদের পরস্পরের সংগে মৌলিক উপাদানগত কোনরকম মিল নেই—বিজ্ঞানীদের সেই ধারণা কিছুটা বদলাতে হ'ল—স্বীকার করতে হ'ল অন্ততঃ ইলেকট্রন মৌলিক উপাদানরূপে সকল পদার্থের পরমাণুতে বিরাজমান রয়েছে। এবং চেষ্টা করলে এই ইলেকট্রন কণাগুলি পদার্থের পিণ্ড থেকে মুক্তবিদ্যুৎবাহী কণারূপে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়—যেমন পারা যায় ক্যাথোড রশ্মিরূপী মুক্ত ইলেকট্রন-কণার উৎপাদন করতে। ইলেকট্রনের আবিষ্কারে বস্তুর একটি সার্বজনীন মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু এ সন্ধানে পদার্থের মৌলিক উপাদানের সমস্যা আরো জটিল হয়ে গেল।

বিদ্যুৎ ও বস্তু অভিন্ন

১৮৯৭ খৃঃ বিজ্ঞানী থমসন ইলেকট্রন সম্বন্ধে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন কোন বস্তুর গায়ে বিদ্যুতের সঞ্চার হ'লে বস্তুটির ওজন বেড়ে যায়। যেন বিদ্যুতের একটি আলাদা ওজন আছে এবং বস্তুটির ওজনের সংগে বিদ্যুতের এই ওজনটি যোগ হয়ে একুণে বিদ্যুৎবাহী বস্তুর ওজনটি বেড়ে যায়। এই ঘটনাটি দেখে বিজ্ঞানী প্রশ্ন করলেন,—একটি ইলেকট্রনের ওজনের কতটুকু বস্তুপিণ্ড বা ভরের উপর নির্ভর করে আর কতটুকু অংশ বৈদ্যুতিক চার্জ বা জোরের উপর? এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে ইলেকট্রনের ভর ও বৈদ্যুতিক চার্জ আলাদাভাবে মাপা হ'লে এক অভাবনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল ইলেকট্রনের বস্তুপিণ্ড বা ভর এবং চার্জ আলাদা আলাদা কোন স্বতন্ত্র জিনিষ নয়। ইলেকট্রনের সবটুকু কণা বা ভরই বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেল ইলেকট্রন বিদ্যুৎবাহী বা বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন পদার্থকণা নয়। ইলেকট্রন নিজেই আগাগোড়া বিদ্যুৎময় একটি তড়িৎরেণু মাত্র। এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে এতদিনকার লব্ধ জ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। জানা গেল ইলেকট্রন পদার্থ মাত্রেরই একটি মৌলিক উপাদান। ক্যাথোডরশ্মি উৎপাদনের সময় দেখা যায় যে, ধাতব চাকতি থেকে ক্যাথোডরশ্মি উৎপন্ন হয় সেই চাকতি থেকেই পজিটিভরশ্মি সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা থেকে তখন পর্যন্ত একটি ভাসা ভাসা কল্পনা করা হয়েছিল

যে শুধু ইলেকট্রন নয়, পজিটিভ রশ্মিকণা বা প্রোটনও পদার্থ মাত্রেরই মূল উপাদান।

তেজস্ক্রিয়া বা রেডিও-এ্যাকটিভিটি

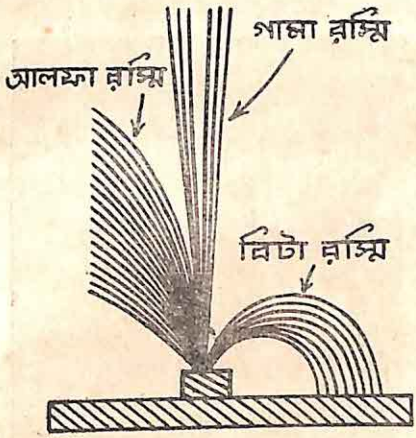
কিন্তু পদার্থের মৌলিক উপাদান ও তার সংগঠনের সংবাদ যে পদার্থেরা নিজেরাই খোলা বইয়ের পাতার মত অহরহ মেলে ধ'রে রয়েছে প্রকৃতিলোকে, এ খবর বিজ্ঞানীমহলে প্রথম রটনা হ'ল ১৮৯৬ সালে। প্যারী সহরের বিজ্ঞানী ব্যাকারেল ক্যাথোড রশ্মি দিয়ে সব চেয়ে ভারী মৌলিক ধাতু য়ুরেনামের আঘাত করে প্রতিপ্রভার [কোন কোন বস্তুর গায়ে দুরন্তবেগে ছোটা আলোকরশ্মি আঘাত করলে দেখা যায় বস্তুটি উত্তেজিত হয়ে তার গা থেকে একপ্রকার নতুন আলোকরশ্মি উৎপন্ন করে এবং এই নতুন উৎপন্ন রশ্মি সংগে সংগে চারদিকে ছড়াতে থাকে। এই নতুন উৎপন্ন রশ্মিকে বলা হয় প্রতিপ্রভা। যে চোঙায় ক্যাথোডরশ্মি উৎপন্ন করা হয় সে চোঙার কাচের গা থেকে এরকম প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হয়] সৃষ্টি করতে গিয়ে য়ুরেনামের এক আশ্চর্য গুণের সন্ধান পান। তিনি



তেজস্ক্রিয় রেডিয়ম ধাতু দিয়ে ফটোর প্লেটে রেডিয়ম কথাটি ইংরাজীতে লেখা হয়েছে।

দেখলেন য়ুরেনাম ধাতুটি অন্য পদার্থের সংগে মিশে যৌগিক অবস্থায়ই থাক অথবা নিজে একাই আণবিক অবস্থায় থাক এই ধাতুটির গা থেকে দুরন্তবেগে এবং অবিরাম একরকম রশ্মিধারা নির্গত হচ্ছে। য়ুরেনামের গা থেকে নির্গত রশ্মিধারার পরিমাণ এবং য়ুরেনাম থেকে এই রশ্মিধারার ছিটকে বের হবার গতি উত্তাপ দিয়ে অথবা অন্য কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাড়ান বা কমান সম্ভব নয়। বাইরের জগতের কোন ধারই ধারে না এই রশ্মিকণাগুলি। য়ুরেনাম ধাতুটি যে ভাবে এদের ছুঁড়ে দেয় এরা ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে আসে বাইরে। য়ুরেনামের এরূপ রশ্মি বিচ্ছুরণ করবার স্বভাবের নাম দেওয়া হ'ল তেজস্ক্রিয়া বা রেডিও-এ্যাকটিভিটি। আর য়ুরেনামকে বলা হ'ল তেজস্ক্রিয়

পদার্থ। য়ুরেনাম আবিষ্কারের কিছুদিন পরেই বিজ্ঞানী পিয়ারে কুরি এবং ম্যাডাম কুরি পোলোনিয়াম, রেডিয়াম ও থোরিয়াম নামে আরো তিনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন। পরীক্ষায় দেখা গেল য়ুরেনামের চেয়ে রেডিয়ামের রশ্মি বিচ্ছুরণের ক্ষমতা প্রায় দশলক্ষগুণ বেশি। এইসব তেজস্ক্রিয় পদার্থের গা থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মিধারা বিশ্লেষণ করা হ'লে দেখা গেল এই রশ্মিধারাতে তিনরকমের রশ্মিকণা মিশ্রিত হয়ে আছে। গ্রীক অক্ষরের নাম অনুযায়ী একটির নাম দেওয়া হ'ল 'আলফা' রশ্মি, দ্বিতীয়টির 'বিটা' এবং তৃতীয়টির 'গামা'।

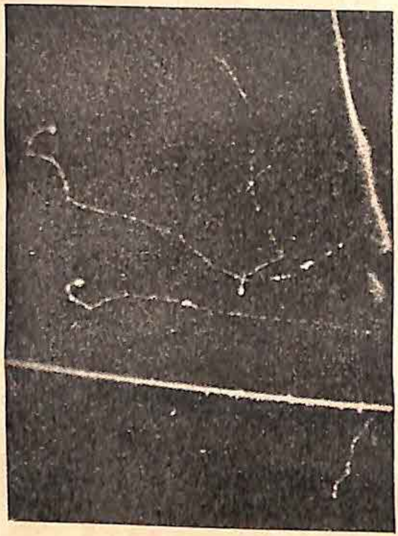


চুম্বকের সামনে আলফা রশ্মিকণাগুলি বাঁ দিকে এবং বিটা রশ্মিগুলি ডানদিকে বেঁকে গেছে। গামা রশ্মি চুম্বকের প্রভাব অস্বীকার ক'রে সোজা চলে গেছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ রশ্মিধারার কাছে একটি চুম্বকের পজিটিভ মুখ এনে ধরলে দেখা যাবে আলফা রশ্মিগুলি উল্টো দিকে বেঁকে গেছে এবং একটা রশ্মি চুম্বকের দিকে বেঁকে চলেছে। কিন্তু গামা রশ্মিগুলি চুম্বকের উপস্থিতির কোন পরোয়া না ক'রে সোজাই চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আলফা ও বিটা রশ্মিগুলি বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন। কিন্তু গামা রশ্মিগুলি নিরপেক্ষ অর্থাৎ বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন নয়। এই রশ্মিগুলির বৈদ্যুতিক স্বভাব জানা হ'লে এদের অন্যান্য প্রকৃতিগুলি জানবার চেষ্টা হ'ল।

আলফা রশ্মি

পরীক্ষা ক'রে জানা গেল আলফা রশ্মি কতগুলি পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সমষ্টি মাত্র। বৈজ্ঞানিক ক্রুকস যে পজিটিভ রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮৮৬ সালে, সেই পজিটিভ রশ্মি আর এই আলফা রশ্মি একই জিনিষ। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা এই আলফা রশ্মি-গুলোর ছুটে চলবার বেগ পজিটিভ রশ্মি থেকে বেশি। পজিটিভ রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ছুটতে পারে একহাজার আটশ মাইল বেগে আর আলফা রশ্মি ছুটতে পারে একত্রিশ হাজার থেকে সাঁইত্রিশ হাজার মাইল বেগে। আলফা রশ্মিগুলি পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন। তাই চুম্বকের সামনে উল্টোদিকে বেঁকে



আলফা ও বিটা রশ্মির ফটো পথ
সোজা রেখাটি আল্ফা রশ্মির পথ এবং আঁকাবাঁকা ভাঙা ভাঙা রেখা বিটা রশ্মির পথ।
আল্ফা ও বিটা রশ্মিগুলি চলার পথে জলকণা জমিয়ে যে রেখা
সৃষ্টি করেছে, তাই ফটোর প্লেটে ধরা পড়েছে।

যায়। বেড়া ভেদ ক'রে ছোটবার ক্ষমতা আলফা রশ্মির বেশি নেই। এক টুকরো পাতলা কাগজও আলফা রশ্মির পথ আটকে দিতে পারে। জিংক ব্লেণ্ডি নামের যৌগিক পদার্থ দিয়ে লেপা কোন পর্দার গায়ে যদি এই আলফা রশ্মিগুলি এসে আঘাত করে তা' হ'লে এক সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এক

একটি আলফা রশ্মি এসে পর্দার গায় আঘাত করে আর ক্ষণে ক্ষণে পর্দার গা থেকে একপ্রকার আলো ঝলসাতে থাকে। ঠিক যেন বুলেটের গুলির আঘাতে সৃষ্টি হওয়া স্পার্কের মত। প্রতিটি আলোর ঝলসানি গুণে বলা যায় কয়টি আলফা কণা এসে পড়ল পর্দার গায়ে। এমনি ক'রে আলফা কণাগুলো গুণে গুণে অঙ্ক ক'ষে প্রতিটি আলফা কণার ওজন বের করা হ'ল। এবং এক একটি আলফা কণা কয়টি প্রাথমিক বিদ্যুৎ রেণু বহন করে অর্থাৎ কি পরিমাণ চার্জ রয়েছে একটি আলফা কণার তাও মাপা হ'ল। ওজন ও চার্জ মেপে এক আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেল। প্রতিটি আলফা কণার আণবিক ওজন চার অর্থাৎ হিলিয়াম নামের মৌলিক পদার্থের সমান। আর এই আলফা কণার সঙ্গে জড়িত রয়েছে দুইটি মৌলিক বিদ্যুৎ রেণু। এই আলফা কণাগুলি তেজস্ক্রিয় ধাতুর গা থেকে বাতাসে এক ইঞ্চি থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি দূর যেতে না যেতেই বাতাস থেকে দুটি নেগেটিভ বিদ্যুৎ রেণু নিয়ে নিরপেক্ষ হিলিয়াম গ্যাস হয়ে বাতাসে যায় মিলিয়ে।

বিটা রশ্মি

বিটা রশ্মির বৈদ্যুতিক গুণ পরীক্ষা হ'লে দেখা গেল এরা ক্যাথোড রশ্মি ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্যাথোড রশ্মি যেমন ইলেকট্রণের সমষ্টি, বিটা রশ্মিগুলি তেমনি ইলেকট্রনের পুঞ্জ মাত্র। তাই ক্যাথোড রশ্মির মতই বিটা রশ্মিগুলিও চুম্বকের সামনে বেঁকে যায়। কিন্তু বিটা রশ্মিগুলি যে ইলেকট্রন দিয়ে গড়া সেই ইলেকট্রনগুলি ক্যাথোড রশ্মির ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ছুটতে পারে। বিটা রশ্মিগুলির গতিবেগ এত দুর্দান্ত হ'তে পারে যে প্রতি সেকেণ্ডে দুই হাজার থেকে প্রায় একলক্ষ মাইল বেগে ছুট্‌তে পারে, বিটা রশ্মির এই ইলেকট্রন কণাগুলি। ক্যাথোড রশ্মি ইলেকট্রনের মতই বিটা রশ্মির ইলেকট্রনগুলিও ওজনে হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং প্রতিটি ইলেকট্রনও মাত্র একটি নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু বহন করে। বিটা রশ্মিগুলি হালকা এবং দুরন্ত বেগে ছুটে চলতে পারে—তাই এরা বাতাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে পারে এবং পাতলা কোন ধাতু পদার্থ পথের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে সেগুলিকে ভেদ ক'রে যেতেও বিটা রশ্মিগুলি অপারক নয়।

গামা রশ্মি

গামা রশ্মিগুলি বিদ্যুৎকণা নয়—আলোক রশ্মি মাত্র। তাই এরা চুম্বকের সামনে এদিকে ওদিকে বাঁকে না। গামা রশ্মিগুলি জাতে রঞ্জন রশ্মির মত, শুধু গামা রশ্মিগুলির এক একটি তরংগের দীর্ঘতার মাপে রঞ্জন রশ্মির চেয়ে অনেক ছোট। গামা রশ্মিগুলি আলো ছাড়া আর কিছু নয়, তাই এদের গতিবেগও সূর্যের আলোর গতিবেগের মত প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ দুর্দান্তবেগে এই তিন রকমের রশ্মিধারাই শুধু যে অবিরাম ছুঁড়ে দেয়, তা নয়। রশ্মিধারার সংগে সংগে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভেতর থেকে এক প্রচণ্ড উত্তাপ শক্তি অফুরন্ত প্রস্রবণের মত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উৎসারিত উত্তাপের পরিমাণ এত বেশি যে পাঁচ গ্রাম রেডিয়ামের উত্তাপ এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ গ্রাম বরফ-শীতল জলকে টগবগ ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এরকম প্রচণ্ড উত্তাপ তো সমপরিমাণ কোন বস্তু থেকেই কোন অবস্থায়ই পাওয়া সম্ভব নয়। পাঁচ গ্রাম কাঠ পোড়ালে তো এত উত্তাপ কোন সময়েই মিলবেনা। তবে এই তাপ-শক্তির উৎস কোথায় ?

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে একাধারে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি অর্থাৎ ইলেকট্রন, হিলিয়াম পরমাণু এবং রঞ্জন আলোর বিরামহীন বিচ্ছুরণ এবং তাপ-শক্তির অফুরন্ত উৎসারণ হ'তে দেখে বিজ্ঞানীদের মনে জিজ্ঞাসা জেগে উঠল। এ জিজ্ঞাসা আরো পাকা হ'ল যখন তাঁরা দেখলেন কি য়ুরেনাম, কি রেডিয়াম, কি থোরিয়াম যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই আলফা, বিটা ও গামা রশ্মিগুলি বিচ্ছুরিত হ'ক না কেন এ রশ্মিগুলি ওজনে, বিদ্যুৎ-গুণে, বৈদ্যুতিক জোরে এবং প্রকৃতিতে হুবহু এক প্রকার।

বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করলেন এই সব রশ্মিগুলির জন্মস্থান কি পদার্থের অভ্যন্তরে ? পদার্থের পরমাণুরা কি নিজেদের ভেংগে ভেংগে ছেড়ে দিচ্ছে এই তাপ ধারা ও রশ্মিস্রোতগুলি ? যদি তাই হয় তবে যে পরমাণু নিজেদের ভেংগে রশ্মিগুলি ছুঁড়ে দিচ্ছে বাইরে তার পরমাণুর ওজন তো কমে যাওয়ার কথা। এক একটা আলফা রশ্মির ওজন হ'ল হিলিয়াম অণুর সমান। সুতরাং যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু একটি আলফা রশ্মি ছুঁড়ে দিচ্ছে তার পরমাণবিক ওজন আলফা রশ্মি ছোঁড়ার পর চার (৪) কম হবে। যদি দুটো আলফা

রশ্মি ছুঁড়ে দেয় তবে আট (৮) কম হবে এবং যদি তিনটে ছুঁড়ে দেয় তবে বার (১২) কম হবে। রেডিয়ামের পরমাণবিক ওজন ২২৬। যদি একটি রেডিয়াম পরমাণু একটি আলফা রশ্মি ছুঁড়ে দেয় তা'হলে আলফা রশ্মি বিচ্ছুরণের পরে রেডিয়ামের পরমাণবিক ওজন হওয়া উচিত দু'শ ছাব্বিশ থেকে চার কম অর্থাৎ দু'শ বাইশ (২২২), কিন্তু রেডিয়ামের পরমাণুর এই পরিবর্তন কি সম্ভব? রেডিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ এবং মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই পরমাণবিক ওজন তো কখনো বাড়তে কমতে পারে না? তবে কি মৌলিক পদার্থ কম ওজনের মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়? ১৯০০ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থোরিয়াম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা রশ্মি বিচ্ছুরণের সংগে সংগে সত্যি অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় নিঃসার

রাদারফোর্ড দেখলেন, তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম থেকে একপ্রকার গ্যাস নিঃসারিত হয়। এবং দেখা যায় এই গ্যাস নিঃসারও একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং এই গ্যাস নিঃসারও তেজরশ্মি বিকীর্ণ ক'রে অন্য নিঃসারে রূপান্তরিত হয়। পরে জানা গেল রেডিয়াম থেকেও এরূপ তেজ নিঃসার পদার্থ বিচ্ছুরিত হয়। এবং এই নিঃসার আবার পর পর অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। থোরিয়াম বা রেডিয়াম থেকে পাওয়া এই সব রূপান্তরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির পরমাণবিক ওজন মাপা হ'লে দেখা গেল রূপান্তরিত পদার্থের প্রত্যেকেই এক একটি নতুন পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রেডিয়ামের পরমাণবিক ওজন ২২৬, একটি আলফারশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে, রেডিয়াম রূপান্তরিত হয়ে যায় ২২২ পরমাণবিক ওজনের রেডনে। রেডন একটা আলফা রশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে রূপান্তরিত হয় ২১৮ পরমাণবিক ওজনের রেডিয়াম-এ নামক পদার্থে; এমনিতর একটির পর একটি আলফা রশ্মি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শেষ পর্যন্ত রেডিয়াম এসে রূপান্তরিত হয় ২০৬ পরমাণবিক ওজনের নিষ্ক্রিয় বা স্বাভাবিক সীসায়। বিটা রশ্মিগুলি ওজনে আলফা রশ্মির প্রায় আট হাজার ভাগ, একভাগ বিটা রশ্মি বিচ্ছুরণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তাই পরমাণবিক ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না।

পদার্থের মৌলিক উপাদান

ক্যাথোডরশ্মি ও পজিটিভরশ্মি আবিষ্কারের ফলে পদার্থের মূল উপাদান সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যে সন্দেহ করেছিলেন প্রকৃতিই সে সন্দেহকে হাতেকলমে সত্য ব'লে প্রমাণ ক'রে দিল। রাদারফোর্ডের আবিষ্কারে চূড়ান্তভাবে জানা গেল এতকালের পরিচিত মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি যারা অপরিবর্তনশীল ও অবিভাজ্য ব'লে খ্যাত ছিল আসলে তারা মৌলিক নয়। ১৯০২ সালে রাদারফোর্ড নিঃসন্দেহ ভাবে জানিয়ে দিলেন বস্তুজগতের মূল উপাদান তথাকথিত বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ নয়—বস্তুজগতের মূল উপাদান হ'ল মাত্র ছুরকমের পদার্থ—নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা এবং পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। এই দু'রকম বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ও জ্যামিতিক সংগঠনের ওপর নির্ভর ক'রে গড়ে উঠেছে তথাকথিত মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংগঠন ও মৌলিকত্ব। এই দু'রকমের বিদ্যুৎকণা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংখ্যায় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং এই নির্দিষ্ট বিদ্যুৎকণাগুলি এক একটি বিশিষ্ট ঢঙে, সংগঠিত হ'য়ে এক একটি তথাকথিত মৌলিক পদার্থের পরমাণু গড়ে তুলেছে। এই নেগেটিভ ও পজিটিভ বিদ্যুৎকণাগুলি একটি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে পরস্পরকে প্রবল আকর্ষণে বেঁধে রেখেছে পরমাণুর অভ্যন্তরে। এই টান প্রবল এক শক্তিরূপে সুপ্ত রয়েছে পরমাণুতে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই বিদ্যুৎকণাগুলি সুস্থির হ'য়ে বসবাস করে পরমাণুতে। কিন্তু পরমাণুতে এদের সংখ্যা বিশেষভাবে হয়ত বেড়ে গেলে বিদ্যুৎকণাগুলি অস্থির হ'য়ে ওঠে। ভারী মৌলিক পদার্থ য়ুরেনাম, রেডিয়াম ইত্যাদির পরমাণুতে এই বিদ্যুৎকণাগুলির ভিড় এত বেড়ে যায় ব'লে সম্ভবতঃ বিদ্যুৎকণাগুলি চঞ্চল ও অস্থির হ'য়ে ওঠে, এবং আলফা ও বিটা রশ্মিরূপে পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে যায় বাইরে। আলফা, বিটা রশ্মিগুলি ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে শক্তিতে এই রশ্মিকণারা পরমাণুর অভ্যন্তরে পরস্পরকে বেঁধে রেখেছিলো সেই শক্তি বন্ধনহীন হয়ে পড়ে এবং তাপশক্তিরূপে মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসে তেজ রশ্মির সংগে। আলফা ও বিটা রশ্মির বিচ্ছুরণের ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরে যে স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, সেই স্পন্দন থেকেই জন্ম নেয় গামা আলোক রশ্মিগুলি। এইভাবে কোন পরমাণু থেকে তেজরশ্মি ছিটকে বেরিয়ে গেলে অবশিষ্ট বিদ্যুৎকণাগুলি নতুনভাবে সংগঠিত হ'য়ে নতুন পরমাণু গ'ড়ে তোলে। রেডিয়াম

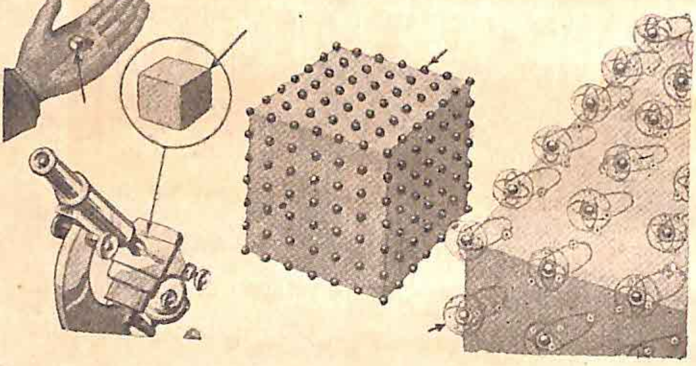
ও থোরিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এমনিভাবে তেজরশ্মি বিচ্ছুরিত ক'রে ক্রমে ক্রমে এসে শেষ অবস্থায় সীসার পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। একটি পদার্থের পরমাণুর মধ্যে সমান সংখ্যার নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা ও পজিটিভ বিদ্যুৎকণা পরস্পরের বৈদ্যুতিক শক্তিকে জব্দ ক'রে রাখে ব'লে সাধারণ পদার্থ পরমাণু-গুলিকে পাওয়া যায় নিরপেক্ষরূপে যাদের পরমাণুর দেহে বিদ্যুতের কোন অস্তিত্বই প্রকাশ পায় না।

পরমাণুর সংগঠন

প্রতিটি তথাকথিত মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রনও পজিটিভ বিদ্যুৎকণা দিয়ে গড়া এ খবর জানা গেল। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কিন্তু বিদ্যুৎকণাগুলি পরমাণুর অভ্যন্তরে কিভাবে সংগঠিত তার কোন পাকা খবর পাওয়া গেল না। ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী লেনার্ড, ক্যাথোডরশ্মির ইলেকট্রন নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় একটা মোটামুটি আন্দাজী খবর দিয়েছিলেন। লেনার্ড দেখিয়েছিলেন ইলেকট্রন কণাগুলি কাচ, এ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদি ধাতুর পাতলা পাত এপিট ওপিট ভেদ ক'রে অনায়াসেই চ'লে যেতে পারে। অথচ ধাতব পাতের গায় একটি ছিদ্রের চিহ্নও দেখা যায় না। পরীক্ষাতে তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন ধাতুর পাতগুলি যদি পুরু হয়, তাহ'লে সেই ধাতব পাতগুলি প্রতি সেকেণ্ডে হাজার মাইলের চেয়ে বেশি বেগে ছোটা ইলেকট্রন কণাকে শোষণ ক'রে ফেলতে পারে ; এবং এক একটি ধাতবপাত কয়টি ইলেকট্রনকণা শোষণ করতে পারে তা' নির্ভর করে ধাতবপাতের ওজনের ওপর। এ ধাতবপাতের প্রস্থগুলি যদি এমনভাবে তৈরি থাকে যে প্রতি ইঞ্চি ধাতবপাতের ওজন সমান হবে তা' হ'লে সোনা, রূপা, তামা, প্লাটিনাম, যে কোন ধাতুই হ'ক না কেন সবাই সমান সংখ্যক ইলেকট্রন শোষণ করতে পারে।

পরীক্ষা করার সময় লেনার্ড বাতাসের গায় ক্যাথোডরশ্মির ইলেকট্রন পাত ক'রে দেখলেন বাতাসে একপ্রকার ঘোলাটে আলোর সৃষ্টি হয়। দুধের ওপর সূর্যের আলোকপাত হ'লেও দেখা যায় এমনি ঘোলাটে আলো। লেনার্ড বললেন বাতাসের পরমাণুগুলিই কোটী কোটী ইলেকট্রনকে এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে এই ঘোলাটে আলোর সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এরূপে ঘোলাটে আলো সৃষ্টি করার আগে ইলেকট্রন কণাগুলি হাজার হাজার পরমাণুর অন্দরমহল অনায়াসে ভেদ ক'রে গিয়ে তবে এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

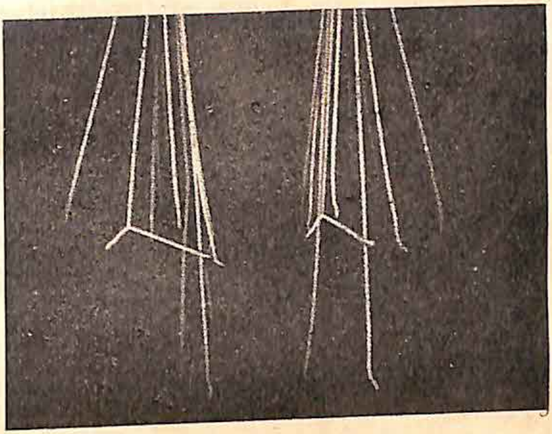
এ দেখে লেনার্ডের মনে প্রশ্ন জাগল পদার্থের পরমাণুকণাগুলি যদি পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বস্তুতে ঠাসা থাকে তবে ইলেকট্রন কি ক'রে পরমাণুমহল অনায়াসে ভেদ করতে পারে? ইলেকট্রনের এই ভেদ করবার ক্ষমতা দেখে লেনার্ড বললেন পরমাণুগুলি আগাগোড়া পদার্থদ্বারা ভরাট নয়। পরমাণুর আয়তনের বেশির ভাগ অংশই ফাঁপা এবং শূন্য। পরমাণু কিরকম ফাঁপা তার একটি কল্পনা করা যায় লেনার্ডের হিসাব থেকে। দু' হাত উঁচু দু'হাত লম্বা একটি ট্রাঙ্কে যদি ঠেসে ঠেসে ভারী প্লাটিনাম ধাতু ভরা যায় তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পুরো ট্রাঙ্কটিই প্লাটিনাম ধাতুতে ভরা। কিন্তু আসলে ট্রাঙ্কভরা প্লাটিনামের মূল পদার্থ একটা আলপিনের মাথার মত স্থান জুড়ে মাত্র রয়েছে। বাকী ট্রাঙ্কের সবটাই একেবারে ফাঁপা ও শূন্যময়। লেনার্ড পরমাণুর সংগঠন



(ক) খালি চোখে দেখা পদার্থ খণ্ড, (খ) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা সেই পদার্থ খণ্ড, (গ) পদার্থের মধ্যে পরমাণু কণা, (ঘ) পরমাণু কণার মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা।

সম্বন্ধে আভাস দিলেন বটে কিন্তু এরও প্রায় অনেক বছর পরে বিজ্ঞানী সি, টি, উইলসন পরমাণুর মহলের সংগঠনের আরো পাকা খবর দিলেন। তিনি আলফারশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলফা রশ্মিকণাগুলিকে জলীয় বাষ্পকণা ভরা একটি চেম্বারের ভেতর দিয়ে যদি পথ ক'রে যেতে দেওয়া যায় তবে দেখা যায় আলফাকণার চলার পথটি আগাগোড়াই বাষ্পীয় জলকণাগুলি শিশির হ'য়ে জমে গেছে। জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়ে এই আলফাকণাগুলির ছুটে চলবার ফটো নিলে দেখা যায় ফটোতে কতগুলি সরল রেখা-পথ পাওয়া গেছে। কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে এই পথ-রেখাগুলির অনেকের মাথাই ডান দিকে বা বাঁ দিকে বাঁকা। বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগল রেখাগুলির মাথা এমন অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে গেল কেন ? তিনি কারণ স্থির ক'রে বললেন আলফা রশ্মিগুলি হ'ল দুটি পজিটিভ বিদ্যুৎ রেণুসহ এক একটি হিলিয়াম অণু। দুইটি পজিটিভ কণা সহ হিলিয়াম অণু যখন দুরন্ত বেগে ছোটে তখন তার পথে পড়ে ইতস্ততঃ ছড়ান বাতাসের সহস্র সহস্র অণু পরমাণু কণা। হিলিয়াম অণু এই সব পথে পড়া



আল্‌ফাকণার পথরেখার মাথাগুলি চলার পথের অন্যান্য পরমাণুর সংগে ধাক্কা খেয়ে এদিকে সেদিকে বেঁকে গেছে।

পরমাণু-কণাদের অনেকের মহল অনায়াসেই ভেদ ক'রে যায় কিন্তু ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যদি কখনও অন্য কোন পদার্থের কোন পরমাণু-মহলের কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়ে, তবে কেন্দ্র থেকে বিষম জোরে খায় এক ধাক্কা, আর সংগে সংগে সোজা পথ ছেড়ে বাধ্য হয়ে যেতে হয় বেঁকে। পরমাণু-কেন্দ্রগুলি আলফা রশ্মিকে এমন জোরে ধাক্কা দেয় কেন ? কারণ আলফা রশ্মিগুলি হ'ল পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং পরমাণুর কেন্দ্রেও রয়েছে পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। তাই এই একজাতের বিদ্যুৎকণা পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে দেয় দূরে সরিয়ে।

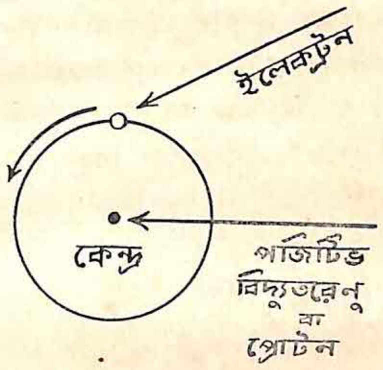
এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হ'ল পদার্থের মূল বস্তু পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কেন্দ্রে অবস্থিত এই মূল বস্তুর উপাদান হ'ল পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। পদার্থ পরমাণুর কেন্দ্র আবিষ্কারের পরীক্ষাটি বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড আরো ভাল ভাবে করলেন। আলফা রশ্মিকণাগুলিকে পাতলা ধাতব পাতের গায়ে আঘাত করতে দিয়ে তিনি দেখলেন, আলফা কণাগুলির অনেকে ছিটকে ছিটকে

একোণে ওকোণে বেঁকে যাচ্ছে। বিভিন্ন পদার্থের ধাতব পাত নিয়ে দেখলেন, ছিটকে পড়া আলফা রশ্মিগুলি একদিকে ছিটকে যায় না—যায় বিভিন্ন কোণে। এই আলফা কণাগুলির ছিটকে আসার কারণ যদি ধাতব পাতের প্রতিঘাত হ'ত, তা'হলে আলফা কণাগুলি কোন্ কোণে ছিটকে যেত তা' সাধারণ একটু অঙ্ক কষেই নিশ্চিন্তভাবে বলে দেয়া যেত। কিন্তু রাদারফোর্ড, পরীক্ষায় আলফা কণাগুলি যেভাবে বড় বড় কোণে ছিটকে পড়ে তা' দেখে, ঠিক করলেন ধাতব-পাতের পরমাণু কণার কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ বিদ্যুৎকণাই আলফা রশ্মিকে এমনভাবে ছিটকে দেওয়ার জন্য দায়ী। যে সব পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রগুলি আলফা রশ্মিগুলিকে ছিটকে দেয় তারা কয়টি ক'রে পজিটিভ বিদ্যুৎ-রেণু ধারণ করে তাও মেপে বের ক'রে দিলেন তিনি। কয়েক বছর পরে সাডউইক (Chadwick) রাদারফোর্ডের সিদ্ধান্তকে নির্ভুল ব'লে প্রমাণ ক'রে দিলেন।

পরমাণু মহল

এইসব পরীক্ষা দ্বারা পরমাণু সংগঠনের মোটামুটি খবর পাওয়া গেল। জানা গেল পরমাণুর দু'টি ভাগ—একটি অন্দর-মহল আর একটি বাহির-মহল। অন্দর-মহলের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এই পরিধি জুড়ে পজিটিভ বিদ্যুৎকণাগুলি ঠাসাঠাসি ক'রে ভিড় ক'রে রয়েছে। এই অন্দর-মহলের একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া হ'ল পরমাণুকেন্দ্র (Nucleus)। পরমাণুর বাহির-মহলে শান্ত্রীর মত দূরে দূরে রয়েছে নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রণগুলি। বাহির মহলের বেশির ভাগই ফাঁপা এবং পরমাণু কেন্দ্রের তুলনায় বাহির বা ইলেকট্রন মহলের পরিধি অজস্র গুণ বড়। লেনার্ডের কল্পনাটি আবার স্মরণ করলে দেখা যায় দু'হাত উঁচু লম্বা ও দু'হাত পাশের একটি ট্রাঙ্ক যদি প্লাটিনামের পরমাণু দিয়ে ভরা যায়, তা'হলে সমস্ত প্লাটিনামের পরমাণুকেন্দ্রগুলির মোট স্থান হবে একটি পিনের মাথার মত—একটু নগণ্য পরিধি ; আর বাকী জায়গার সবটুকু হবে ইলেকট্রন মহলের বিস্তৃত পরিধি। অর্থাৎ অঙ্ক দিয়ে হিসাব দিতে গেলে বলা যায় এক সেন্টিমিটারকে এক লক্ষ কোটী ভাগ করলে সব চেয়ে ভারী পদার্থের সব চেয়ে বড় পরিমাণ কেন্দ্রের ব্যাসের মাপ হবে মাত্র এর এক ভাগ। পক্ষান্তরে সব চেয়ে বড় পদার্থের ইলেকট্রন মহলের ব্যাস এক সেন্টিমিটারকে দশ কোটী ভাগ করলে তার এক ভাগের সমান পর্যন্ত বড় হ'তে পারে।

পদার্থের পরমাণু সম্বন্ধে পাওয়া এইসব তথ্য একত্র ক'রে ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম পরমাণুর একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। সব চেয়ে হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং সেই কণাটিতে রয়েছে এক রেণু পরিমাণ পজিটিভ বিদ্যুৎ। আর এই পরমাণুকেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে সৌরলোকের মত বৃত্তাকারে ঘুরছে এক রেণু নেগেটিভ বিদ্যুৎবাহী

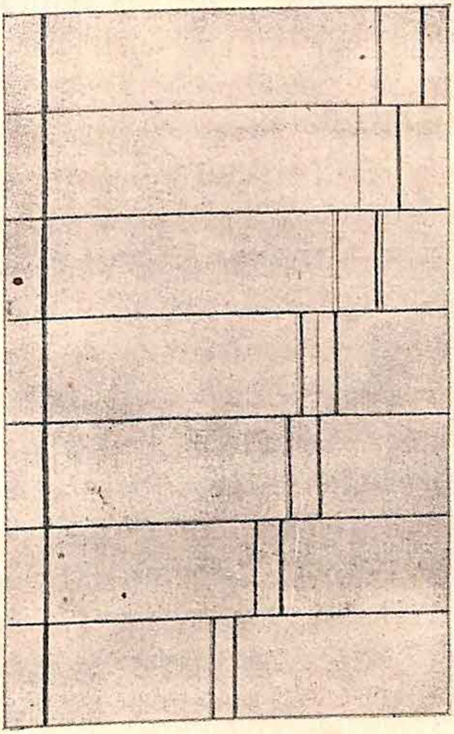


রাদারফোর্ডের হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিকল্পনা।

একটিমাত্র ইলেকট্রন। এক কেন্দ্রে ও ইলেকট্রনে ভিন্ন প্রকৃতির কিন্তু সমপরিমাণ বিদ্যুৎ রয়েছে ব'লে স্বাভাবিক অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণুকে পাওয়া যায় নিরপেক্ষ পরমাণু রূপে, যার মধ্যে বিদ্যুতের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। রাদারফোর্ড হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রের একটি বিশিষ্ট নাম দিলেন—"প্রোটন", এবং বললেন সমস্ত তথাকথিত মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণু এরূপ বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রন দিয়ে সংগঠিত। আরো বললেন, পরমাণুর যে মৌলিকত্ব তা' নির্ভর করে এই ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার ওপর। হাইড্রোজেন পরমাণুতে রয়েছে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন। হিলিয়ামে রয়েছে দুটি ইলেকট্রন ও দুটি প্রোটন। লিথিয়ামে তিনটি ইলেকট্রন ও তিনটি প্রোটন। এমনি ক'রে পর পর বেড়ে যাওয়া পরমাণুর ওজনের সংগে সংগে একটি ক'রে ইলেকট্রন ও একটি ক'রে প্রোটনও বেড়ে চলেছে। এমনি ক'রে ইলেকট্রন, প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সব চেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ য়ুরেনামের পরমাণুতে এসে জমা হয়েছে ৯২টি ইলেকট্রন ও ৯২টি প্রোটন।

হ'তে থাকে। পর পর প্রোটনের সংখ্যা বাড়বার সংগে সংগে রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্যের মাপ এমন সুশৃংখল ভাবে এখন ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে যে, যে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে প্রত্যাগত তরংগ-দৈর্ঘ্যের মাপ দেখে অনায়াসে ব'লে দেওয়া যায়, পরমাণুকেন্দ্রে কয়টি প্রোটন বা কি পরিমাণ চার্জ আছে। প্রত্যাগত রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্যের মাপ নেওয়ার উপায় হ'ল তার বর্ণালি নেওয়া এবং সেই বর্ণালি থেকে তরংগ-দৈর্ঘ্যের মাপ বের করা। মোসলে এইভাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ভেতর রঞ্জন রশ্মি প্রবেশ করিয়ে সেই পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র থেকে ফিরে আসা ক্ষুদ্রতর রঞ্জন রশ্মিগুলির বর্ণালির ফটো গ্রহণ করলেন। বর্ণালির ফটোতে পাওয়া গেল পর পর সাজানো কতগুলি গোছা গোছা রেখা। প্রত্যেকটি পদার্থ-পরমাণু-কেন্দ্র-প্রত্যাগত রঞ্জন রশ্মিগুলি একহারা নয়—কয়েকটি তরংগ-দৈর্ঘ্যের সমষ্টি। তাই বর্ণালির ফটোতে একটি মৌলিক পদার্থের জন্য যে রেখা পড়েছে সে রেখাটি একহারা নয়, কয়টি রেখার গোছা। তিনি দেখলেন প্রত্যকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে প্রত্যাগত রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলে, বর্ণালির ফটোতেও প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে সাজান, কারো গায়ে এসে কেউ ভিড় ক'রে পড়ছে না। বিভিন্ন পদার্থের বর্ণালি একত্র ক'রে সাজালে রেখাগুলির দূরত্বের মধ্যে এমন একটি শৃংখলা দেখা যায় যা থেকে নির্ভুল ভাবে বলা যায়, হাইড্রোজেন থেকে আরম্ভ ক'রে য়ুরেনাম পর্য্যন্ত পর পর একটি ক'রে প্রোটন ও প্রোটনের সংগে একটি একটি প্রাথমিক বিদ্যুৎরেণু বেড়ে গিয়ে বিরানব্বূইটি প্রোটনে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী মোসলে এইভাবে রঞ্জন রশ্মি দিয়ে গুণে গুণে জানিয়ে দিলেন এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে কয়টি প্রোটন বা পজিটিভ বিদ্যুৎকণা আছে এবং সেই সংগে পরমাণুকেন্দ্রে আছে কত পরিমাণ বৈদ্যুতিক জোর বা চার্জ। মোসলের গবেষণার সাত বছর পর বিজ্ঞানী সাডউইক বিভিন্ন পদার্থের গায়ে আলোকরশ্মি-কণা ছুঁড়ে দিয়ে এবং সেইসব পদার্থের গা থেকে আলোকরশ্মিকণাগুলো ছিট্‌কোতে দিয়ে যে পদার্থ ছিটকে দেয় সে পদার্থ পরমাণুগুলির পরমাণু কেন্দ্রের চার্জের খবর সন্ধান করেন। আলোকরশ্মি কণাগুলি কোন্ কোন্ কোণে ছিট্‌কে যায় তা' দেখে তিনি অঙ্ক ক'ষে বের করলেন প্লাটিনাম, সোনা, ও তামার পরমাণু কেন্দ্রের চার্জের পরিমাণ অর্থাৎ পরমাণুকেন্দ্রে কয়টি পজিটিভ কণা বা প্রোটন আছে এবং সেই সংগে আছে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যুৎরেণু। এই সংখ্যা বের

হ'লে দেখা গেল মোসলের গোণা পরমাণবিক সংখ্যার সংগে সাডউইকের পরিমাণ মিলে গেছে। এমনি ক'রে বিজ্ঞানী মোসলে ও সাডউইকের গবেষণায়



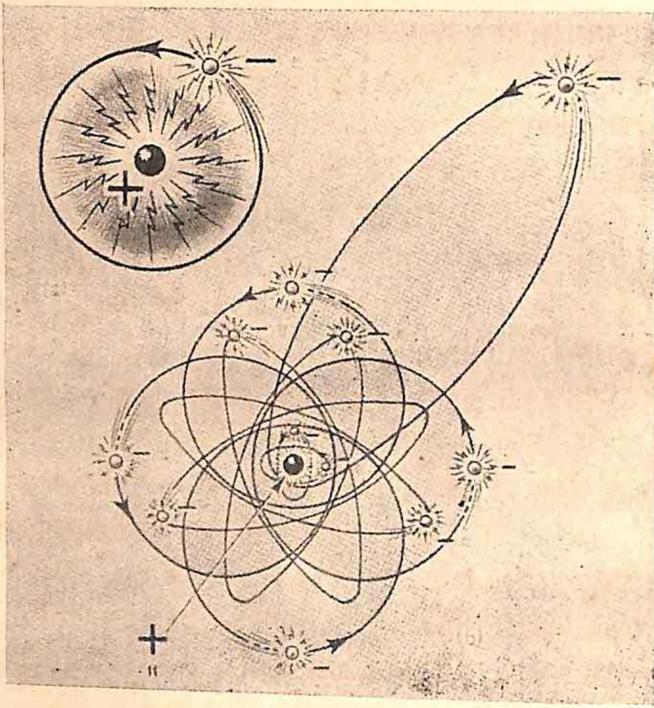
মোসলের বর্ণালির ফটো

পরোক্ষভাবে রাদারফোর্ডের পরমাণবিক সংগঠনের পরিকল্পনায় পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল তার পরিমাপ হুবহু সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'ল।

পরমাণুকেন্দ্র

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে জানা গেল, পরমাণুর দুটি ভাগ, একটি পরমাণুকেন্দ্র এবং অপরটি ইলেকট্রন-মহল। ইলেকট্রন-মহল আয়তনে পরমাণু-কেন্দ্র থেকে অনেক অনেক বড়। কিন্তু ইলেকট্রন-মহলের অধিকাংশ স্থানই ফাঁপা ও শূন্যময়। পক্ষান্তরে পরমাণুকেন্দ্রের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং এর আগা-

এই ৯২টি প্রোটন কেন্দ্রীভূত রয়েছে য়ুরেনামের পরমাণু কেন্দ্রে এবং এই প্রোটন মহলকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে অবিরাম ঘুরছে ৯২টি ইলেকট্রন। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে অবস্থিত ইলেকট্রন বা প্রোটনের মোট সংখ্যার একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া হ'ল পরমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number)।



(উপরে) হাইড্রোজেন পরমাণু : একটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা অবিরাম ঘুরছে।

(নীচে) সোডিয়াম পরমাণু : কেন্দ্রের এগারটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণাকে কেন্দ্র ক'রে ১১টি নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা অবিরাম ঘুরছে।

সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী হাইড্রোজেনের পরমাণবিক সংখ্যা এক, হিলিয়ামের দুই, এমনি ক'রে বেড়ে গিয়ে য়ুরেনামের পরমাণবিক সংখ্যা হবে বিরানব্বুই। সুতরাং দেখা যায় প্রতিটি পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা যত, ঠিক ততটি ক'রে দুই জাতের প্রাথমিক বিদ্যুৎ রেণুও (Elementary quantum of electricity) রয়েছে পরমাণুতে।

পরমাণবিক সংখ্যা ও পরমাণুকেন্দ্রের বিদ্যুতের রেণুসংখ্যা বা পরমাণবিক চার্জ

রাদারফোর্ডের পরমাণুর পরিকল্পনা তখন পর্যন্ত অনেকটা কল্পনাই ছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছাড়া অন্য পদার্থের বেলায় ঐ পরিকল্পনার যথার্থতা তখনো পাকাপাকি ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই রাদারফোর্ডের পরমাণু পরিকল্পনার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখালেন রাদারফোর্ডেরই শিষ্য, পঁচিশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী মোসলে (১৯১৩ সালে)। সাধারণতঃ কোন পদার্থের ওপর আলোকপাত করলে পদার্থটি আলোকের অনেকখানিই শোষণ ক'রে নেয় এবং নিজ পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু নতুন ধরণের আলোক রশ্মি আবার ফিরিয়েও দেয়। এই ফিরিয়ে দেওয়া আলোক রশ্মিগুলির বিভিন্ন তরংগ দৈর্ঘ্যের মাপ হয় বিভিন্ন প্রকারের। তাদের বর্ণালি বা বর্ণমালা (spectrum) গ্রহণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের বর্ণালির একটি স্বকীয়তা আছে। কিন্তু সাধারণ আলো থেকে পাওয়া বর্ণালির রেখাগুলি পরস্পরের গায়ে ঠেসাঠেসি ক'রে এমন ভিড় ক'রে থাকে যে বর্ণালি থেকে পদার্থের স্বকীয়তা নির্ণয় করা খুব দুষ্কর হ'য়ে পড়ে। এবং সব পদার্থের বর্ণালি গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না ; তাছাড়া সাধারণ আলো পরমাণুর ইলেকট্রন-মহল থেকেই ফিরে আসে, প্রোটন মহলের কোন খবরই আনতে পারে না। মোসলে এই অসুবিধা দূর করলেন। সাধারণ আলোর পরিবর্তে তিনি রঞ্জন রশ্মি ব্যবহার করলেন পদার্থ পরমাণুর খবর সংগ্রহে। রঞ্জন রশ্মি এত তীক্ষ্ণ যে অনায়াসে ইলেকট্রন মহল ভেদ ক'রে একেবারে পরমাণুকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছে যায় এবং ফিরে আসবার সময় পরমাণু-কেন্দ্রের খবর নিয়ে আসে সংগে ক'রে। এই ফিরে-আসা রঞ্জন রশ্মিকে আটকিয়ে পরমাণুকেন্দ্রে কয়টি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা আছে এবং কয়টি বিদ্যুৎরেণু আছে তা'র পাকা খবর আদায় করা সম্ভব হয়। দেখা যায় পরমাণুকেন্দ্রে ঢোকবার সময় রঞ্জন রশ্মির তরংগ দৈর্ঘ্যের যে মাপ থাকে ফিরে আসবার সময় সে মাপ থাকে না। প্রত্যাগত রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্যের মাপ কতখানি হ্রাস পায়, তার পরিমাণ নির্ধারিত হয় পরমাণুকেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যার ওপর। প্রোটনের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে প্রত্যাগত রঞ্জন রশ্মির তরংগ-দৈর্ঘ্য ততই ছোট

গোড়াই পরমাণুকেন্দ্রের মৌলিক উপাদানে ভরাট। ইলেকট্রন প্রোটনের তুলনায় প্রায় দু হাজার গুণ হালকা, তাই পরমাণুর ওজনের প্রায় সবটুকু ভারই নির্ভর করে পরমাণুকেন্দ্রের ওজনের ওপর। রাদারফোর্ড, মোসলে ইত্যাদির গবেষণায় পরমাণুকেন্দ্রের মৌলিক উপাদানের যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা গেল বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে পুঞ্জীভূত রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যার পজিটিভ বিদ্যুৎকণা।

যদি পজিটিভ বিদ্যুৎকণাগুলিই পরমাণুকেন্দ্রের একমাত্র অধিবাসী হয় তা'হ'লে পরমাণবিক ওজন ও পরমাণবিক সংখ্যার মাপ পৃথক হবে কেন? হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন চার কিন্তু পরমাণবিক সংখ্যা হ'ল দুই এবং য়ুরেনামের পরমাণবিক ওজন ২৩৮ আর পরমাণবিক সংখ্যা হ'ল মাত্র ৯২। যদি পজিটিভ বিদ্যুৎকণাই হয় পরমাণুকেন্দ্রের একমাত্র উপাদান তাহলে হিলিয়ামের ৪ পরমাণবিক ওজনের মাত্র অর্ধেক ওজন তো পূরণ হয় মাত্র দুটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা দিয়ে; কিন্তু বাকী দুই ওজনের পূরণ হয় কি দিয়ে? তেমনি য়ুরেনামের ২৩৮ ওজনের মাত্র ৯২ ওজন পূরণ হয় পজিটিভ বিদ্যুৎকণা দিয়ে, কিন্তু বাকী ১৪৬ ওজন পূরণ হয় কি দিয়ে? পজিটিভ বিদ্যুৎকণা ছাড়া পরমাণুকেন্দ্রের অংশ কি দিয়ে পূরণ হয় তার পরীক্ষালব্ধ খবর ১৯৩২ সালের আগে পাওয়া যায়নি। তাই বিজ্ঞানীরা তখন কল্পনা করেছিলেন যে পরমাণুকেন্দ্রের মধ্যে পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংগে এমন আরও এক রকম পদার্থকণা রয়েছে যার কোন বিদ্যুৎ গুণ নেই, কিন্তু পজিটিভ বিদ্যুৎকণা বা এক একটি প্রোটনের সমান ওজন আছে এবং পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং এই নিরপেক্ষ পদার্থকণা সমন্বয়েই পরমাণুকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু যেই মাত্র কল্পনা করা হ'ল পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংগে আর এক প্রকার নিরপেক্ষ পদার্থকণা রয়েছে পরমাণুকেন্দ্রে, তখনই সংগে সংগে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন এল মৌলিক পদার্থের পরমাণু মাত্রেরই মৌলিকত্বের জন্য কি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং ঐ নিরপেক্ষ পদার্থকণাগুলি সমান ভাবে দায়ী? এবং তাই যদি হয় তা'হ'লে কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং নিরপেক্ষ পদার্থকণার চিরকালের জন্য সংখ্যায় এক হওয়া উচিত, অর্থাৎ ২২৬ পরমাণবিক ওজনের পরমাণুতে যদি এক সংগে থাকে ৮৮টি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং ১৩৮টি নিরপেক্ষ বিদ্যুৎকণা, তাহ'লে প্রত্যেক রেডিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রে (সে রেডিয়াম যেখানে এবং যখনই পাওয়া যাক

না কেন) এই সংখ্যা দুটি চিরকালের জন্য একই থাকবে। হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায় এ কথা খাটে ; কারণ, হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজনও প্রায় এক এবং এর পরমাণুকেন্দ্রেও আছে মাত্র একটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। পক্ষান্তরে অন্য সমস্ত পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের ওজনের বেলায় দেখা যায় এই সংখ্যা চিরকাল এক থাকে না। তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে এরূপ অনেক পদার্থ পাওয়া যায় যারা রাসায়নিক পদার্থরূপে সম্পূর্ণ একরকম কিন্তু তাদের পরস্পরের ওজন এক নয়। য়ুরেনাম, রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইত্যাদি থেকে রূপান্তরিত পদার্থরূপে সীসা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় এইসব বিভিন্ন মূল পদার্থ থেকে পাওয়া সীসার পরমাণবিক ওজন বিভিন্ন। প্রকৃতিতে পাওয়া সীসার পরমাণবিক ওজন ২০৭ কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া সীসার ওজন ২১০, ২১১, ২১২ এমন কি ২১৪ পর্য্যন্ত হ'তে পারে। পরমাণবিক ওজন বিভিন্ন হ'লেও দেখা যায় পদার্থের মৌলিকত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। এই বিভিন্ন ওজনের সীসা সব ক'টিই রাসায়নিক গুণে একরকম। কেন্দ্র পদার্থের পরমাণবিক ওজন স্থির না থাকতে পারে কিন্তু পরমাণু মাত্রেই পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা অর্থাৎ পরমাণবিক সংখ্যার তিলমাত্র পরিবর্তিত হয় না। পরমাণবিক সংখ্যার এই অপরিবর্তনশীলতা দেখে একথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায় যে কোন মৌলিক-পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে পরমাণু ওজনের ওপর নয়, পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যার ওপর। মৌলিকপদার্থ রেডিয়ামের পরমাণবিক ওজন হ'তে পারে ২২৬, ২২৩, ২২৪ বা ২২৮, কিন্তু এই চারটি পরমাণবিক ওজনের রেডিয়ামের বেলায়ই পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা থাকবে ৮৮।

সমঘর (Isotope)

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে একাধারে পদার্থের মৌলিক উপাদানের এবং পদার্থ-পরমাণু-মহলের ও পরমাণু-কেন্দ্রের সংগঠনের অনেক সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল একই মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজন বিভিন্ন হ'তে পারে কিন্তু পরমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ পরমাণুকেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুতের সংখ্যা থাকে চিরস্থির। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের পদার্থগুলির একটি বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হ'ল সমঘর (Isotope)। অর্থাৎ পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হ'লেও যেহেতু মূলে এরা একই মৌলিক পদার্থ

তাই এদের প্রত্যেকের স্থান মেণ্ডেলিফের তালিকার একই ঘরে হবে। তেজস্ক্রিয় মৌলিকপদার্থ রেডিয়াম বি (২২৪), রেডিয়াম ডি (২১০), য়ুরেনাম সীসা (২০৬), থোরিয়াম সীসা (২০৮), এ্যাকটিনিয়াম সীসা (২০৭), রেডিয়াম সীসা (২১০), এ্যাকটিনিয়াম বি (২১১), থোরিয়াম বি (২১২)—এই সমস্ত পদার্থগুলি একই মৌলিক পদার্থ সীসার সমঘর পদার্থ। এরা পরমাণবিক ওজনে পরস্পর থেকে পৃথক বটে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের পরমাণুকেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ৮২টি। সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া অতেজস্ক্রিয় সীসার সংগে এদের কোন পার্থক্য নেই।

পরমাণবিক ওজনে পৃথক হ'য়েও বিভিন্ন 'সমঘর' পদার্থেরা মূলে একই মৌলিক পদার্থ হ'তে পারে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের বেলায় মৌলিক পদার্থের এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জাগল. তা'হলে প্রকৃতিতে যে সমস্ত মৌলিকপদার্থ পাওয়া যায় তারাও কি বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের সমঘরের মিশাল পদার্থ? ১১৮·৭ পরমাণবিক ওজনের মৌলিকপদার্থ টিনের ওজন কি বিভিন্ন ওজনের সমঘর পদার্থের গড়পড়তা ওজনমাত্র? টিনের পরমাণবিক ওজন ১১৮·৭, কিন্তু প্রথম যখন টিনের পরমাণবিক ওজন স্থির করা হয়েছিল, বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের এগারটি 'সমঘর' পদার্থের টিন এক সংগে ছিল মিশে। ফলে এই এগারটি মিশালের গড় হিসাবেই পাওয়া গিয়েছিল টিনের ২০০·৬ পরমাণবিক সংখ্যা। বিজ্ঞানী টমসন প্রথম আবিষ্কার করেন উদাসী গ্যাস নিয়ন তিনটি বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের সমঘর মিশাল। তিনি এই তিনটি পদার্থকে পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে তাদের পরমাণবিক ওজন বের ক'রে দেখান যে স্বাভাবিক নিয়নের ওজন নিলে যে ২০·২ মেলে তা ২০, ২১, ২২ ওজনের তিনটি সমঘর পরমাণুর গড় হিসাব মাত্র। এরপর বিজ্ঞানী এ্যাসটনও আবিষ্কার করেন যে স্বাভাবিক ৩৫·৫ ওজনের ক্লোরিণের ৩৫ ও ৩৭ ওজনের দুইটি সমঘর ক্লোরিণের মিশালের গড় হিসাব মাত্র।

কোন পদার্থের 'সমঘর' পদার্থগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা একরকম দুষ্কর কাজ। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৌলিক পদার্থগুলিকে যৌগিক পদার্থ বা মিশাল পদার্থ থেকে পৃথক করা সম্ভব কিন্তু রাসায়নিক উপায়ে 'সমঘর' পদার্থদের পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। কারণ সমঘর পদার্থ একমাত্র ওজনে পরস্পর থেকে আলাদা বটে কিন্তু আর সমস্ত প্রকার প্রকৃতি ও গুণে

হুবহু এক প্রকার। তাই ওজনের পার্থক্যের উপর নির্ভর ক'রেই এই সব সমঘর পদার্থগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা হয়। বিভিন্ন ওজনের গ্যাসীয় পদার্থগুলিকে যদি কোন ঝাঁঝরা পাত্রে রাখা যায়, তবে দেখা যায় গ্যাসগুলি ঝাঁঝরা পাত্রের ছিদ্র দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার সময় ওজন অনুযায়ী পরস্পর থেকে ছাড়া ছাড়া হয়ে আলাদা হয়ে যায়। তেমনি বিভিন্ন ওজনের কয়েকটি তরল পদার্থকে খুব ঠাণ্ডা ক'রে অথবা তরল পদার্থের ওপরের বাতাসের চাপ কমিয়ে দিয়ে এই মিশাল পদার্থগুলিকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যায় সব চেয়ে যে পদার্থটি হালকা, সে পদার্থটি বাকী কয়টি পদার্থের চেয়ে দ্রুতবেগে এবং আগে আগে বাষ্প হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনি ভাবে কম হালকা পদার্থগুলি ভারী পদার্থ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়। এই উপায়ের ওপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমঘর পদার্থের আবিষ্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল এতকালের পরিচিত মৌলিক পদার্থগুলি বিশুদ্ধ এবং একহারা নয়, বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের সমঘর পদার্থের মিশাল মাত্র। সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, আইডিন ইত্যাদির মত একুশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া আর বাকী সমস্ত মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সমঘর পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌলিক পদার্থ টিনের বেলায় প্রায় এগারটি সমঘর পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। চারহাজার গ্রাম স্বাভাবিক হাইড্রোজেনে একগ্রাম পরিমাণ সমঘর ওজনের হাইড্রোজেন পাওয়া যায় যার ওজন ২। মৌলিক পদার্থ কারবনের শতকরা ৯৯ ভাগের পরমাণবিক ওজন ১২, মাত্র একভাগের ওজন ১৩। মৌলিক পদার্থ লিথিয়ামের গড়পড়তা পরমাণবিক ওজন ৬'৯ কিন্তু প্রকৃতিতে যে লিথিয়াম পাওয়া যায় তার শতকরা ৯২ ভাগের ওজন হ'ল ৭ আর আটভাগের ওজন হ'ল ৬। নীচে কয়েকটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সমঘর পদার্থের পরমাণবিক ওজন হিসাব দেওয়া হ'ল—

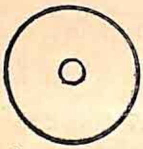
	পরমাণবিক সংখ্যা	পরমাণবিক ওজন
হাইড্রোজেন—(H)	১	১, ২, ৩
অক্সিজেন—(O)	৮	১৬, ১৮, ১৭
রূপা—(Ag)	৪৭	১০৭, ১১০, ১০৯
টিন—(Sn)	৫০	১২০, ১১৮, ১১৬, ১১৯, ১১৭, ১২৪ ১২২, ১২১, ১১২, ১১৪, ১১৫
পারদ—(Hg)	৮০	২০২, ২০০, ১৯৯, ২০১, ১৯৮, ২০৪, ১৯৬
য়ুরেনাম—(U)	৯২	২৩৪, ২৩৮, ২৩৫

সাংকেতিক পরিচিতি

হাইড্রোজেন = H
প্রোটন = ○
নিউট্রন = ◍

সমঘর পদার্থে নিউট্রন যুক্ত হওয়ার ফলে পদার্থের ওজন বাড়ে কিন্তু পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা একই থাকে

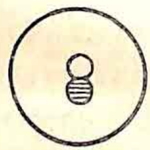
(ক) হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র



${}_{১}H^{১}$ (৯৯:৯৮ %)

কেন্দ্রে পরমাণু একটি এবং পরমাণু সংখ্যাও এক

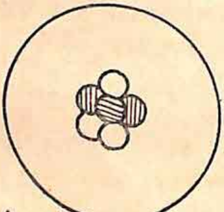
সমঘর হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্র



${}_{১}H^{২}$ (·০২ %)

পরমাণু সংখ্যা এক কিন্তু কেন্দ্রে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন রয়েছে

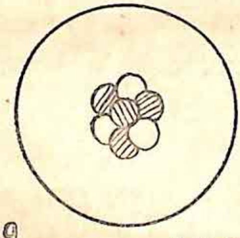
(খ) লিথিয়াম পরমাণুকেন্দ্র



${}_{৩}Li^{৬}$ (৮ %)

লিথিয়ামের পরমাণু সংখ্যা ৩ এবং কেন্দ্রে রয়েছে ৩টি প্রোটন ও ৩টি নিউট্রন

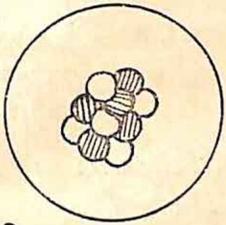
সমঘর লিথিয়াম পরমাণুকেন্দ্র



${}_{৩}Li^{৭}$ (৯২ %)

লিথিয়ামের পরমাণু সংখ্যা ৩ই রয়েছে কিন্তু কেন্দ্রে ৩টি প্রোটনের সংগে ১টি নিউট্রন বেড়ে গিয়ে ৪টি নিউট্রন হয়েছে

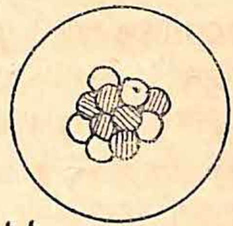
(গ) বোরন কেন্দ্র



$_{৫}B^{১০}$ (১৪ %)

কেন্দ্রে ৫টি প্রোটন ৫টি নিউট্রন রয়েছে
পরমাণু সংখ্যা ৫

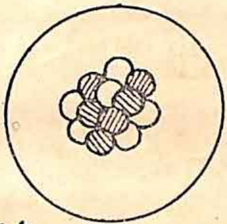
বোরন সমঘর কেন্দ্র



$_{৫}B^{১১}$ (৮২ %)

কেন্দ্রে ৫টি প্রোটন, ৬টি নিউট্রন
পরমাণু সংখ্যা ৫

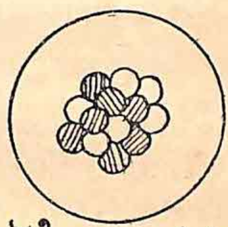
(ঘ) কারবন



$_{৬}C^{১২}$ (৯৭ %)

কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন পরমাণু সংখ্যা ৬

কারবন সমঘর



$_{৬}C^{১৩}$ (১ %)

কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রন,
কিন্তু পরমাণু সংখ্যা ৬

মৌলিক পদার্থের সমঘর আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন জানা গেল মৌলিক পদার্থগুলি বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের মিশাল মাত্র অপর দিকে নির্ভুল ভাবে জানা গেল কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজনের কোন স্থিরতা নেই। তাই পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে পরমাণবিক ওজনের ওপর নয়, পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যার ওপরে বা পদার্থের কেন্দ্রীয় চার্জের ওপর।

সমভর (Isobar)

একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণবিক ওজন হওয়া যদি সম্ভব হয় তাহ'লে একই পরমাণবিক ওজনের বিভিন্ন পরমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ পরমাণুকেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা বিভিন্ন হওয়া কি সম্ভব নয়? হ্যাঁ সম্ভব, কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রের চার্জ এক না হ'লে, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণবিক ওজন এক হ'লেও পদার্থগুলি মৌলিক পদার্থরূপে এক হবে না। চূণ ও উদাসী গ্যাস আরগণের পরমাণবিক ওজন ৪০, কিন্তু যেহেতু চূণের পরমাণুকেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ২০ এবং আরগণের ১৮, তাই এক পরমাণবিক ওজনের হয়েও চূণ ও আরগণের মৌলিক গুণ ও স্বভাব এক রকম নয় এবং এজন্যে এক ওজনের হলেও চূণ ও আরগণ আলাদা আলাদা দুটি মৌলিক পদার্থ।...তেমনি মৌলিকপদার্থ ক্যাডমিয়াম, ইণ্ডিয়াম ও টিনের একটি সমঘর পদার্থের পরমাণবিক ওজন ১১৫। কিন্তু ক্যাডমিয়ামের পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ৪৮, ইণ্ডিয়ামের ৪৯ এবং টিনের ৫০ হওয়ায় এরা এক পরমাণবিক ওজনের পদার্থ হয়েও গুণে ও স্বভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

$$\left[\left(\mathrm{Cd}^{১১৫}_{৪৮}\right)\ ;\ \left(\mathrm{In}^{১১৫}_{৪৯}\right)\ ;\ \left(\mathrm{Sn}^{১১৫}_{৫০}\right)\right.$$

অর্থাৎ ক্যাডমিয়ামের পরমাণবিক ওজন ১১৫ কিন্তু পরমাণু সংখ্যা ৪৮, তেমনি ইণ্ডিয়ামের পরমাণবিক ওজন ১১৫ কিন্তু সংখ্যা ৪৯, এবং টিনের ওজন ১১৫, কিন্তু সংখ্যা ৫০]

নিউট্রন

মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজন এবং প্রোটনের সংখ্যা এক নয় এবং একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণবিক ওজন হ'তে পারে।—এই ঘটনা দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র শুধুমাত্র প্রোটন দিয়ে গঠিত নয়। পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে এমন কোন পদার্থ রয়েছে যাদের প্রোটনের মত বৈদ্যুতিক গুণ নেই কিন্তু ওজন আছে। অনেক সন্ধানের পর পরমাণুকেন্দ্রের এই অজ্ঞাত মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সাডউইকের গবেষণা থেকে।

প্রকৃতিতে পাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা নিজেদের পরমাণুকেন্দ্র থেকে আলফা এবং বিটারশ্মি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হ'তে পারে।

কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলিকেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় কিনা তার উপায় নিয়ে যখন পরীক্ষা চলছিল, এবং নাইট্রোজেনকে বোরনে এবং বেরিলিয়ামকে কারবনে রূপান্তরিত ক'রে বিজ্ঞানীদের এ প্রচেষ্টা যখন কিছুটা সফল হয়েছিল, তখন বেরিলিয়ামের বেলায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া আলফারশ্মি দিয়ে মৌলিক বেরিলিয়ামকে আঘাত করলে দেখা যায় বেরিলিয়াম থেকে একপ্রকার অজ্ঞাত কণার জন্ম হয়। এই অজ্ঞাত কণাগুলিকে যদি হাইড্রোজেনযুক্ত কোন পদার্থের উপরে এসে সজোরে আঘাত করতে দেওয়া যায় তবে সে পদার্থ থেকে প্রোটনের সৃষ্টি হয়।

আলফারশ্মির মার খেয়ে বেরিলিয়াম থেকে যে সব অজ্ঞাত কণাগুলি ছুটে বের হ'ল এরা কি? এই অজ্ঞাত রশ্মিগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ছুটতে পারে প্রায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে। এরা বিদ্যুৎগুণসম্পন্ন আলফা বা বিটারশ্মির মত জলীয় বাষ্পের মধ্য দিয়ে ছুটবার সময় বাষ্পকণাগুলিকে জলকণায় জমাতে পারে না, কিন্তু প্রোটনের তুলনায় বাতাস বা অন্য পদার্থ ভেদ ক'রে ছোটবার ক্ষমতা এদের অনেক বেশি। প্রোটন মাত্র বার ইঞ্চি বাতাসের স্তর ভেদ ক'রে যেতে পারে, কিন্তু এই অজ্ঞাত কণাগুলি অনায়াসে বেশ কয়েক মাইল বাতাস ভেদ ক'রে ছুটে যেতে পারে। এ ছাড়া এই অজ্ঞাত কণাগুলির কোন বিদ্যুৎগুণ নেই অথচ ওজনে এরা প্রোটনের সমান। প্রথম বেরিলিয়াম থেকে পাওয়া এই নতুন রশ্মিগুলিকে গামারশ্মি ব'লে ভুল করা হয়েছিল। পরে এই রশ্মিগুলির এরূপ নানাপ্রকারের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব দেখে নির্ভুল ভাবে স্থির করা হয় যে এরা পরমাণুকেন্দ্রের সেই অজ্ঞাত পদার্থ এবং এরাই প্রোটনের সংগে মিলে পদার্থের পরমাণবিক ওজন গ'ড়ে তুলছে। পরমাণুকেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনের এই জাতভাইয়ের নাম দেওয়া হ'ল নিউট্রন অর্থাৎ বিদ্যুৎগুণ-নিরপেক্ষ। নিউট্রন বিদ্যুৎগুণ-শূন্য এবং ওজনে প্রোটনের সমান কিন্তু আকারে অনেকাংশে ক্ষুদ্রতর। নিউট্রন জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়ে ছোটবার সময় বাষ্পকণাগুলিকে জলে জমাতে পারেনা ব'লে আলফা, বিটা বা প্রোটনের চলার পথের ফটোর মত এদের চলার পথের ফোটো তোলা যায় না। তাই হাতেকলমে এদের উপস্থিতির সন্ধান জানাও মুস্কিল। কিন্তু নিউট্রন যদি চলার পথে কোন ইলেকট্রনকে আঘাত করে তবে ইলেকট্রনটি নতুন বেগে ছুটতে আরম্ভ করে এবং বাষ্পকণাকে সহজেই জমিয়ে ফেলতে পারে জলকণায়। নিউট্রনের কাছে ধাক্কা খাওয়া এই ইলেকট্রনগুলির ছোট্ট একটু জল-জমান চলার পথের ফটোর বিশিষ্ট

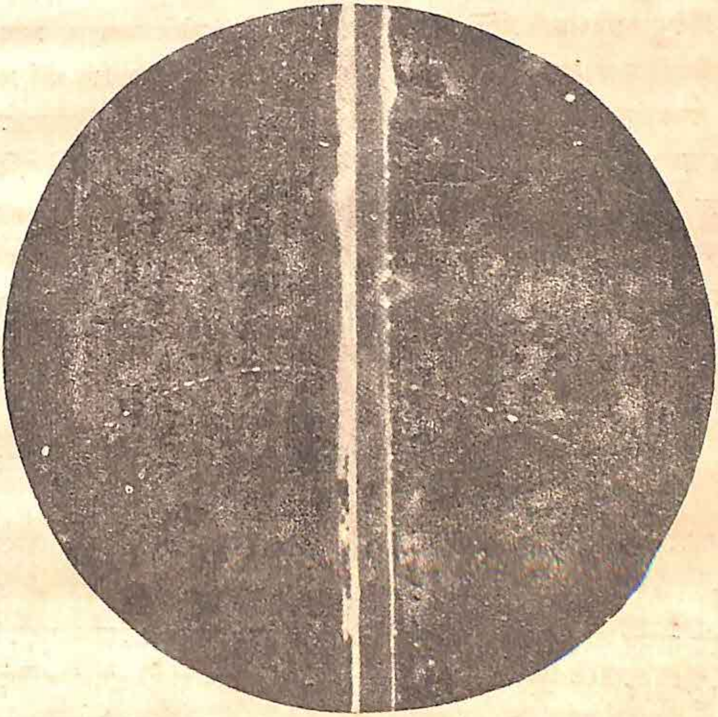
ধরণ দেখে সহজেই বলে দেওয়া যায় নিউট্রনের উপস্থিতির কথা। এমনিভাবে ইলেকট্রন নিউট্রনের হাতে মার খেয়ে নিউট্রনের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। কেন্দ্র থেকে নিউট্রনকে ছুটিয়ে আনতে হ'লে বেরিলিয়ামের পরমাণু সব চেয়ে উপযুক্ত পদার্থ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়াম থেকে পাওয়া আলফা রশ্মিকণা দিয়ে বেরিলিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে প্রতি দশলক্ষ আলফাকণার মার খেয়ে বেরিলিয়াম মাত্র তিরিশটি ক'রে নিউট্রন ছেড়ে দেয় পরমাণুকেন্দ্র থেকে।

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ওজন নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা মিটে গেল। জানা গেল পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংগে রয়েছে নিউট্রন। একই পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যা বেশি কম হ'তে পারে কিন্তু তাতে পদার্থের মৌলিকত্বের কোন হানি হয় না এবং এজন্যে একই মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের সমঘর পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতিতে পাওয়া হাইড্রোজেন পরমাণবিক ওজনে তিন রকমের হ'তে পারে—এক, দুই, তিন। যে হাইড্রোজেনের পরমাণবিক ওজন এক তার পরমাণুকেন্দ্রে আছে একটি মাত্র প্রোটন, যার ওজন দুই সেই সমঘর হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন এবং তিন ওজনের হাইড্রোজেন পরমাণুকেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। অবশ্য প্রকৃতিতে পাওয়া হাইড্রোজেনের শতকরা ৯৯-৯৮ ভাগই এক পরমাণবিক ওজনের হাইড্রোজেন। টিনের পরমাণবিক ওজন এগার রকমের হ'তে পারে কিন্তু টিনের প্রত্যেকটি সমঘর পদার্থের পরমাণুতে রয়েছে ৫০টি প্রোটন, এবং এই ৫০টি প্রোটনের সংগে ৭০, ৬৮, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭৪, ৭২, ৭১, ৬২, ৬৪ বা ৬৫টি নিউট্রন মিলে বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের সমঘর টিনের এগারটি পরমাণু গ'ড়ে ওঠে। সব চেয়ে ভারী পদার্থ য়ুরেনামের পরমাণুতে আছে ৯২টি প্রোটন, কিন্তু য়ুরেনামের সমঘরে দুটি ওজন অনুযায়ী নিউট্রনের সংখ্যা ১৪৬ হ'তে পারে, ১৪২ও হ'তে পারে।

পজিট্রন

পৃথিবীর জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে এবং পাহাড়ে গহ্বরে এক প্রকার আলোকরশ্মির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কোথা থেকে সে রশ্মির সৃষ্টি এবং কোথা থেকে এ রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে তা' বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন না

এখনও। এ রশ্মি বিশ্বে সমস্ত জায়গায় ব্যাপ্ত ব'লে এর নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্ব রশ্মি বা কসমিক রশ্মি। বাষ্পীয় কণাভরা চেম্বারের ভিতর দিয়ে কসমিক রশ্মিকে কোন পদার্থের গায়ে আঘাত করতে দিলে দেখা যায় আহত পদার্থটির গা থেকে নানাপ্রকার পদার্থকণা বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিজ্ঞানী এণ্ডারসন আবিষ্কার করলেন এই বিচ্ছুরিত রশ্মিকণাগুলির মধ্যে ইলেকট্রন কণার সঙ্গে একরকম অজ্ঞাত নতুন বিদ্যুৎকণাও পাওয়া যায়। এই



পজিট্রনের ফটো—উপর থেকে নিচে যে সূক্ষ্ম রেখাটি দেখা যায় তাই পজিট্রনের পথরেখা

বিদ্যুৎকণাগুলি ওজনে ইলেকট্রনের ন্যায় কিন্তু বৈদ্যুতিক জোরে অর্থাৎ চার্জে ইলেকট্রনের সমান এবং বিপরীত। ইলেকট্রনে আছে একরেণু নেগেটিভ বিদ্যুৎ কিন্তু এই অজ্ঞাত নতুন কণায় রয়েছে এক রেণু পজিটিভ বিদ্যুৎ। এই নতুন পজিটিভ বিদ্যুৎকণা প্রোটনের চেয়ে ১৮৫৫ গুণ হালকা—অর্থাৎ ইলেকট্রনের সমান। এই নতুন বিদ্যুৎকণার নাম দেওয়া হ'লো পজিট্রন। কোন পদার্থ থেকে যখন পজিট্রনের সৃষ্টি হয় তখন পজিট্রন কণাগুলি যেন

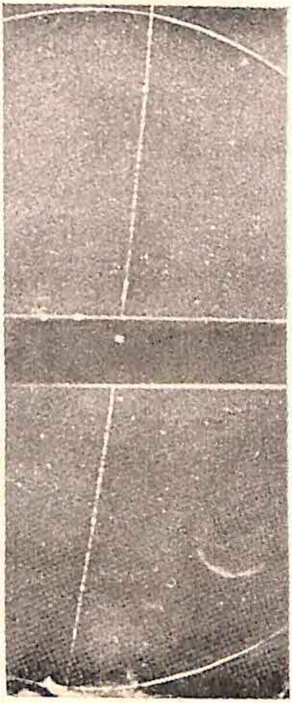
তুবড়ির অগ্নিকণার মত একটা মুখ থেকে ঝর্ণার মত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পজিট্রনের এরূপ ঝর্ণাধারায় ছড়িয়ে পড়ার ভাব দেখে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যে-পদার্থ থেকে পজিট্রনের জন্ম সে পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রে কসমিক রশ্মির আঘাতে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়, এবং এই বিস্ফোরণের ফলে পজিট্রনগুলি দুর্দান্তবেগে এমনি ঝর্ণাধারায় ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। অধুনা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়াম সি থেকে পাওয়া গামা রশ্মি দিয়ে সীসাকে আঘাত ক'রেও পজিট্রনের কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আরো পরে দেখা যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়াম থেকে পাওয়া আলফা রশ্মি মৌলিক পদার্থ বোরন, ম্যাগনেসিয়াম ও এ্যালুমিনিয়মের গায় আঘাত ক'রলে, এসব পদার্থকে ক্ষণিকের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং এইসব ক্ষণিকের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত পদার্থগুলি পরমাণুকেন্দ্র হ'তে পজিট্রন বিচ্ছুরিত করতে থাকে। এই পদার্থগুলি ছাড়া অন্যান্য রূপান্তরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও পজিট্রন পাওয়া যায়। পজিট্রন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এখনো বিজ্ঞানীদের দখলে আসেনি, এখনো পজিট্রনের পূর্ণ পরিচয় জানবার প্রয়াসে বিজ্ঞানী মহলে গবেষণা চলছে।

মেসন বা মেসোট্রন
(Meson or Mesotron)

পদার্থের সংগঠনে সম্প্রতি আর একটি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মৌলিক উপাদানটি আবিষ্কার করার আগেই বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্বে সন্দেহ করেছিলেন। প্রোটন এবং নিউট্রন মিলে প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রকে গঠন করে। কিন্তু নিউট্রন ও প্রোটন এমন প্রবল শক্তিতে পরস্পরকে জড়িয়ে রাখে কি ক'রে? এ সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করেছেন যে মেসন নামে কোন অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থ প্রোটন ও নিউট্রনকে পরমাণুকেন্দ্রে একত্র বেঁধে রাখে। কিছুদিনের মধ্যেই মেসন নামক এক মৌলিক পদার্থও আবিষ্কৃত হয়। এই একই পদার্থের নাম ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন মেসন এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা মেসোট্রন।

কসমিক রশ্মিতে পজিটিভ-চার্জ-যুক্ত প্রোটনকণা রয়েছে। আকাশ থেকে কসমিক রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় কসমিক রশ্মির প্রোটনকণা বায়ু-পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে বায়ুকণার কেন্দ্র ভেংগে

যায় এবং কয়েকরকম মেসনের জন্ম হয়। বায়ুমণ্ডলে এমনি ক'রে কসমিক রশ্মির আঘাতে যে মেসনগুলির জন্ম হয়, তার কতকগুলি আপনি বিনষ্ট হয়ে ইলেকট্রন ও নিউট্রেনোর জন্ম দেয়। নিউট্রেনো নামক খুব হালকা একপ্রকার পদার্থের কল্পনা করেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। নিউট্রেনোর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, নিউট্রেনোও বিদ্যুৎগুণ-নিরপেক্ষ। গবেষণা দ্বারা নিউট্রেনোর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। অথচ নিউট্রেনো নামক একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব আছে একথা স্বীকার না করলে গতিবেগ সংরক্ষণ নীতির (Conservation of Momentum) সামঞ্জস্য রক্ষা করা চলে না। কতক মেসন আবার বায়ু পরমাণুর সাথে ঠোকাঠুকি ক'রে আকাশে ইলেকট্রন ও আলোককণা ফোটনের ধারা বর্ষণ করে। বাকী মেসনগুলি যারা নিজেরা বিনষ্টও হয় না বা বায়ুকণার সাথে ঠোকাঠুকিও করে না তারা ভূপৃষ্ঠে এসে মাটির সাথে মিশে গিয়ে ইলেকট্রন, ফোটনের জন্ম দেয়।

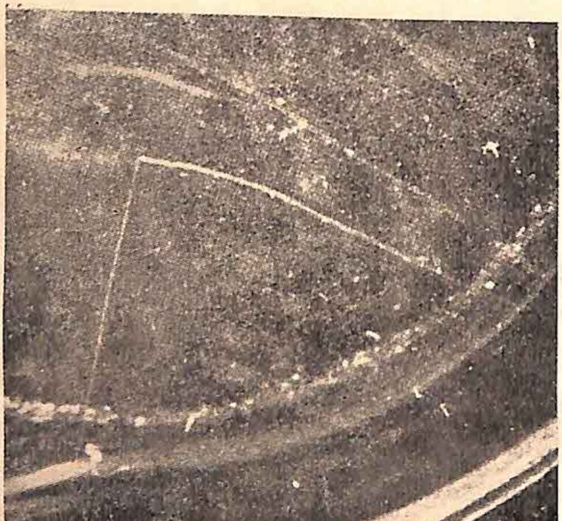


মেসনের পথরেখা

মেসন কয়েক প্রকারের হ'তে পারে। আপাততঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দুইপ্রকার মেসন প্রত্যক্ষ ভাবে ধরা পড়েছে। মেসনগুলির বিদ্যুৎগুণ পজিটিভ হ'তে পারে, নেগেটিভও হ'তে পারে। ভার বা ওজনে মেসন কণা ইলেকট্রন কণার চেয়ে ভারী কিন্তু প্রোটনকণার চেয়ে হালকা। (একটি প্রোটন ইলেকট্রনের চেয়ে ১৮০০ গুণ ভারী) মেসনগুলি ওজনেও সব এক রকম নয়। কোনটা বেশি ভারী, কোনটা কম ভারী। অপেক্ষাকৃত ভারী মেসনগুলি খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ প্রায় এক সেকেণ্ডের দশহাজার কোটী ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে ভেংগে গিয়ে সাধারণ মেসন এবং বিদ্যুৎগুণ-নিরপেক্ষ মেসনের জন্ম দেয়। সাধারণ মেসনগুলি এক সেকেণ্ডের বিশলক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে নিজেরাই ভেংগে গিয়ে

ইলেকট্রন এবং খুব সম্ভব নিউট্রেনোকণা সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ পজিটিভ মেসন ইলেকট্রন সৃষ্টি করে এবং নেগেটিভ মেসন বায়ু পরমাণু কণার বিদারণ ঘটায়। বৈজ্ঞানিকেরা আরো কয়েক প্রকার মেসন আবিষ্কারের দাবী করেছেন কিন্তু এখনও সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি।

উইলসন-মেঘচেম্বারের কথা আগে বলা হয়েছে। কসমিকরশ্মি মেঘচেম্বার দিয়ে যাবার সময় যে জলকণা জমিয়ে দেয় তার ফটো তুলে ফটোতে পাওয়া রশ্মিকণার যাত্রাপথের গুণাগুণ বিচার ক'রে মেসনের অস্তিত্ব প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেন। পরে কৃত্রিম উপায়েও মেসন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। রাসায়নিক রশ্মির সাহায্য না নিয়ে সাইক্লোট্রন দ্বারা (পরের অধ্যায়ে সাইক্লোট্রন যন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে) পদার্থ পরমাণু ভেংগে দিয়ে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক গার্ডনার ও লাটি কৃত্রিম উপায়ে তাদের গবেষণা ক'রে পদার্থ পরমাণু থেকে মেসন সৃষ্টি করেছেন।



মেসন কণাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কসমিক রশ্মির মধ্যে মেসন আবিষ্কার এবং কৃত্রিম উপায়ে পরমাণুকণা থেকে মেসন সৃষ্টি করার ফলে পদার্থের পরমাণু সংগঠন রহস্য সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে মেসন সৃষ্টি করা সম্ভব হ'লেও কসমিক রশ্মিতে পাওয়া মেসনের তুলনায় কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া মেসনের চলাচল শক্তি

খুব কম। পক্ষান্তরে কসমিক রশ্মিকে বৈজ্ঞানিকেরা খুশিমত ব্যবহার করবার উপায় বের করতে না পারায় মেসনের সাহায্যে পদার্থ পরমাণুকেন্দ্রের সংগঠন রহস্য জানবার কাজ সফল করা সহজসাধ্য হয়ে উঠছে না এখনও।

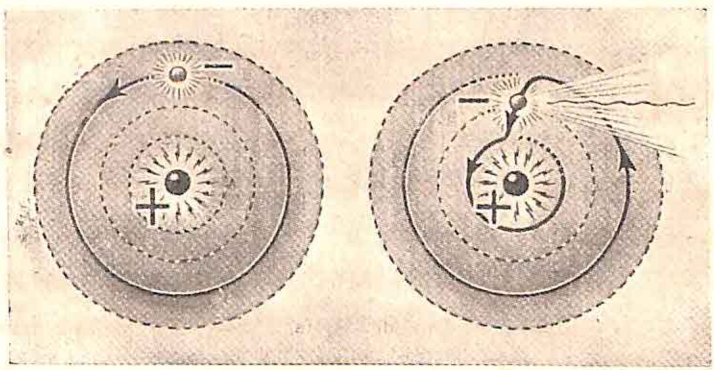
পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রের সংগঠন সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত খবর পাওয়া গেছে তা থেকে মোটামুটি বলা যায় পরমাণুকেন্দ্রের মূল সংগঠক হ'লো প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন ও মেসন। কিন্তু আজও পরমাণুকেন্দ্রের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ খবর পাওয়া যায়নি। প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন ও মেসন পরমাণু-কেন্দ্রে কি ভাবে সংগঠিত হয়ে রয়েছে? যে অসীম শক্তির ফলে পরমাণুকেন্দ্রের এইসব বিভিন্ন উপাদানের কণাগুলি পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে সেই শক্তির উৎস কোথায়? এবং কিভাবে কণাগুলি একটি ঠাসা কেন্দ্রে এই সব বিভিন্ন সংখ্যার পদার্থগুলিকে বেঁধে রেখেছে, এসবের পাকা খবর এখনো পাওয়া যায়নি। কেন যে এইসব পদার্থকণাগুলি পরমাণুকেন্দ্র থেকে অহরহ ছিটকে বেরিয়ে যায় না তার কারণ আজ পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি। ভারী মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে তেজস্ক্রিয়ার গুণ লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে মনে করেছিলেন যে পরমাণুকেন্দ্রে এইসব পদার্থকণাগুলির ভিড়ের চাপ বেড়ে যায় ব'লেই বোধ হয় পরমাণুকেন্দ্র অস্থির হ'য়ে ওঠে এবং কিছু কিছু পদার্থকণা ছিটকে দিয়ে স্থির ও শান্ত হ'বার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় ৩৯ পরমাণু ওজনের অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থ পটাসিয়াম ও ৮৭ ওজনের রুবিডিয়াম পদার্থের মধ্যে তেজস্ক্রিয়ার গুণ দেখা যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরিত রশ্মিকণার মধ্যে আলফা ও গামা রশ্মির সংগে বিটা রশ্মির অস্তিত্ব দেখে এবং পরবর্তী সময়ে পজিট্রনের সন্ধান পেয়ে বিজ্ঞানীদের মনে একটি সন্দেহ জেগেছে নিউট্রনের মৌলিকত্ব নিয়ে। নিউট্রন কি প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত? কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রে বিভিন্ন উপাদানের সম্পূর্ণ পরিচয় এবং নিউট্রনের স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা বলবার মত পরীক্ষালব্ধ পর্যাপ্ত খবর আজও বিজ্ঞানীদের হাতে এসে পৌছোয়নি। তাই পরমাণুকেন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি?

ইলেকট্রন মহল

পদার্থের পরমাণু সংগঠনে পরমাণুকেন্দ্রের পরেই ইলেকট্রন-মহলের স্থান। সূক্ষ্ম আঁটির মত পরমাণুকেন্দ্রকে ঘিরে র'য়েছে ইলেকট্রন-মহল। কিন্তু

ইলেকট্রনগুলি কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হ'য়ে ব'সে নেই, অবিরাম চক্রাকারে ঘুরছে কেন্দ্রকের চারদিকে। ইলেকট্রন এমন ভাবে কেন্দ্রকের চারদিকে অবিরাম আবর্তিত হ'চ্ছে ব'লেই পজিটিভ চার্জযুক্ত কেন্দ্রের টানে নেগেটিভ চার্জবহনকারী ইলেকট্রনগুলি ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ছে না কেন্দ্রের বুকে। অবিরাম দুরন্তবেগে কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে ব'লে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছুটে চলবার এক প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনগুলির মধ্যে, কিন্তু কেন্দ্রের টানে এই ঝোঁক ইলেকট্রনগুলিকে পরমাণু থেকে ছিঁড়ে বাইরে নিয়ে যেতে পারে না। সৌরলোকে গ্রহগুলিও সূর্যের চারদিকে অবিরাম ঘুরে ঘুরে যেমন সূর্যের বন্ধন ছিঁড়ে কক্ষ থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চায় কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড টানে সৌরলোকের বাঁধন ছিড়তে পারে না, ইলেকট্রনও তেমনি পরমাণুকেন্দ্রকের টান ছিড়ে ছুটে পালাতে পারে না। হাইড্রোজেন পরমাণুর সংগঠন পরিকল্পনা করবার সময় ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকর্ষণ-সাম্য এবং সমগ্র পরমাণুর স্থিরতা ও স্বস্তির এই কারণই দেখিয়েছিলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। কিন্তু পরে বিচার ক'রে দেখা গেল রাদারফোর্ডের বিবেচনা টেকসই নয়। কারণ অবিরাম কেন্দ্রের চারদিকে পরিক্রমণের ফলে বাইরের দিকে ছুটে পালাবার জন্য ইলেকট্রনের মধ্যে যে ঝোঁক্ দেখা যায় সে ঝোঁক্ যদি কেন্দ্রের অন্তর্মুখী টান আটকে রাখতে পারে তা'হলে ইলেকট্রন-কক্ষের পরিধির কোন মাপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ ইলেকট্রন যে বেগে কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরতে থাকে তা যদি কোন কারণে কমবেশী হয়, তা'হ'লে কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনের দূরত্বের কমবেশী হ'বে। ইলেকট্রনের এই বহির্মুখী গতি ছাড়াও আর একটি কারণ র'য়েছে যার জন্য রাদারফোর্ডের পরিকল্পনা টেকসই হ'তে পারে না। পরিক্রমণকালে ইলেকট্রনের দুরন্ত গতির ফলে অনর্গল বিদ্যুৎ-চুম্বকী-শক্তি (Electro-magnetic energy) তরংগের আকারে ছড়িয়ে পড়ে ইলেকট্রন-মহলের চার দিকে। এই বিদ্যুৎ-চুম্বকী শক্তির উৎস কোথায়? পরমাণু-অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত শক্তিই হ'ল এই ছড়িয়ে পড়া শক্তির উৎস। ক্রমাগত তাপশক্তি খরচের ফলে পরমাণুর স্থায়িত্বে এমন একটি সময় আসবে যখন ইলেকট্রন দুরন্ত বেগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন্দ্রকের বুকে। এবং মুহূর্তের মধ্যে এক ঝলক আগুনের ফুলকি দেখিয়ে পরমাণুটি চিরদিনের জন্য নিঃশেষ হ'য়ে যাবে কতগুলি বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরংগে।

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের পরস্পরের গতিসাম্য রক্ষার কারণ নির্দেশ করেন ডেনদেশীয় তরুণ বিজ্ঞানী নিল্‌স্‌বোর। তিনি সমস্যা সমাধানে ম্যাকস্ প্লাঙ্কের "কোয়াণ্টাম থিয়োরীর" সাহায্য গ্রহণ করেন। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহলের ধারণা ছিল শক্তির প্রবাহ চলে স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন গতিতে। বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক বলেন, উত্তপ্ত পদার্থ থেকে তাপরশ্মি নির্গত হয় অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত নয়, তাপের বিকাশ হয় ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে এবং রেণু রেণু শক্তিরূপে। পদার্থ কর্তৃক তাপ গৃহীত হওয়ার সময়ও এই একই নিয়ম খাটে। প্লাঙ্কের পরের গবেষণায় দেখা যায় শুধুমাত্র তাপশক্তি নয়, সমস্ত শক্তিই—কি আলোক, কি বিদ্যুৎ, কি রঞ্জন রশ্মি,—যখন কোন পদার্থ থেকে নির্গত বা পদার্থ কর্তৃক গৃহীত হয় তখন এমনি ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে রেণু রেণু রূপে শক্তির গ্রহণ বা বিচ্ছুরণ হয়। সুতরাং "কোয়াণ্টাম থিয়োরী" অনুসারে জানা যায়, শক্তি মাত্রেরই আদানপ্রদান হয় অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মত নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তিরেণু রূপে।



এক কক্ষ থেকে ইলেকট্রন অন্য কক্ষে লাফিয়ে যাবার সময় যে আলোকশক্তির বিকিরণ হয় এই চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে। (a) চিত্রে ইলেকট্রন (e) "C" কক্ষে ঘুরছে। (b) চিত্রে "C" কক্ষ থেকে "A" কক্ষে ইলেকট্রনটি লাফিয়ে যাবার সময় আলোক শক্তির বিকিরণ হচ্ছে।

নিল্‌স্‌বোর প্লাঙ্কের এই মত গ্রহণ করেন এবং হাইড্রোজেনের বর্ণালি পরীক্ষা করার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে হাইড্রোজেন বর্ণালির ছবিতে কতগুলি বিশিষ্ট রেখা দেখা যায়—সে রেখাগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় হাইড্রোজেনের অভ্যন্তরে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে বিশিষ্ট ঢঙের অর্থাৎ তরংগ দৈর্ঘ্যের আলোক তরংগ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই এইসব রেখাগুলি ধরা প'ড়েছে, হাইড্রোজেনের

বর্ণালিতে। এইভাবে হাইড্রোজেনের বর্ণালি বিচার ক'রে তিনি রাদারফোর্ডের হাইড্রোজেন পরিকল্পনার সংশোধন ক'রে এক নতুন পরিকল্পনা দিলেন।

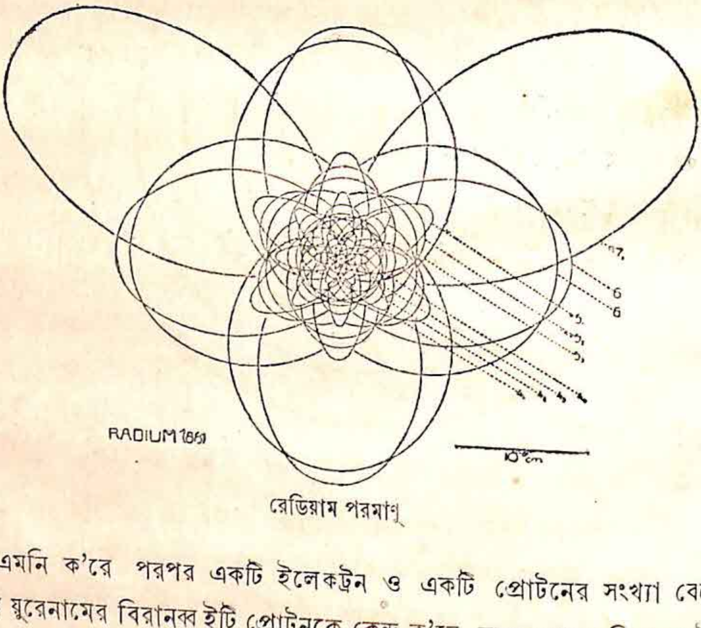
নিল্‌স্‌বোর জটিল অঙ্কের সাহায্যে দেখালেন হাইড্রোজেন পরমাণুর অভ্যন্তরে কেন্দ্রকে ঘিরে যে ইলেকট্রনটি ঘুরছে অবিরাম, কেন্দ্র থেকে সেই ইলেকট্রনটি ইচ্ছামত দূরে অবস্থান করতে পারে না। ইলেকট্রনের ঘোরবার কক্ষ একটি নয় বেশ কয়েকটি হ'তে পারে। কিন্তু তাদের সংখ্যা ও দূরত্ব নির্ভর করে ইলেকট্রনের সঞ্চিত শক্তির ওপর। কোন্ কক্ষপথে ইলেকট্রন কেন্দ্রকে পরিক্রমণ করবে তার মান নির্দিষ্ট হ'বে ইলেকট্রনের আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ দিয়ে। কিন্তু এই কক্ষগুলির পরিধি এমন হবে না যে কোন ভগ্নাংশ শক্তিরেণুর সম্বলিত (quantum of energy) ইলেকট্রন ঐ কক্ষে ঘুরতে পারে। ইলেকট্রনের কক্ষপথ যে শক্তির পরিমাপ দেবে তা হবে পুরোপুরি সংখ্যা—এক, দুই, তিন ; কিন্তু দেড়, আড়াই, পৌনে তিন, এমন কোন ভগ্নাংশ শক্তিরেণুপরিমাণের কক্ষপথ হ'তে পারবে না। হাইড্রোজেন পরমাণু যখন সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির হ'য়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন ইলেকট্রনটি ঘুরতে থাকে এক শক্তিরেণুর কক্ষে। যখনই বাইরে থেকে আলোক বা উত্তাপ রূপে শক্তি আহরণ করে সমগ্র পরমাণুটি, তখনই ইলেকট্রন লাফিয়ে লাফিয়ে এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে যেতে পারে। আবার যখন বাইরের কক্ষ থেকে ভেতরের কক্ষে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে থাকে ইলেকট্রন তখন প্রতিটি লাফের সাথে একরেণু পরিমাণ শক্তি আলোকের ঝলকরূপে বেরিয়ে যায় পরমাণু থেকে। তৃতীয় শক্তিরেণুর কক্ষ থেকে যখন ইলেকট্রন লাফিয়ে পড়ে দ্বিতীয় শক্তিরেণুর কক্ষে তখন এক ঝলক লাল আলো পরমাণু থেকে ছিটকে গিয়ে একটি রেখারূপে ধরা দেয় বর্ণালিতে। তেমনি যখন চতুর্থ শক্তিরেণুর কক্ষ থেকে দ্বিতীয় শক্তিরেণুর কক্ষে লাফিয়ে পড়ে ইলেকট্রন তখন এক ঝলক নীল আলোর রেণু বেরিয়ে যায় পরমাণু থেকে। এমনিতর ভেতর দিকে যাবার সময় বিভিন্ন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে লাফানর জন্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক তরংগ পাওয়া যায় পরমাণু থেকে। এমনিতর প্রায় তেত্রিশটি তরংগের রেখা পাওয়া গেছে হাইড্রোজেনের বর্ণালিতে। ঐ থেকে মনে হয় অন্ততঃ তেত্রিশটি বিভিন্ন শক্তিরেণুর কক্ষপথ রয়েছে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে ঘিরে। এবং অবস্থা বুঝে এর যে কোন একটিতে বিচরণ করতে পারে ইলেকট্রনটি। নিল্‌স্‌বোর শুধু যে এই বিভিন্ন কক্ষের

সম্ভাবনার কথাই বললেন তাই নয়। কোন্ কক্ষের পরিধি কত, ইলেকট্রনের বেগ কত, সেকেণ্ডে ইলেকট্রন কতবার ঘুরছে কেন্দ্রকে ঘিরে, তাও অঙ্ক ক'যে বের ক'রে দিলেন নিল্‌স্‌বোর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রথম শক্তি-রেণুর কক্ষে ইলেকট্রন কেন্দ্রের চার দিকে ঘুরছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তেরশ' (১৩০০) মাইল বেগে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ইলেকট্রন যাট হাজার কোটি বার ঘুরছে কেন্দ্রকের চারদিকে। প্রথম শক্তিরেণু কক্ষের ব্যাসার্ধ হ'ল এক মিলিমিটারের (২৫ মিলিমিটার = এক ইঞ্চি) দশ লক্ষ ভাগের কুড়িভাগ মাত্র। অন্যান্য কক্ষগুলির ব্যাসার্ধ অংক ক'রে বের করা খুব সহজ। যে কক্ষের ব্যাসার্ধ বের করার প্রয়োজন সে কক্ষে শক্তিরেণুর সংখ্যাবর্গ দিয়ে এক প্রথম কক্ষের ব্যাসার্ধকে গুণ করলেই পাওয়া যায় এবং চতুর্থ কক্ষের ব্যাসার্ধ হবে প্রথমকক্ষের ষোল গুণ বেশি। এমন যদি হয়, বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে ক'রে ইলেকট্রন কক্ষটি কেন্দ্র থেকে এতো দূরে চলে যায় যে আর আটকে রাখতে সক্ষম নয় ইলেকট্রনটি তা'হলে কেন্দ্রের বাঁধন ছিঁড়ে চ'লে যাবে পরমাণু থেকে। ইলেকট্রন-হারা পরমাণুতে থাকবে মাত্র একক প্রোটন, আর প্রোটনের পজিটিভ বৈদ্যুতিক চার্জ। ইলেকট্রন ছাড়া পরমাণুর মধ্যে যখন এমন এক রেণু বাড়তি বৈদ্যুতিক চার্জের লক্ষণ টের পাওয়া যায় তখন পরমাণুর একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া হয় 'আয়ন'।

হাইড্রোজেনের পরই আসে হিলিয়ামের পরমাণবিক সংগঠনের কথা। হিলিয়ামে আছে দুটি প্রোটন, দুটি নিউট্রন ও দুটি ইলেকট্রন। হিলিয়ামের ইলেকট্রন মহলের বিস্তৃতি ও কক্ষপথ নির্ধারণ করতে গিয়ে নির্ল্‌স্‌বোর দেখলেন তাঁর বিচারে যেন কিছুটা গরমিল রয়েছে। এই গরমিল দূর করতে গিয়ে পরমাণুর সংগঠনে এক নতুন গতির সন্ধান পেলেন। তিনি দেখালেন কেন্দ্রকে ঘিরে ইলেকট্রন ঘুরছে বটে, কিন্তু কেন্দ্রও স্থির থাকছেনা—কেন্দ্রও ঘুরছে। ইলেকট্রন কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে। আবার ইলেকট্রন ও কেন্দ্র উভয়েই পরস্পরের ওজনের সমন্বয় অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে অবিরাম। যেমন চন্দ্র পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে আবার চন্দ্র এবং পৃথিবী উভয়েই সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে অবিরাম। নিল্‌স্‌বোরের সিদ্ধান্তে আর একটু যোগ করেন বিজ্ঞানী সোমারফিল্ড। তিনি অংকের সাহায্যে দেখিয়ে দেন যে ইলেকট্রনের কক্ষপথ গোলাকার নয়, ডিম্বাকার। যেমন নিউটন প্রথম বলেছিলেন গ্রহগুলি গোলাকার কক্ষপথে ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে কিন্তু

কেপলার পরে নিউটনের বিচার সংশোধন ক'রে দেখিয়েছেন গোলাকার নয়, ডিম্বাকার কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে গ্রহগুলি। তেমনি সোমারফিল্ডও নিল্‌স্‌বোরের বিচারে কিঞ্চিৎ সংশোধন করেন। প্রথমে সোমারফিল্ডের সংশোধন সম্বন্ধে সংশয় ছিল বিজ্ঞানীদের, কারণ ইলেকট্রনের কক্ষ যদি হয় ডিম্বাকার তা'হলে হাইড্রোজেনের বর্ণালিতে ইলেকট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে লাফানর যে রেখা পাওয়া যায় সে রেখাগুলি এক একটি নিরালা সরলরেখা হবে না, হবে কয়েকটি রেখার গোছার সমষ্টি, কারণ বৃত্তের ব্যাসার্ধ হ'ল একটি কিন্তু ডিম্বাকার চক্রের ব্যাসার্ধ হ'ল দু'টি।

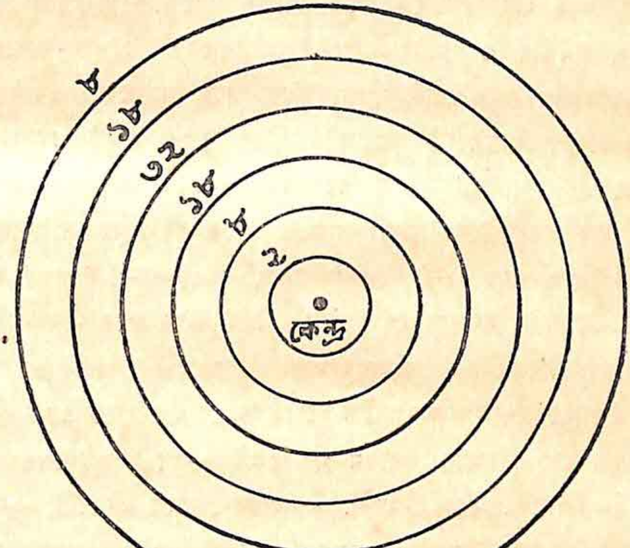
প্রথমে এরূপ এক একটি সরলরেখার মধ্যে গোছা গোছা সরলরেখার সন্ধান পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরে যখন নতুন আবিষ্কৃত পন্থায় হাইড্রোজেন বর্ণালির সরলরেখাগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় তখন দেখা যায় সত্যি এক একটি তথাকথিত সরলরেখা চারটি গায়ে গায়ে লাগা সরলরেখার গোছা মাত্র। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত সোমারফিল্ডের সিদ্ধান্তই সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'ল।



রেডিয়াম পরমাণু

এমনি ক'রে পরপর একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে য়ুরেনামের বিরানব্বুইটি প্রোটনকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে থাকে বিরানব্বুইটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে কক্ষপথের সংখ্যা ও গড়নও ক্রমশঃ জটিল হ'তে জটিলতর হ'তে থাকে। তাই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মত হালকা পরমাণু ছাড়া বাকী বিভিন্ন পদার্থের ইলেকট্রন-মহলের

সংগঠনের সংবাদ এখনো বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি এবং নির্ভুল ভাবে জানতে পারে নি, যেমন পারেনি এখনো পদার্থ পরমাণুর কেন্দ্রকের সম্পূর্ণ খবর করায়ত্ত করতে। শুধুমাত্র এইটুকু বলা যায় যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই কেন্দ্রের কাছের ইলেকট্রন কক্ষগুলির পরিধি সঙ্কুচিত হ'তে থাকে এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে ইলেকট্রনের কক্ষচক্রগুলি বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন কক্ষ নিয়ে এক একটি স্থনির্দিষ্ট সংখ্যার খোলরূপে (shell) সংগঠিত হ'তে থাকে। য়ুরেনাম পর্যন্ত গিয়ে এমনি ভাবে ইলেকট্রনগুলি ছয়টি বিভিন্ন সংখ্যার খোলে সংগঠিত হ'য়ে য়ুরেনাম পরমাণুকে গ'ড়ে তোলে।



নিল্‌স্‌বোরের ইলেকট্রন খোল

ইলেকট্রন মহলের সমস্ত ইলেকট্রনকেই কেন্দ্রক সমান জোরে টেনে রাখতে পারে না, কেন্দ্রের কাছের ইলেকট্রনের ওপরে আকর্ষণের জোর বেশি এবং যতই ইলেকট্রনগুলি বাইরের দিকে স'রে যেতে থাকে ততই ইলেকট্রনের ওপর কেন্দ্রের জোরও কমতে থাকে। রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষায় দেখা যায় একটি ওপরে আর একটি নীচে এমনিতর পর পর কক্ষের পথে পরিক্রমণ না ক'রে ইলেকট্রনগুলি দলে দলে ঘোরে, কেন্দ্রের চারিদিকে। এক একটি ইলেকট্রনদলের কক্ষপথের

নাম দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রন খোল বা সেল; পরমাণু মহলের সুস্থিরতার জন্যও ইলেকট্রনগুলি এমন বিভিন্ন খোলের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন— যতই পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে ততই খোলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কেন্দ্রকে ঘিরে হিলিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন মহলে যেই ছুটি ইলেকট্রন হ'ল অমনি এই ছুটি ইলেকট্রন নিয়ে গ'ড়ে উঠল প্রথম খোল এবং এই প্রথম খোলে যে ইলেকট্রনের দল গ'ড়ে উঠল তার সংখ্যা ছুটির বেশি হবে না কখনও। প্রথম খোল গঠনের পর দ্বিতীয় খোলে ইলেকট্রন দলে থাকতে পারে সবচেয়ে বেশি হ'লে আটটি। তৃতীয় খোলেরও ইলেকট্রন দলের সর্বাধিক সংখ্যা আটটি। কিন্তু এর পরে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি আরো বেড়ে যায় তা'হ'লে চতুর্থ খোলটি গ'ড়ে ওঠে তৃতীয় খোলের বাইরে নয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খোলের মাঝখানে। এই চতুর্থ খোলের ইলেকট্রন দলে সব চেয়ে বেশি সংখ্যা হ'তে পারে আঠারো; এমনি ক'রে সব চেয়ে বেশি আঠারোটি ইলেকট্রন নিয়ে আরও একটি খোল গ'ড়ে উঠতে পারে ৮ সংখ্যার খোল এবং ১৮ সংখ্যার খোলের মাঝখানে। এর পরেও যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে পরমাণুতে তা'হ'লে বড় খোল গ'ড়ে উঠতে পারে ৩২-টি ইলেকট্রন নিয়ে। এই ৩২-টি ইলেকট্রনের বড় খোলটি ১৮-ইলেকট্রন সংখ্যার খোলছু'টিকে ফাঁক ক'রে তার মাঝখানে এসে নিজের জায়গা ক'রে নেয়। পরমাণুর মধ্যে কি ভাবে এই সব বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন দল নিয়ে খোলগুলি সংগঠিত হয়েছে তা বোঝবার জন্য একটি কল্পনার আশ্রয় নেয়া যাক্। মনে করা যাক্, একটি ৬-নম্বরী ফুটবলের ভেতর ৫-নম্বরী, ৫-নম্বরীর ভেতরে ৪-নম্বরী, ৪-নম্বরীর-ভেতরে ৩-নম্বরী, ৩-নম্বরীর ভেতরে ২ নম্বরী এবং ছু' নম্বরীর ভেতর এক নম্বরী এবং এক নম্বরীর ভেতরে একটি মার্বেল পর পর ভরা হ'ল; অর্থাৎ পেঁয়াজের খোলসের মত একটি ফুটবলের ভেতরে আরো পাঁচটি ফুটবল ভ'রে রাখলে এক একটি ফুটবলের 'কভারকে' কল্পনা করা যায় এক একটি ইলেকট্রন খোলরূপে এবং মার্বেলটিকে কল্পনা করা যায় পরমাণুকেন্দ্র রূপে। একনম্বর ফুটবল হ'ল প্রথম খোল এবং কভারের ওপরে থাকতে পারবে মাত্র ছুটি ইলেকট্রনের কক্ষ, ছুই নম্বরের কভারে থাকতে পারে ৮-টি। ইলেকট্রনের কক্ষ এমনি ক'রে পর পর নম্বরের কভারের উপরের সংখ্যা যাবে বেড়ে।

ইলেকট্রনের এমনিতর খোলের আকার সংগঠিত হওয়ায় দেখা যায় এক

একটি খোলে যে ইলেকট্রন আছে কেন্দ্রক থেকে তাদের প্রত্যেকের দূরত্ব প্রায় সমান এবং আরো দেখা যায় দুটির থেকে বেশি ইলেকট্রন নিয়ে যে সব পরমাণু গঠিত সেই খোলটি ছাড়া সব চেয়ে বাইরের খোলে ইলেকট্রনদের সংখ্যা হ'তে পারে মাত্র আট। হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি খোল এবং সেই খোলে রয়েছে একটি ইলেকট্রন। যেই হিলিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা হ'ল দুটি অমনি প্রথম খোলের দুটি ইলেকট্রনের আসন পূর্ণ হ'য়ে গেল। এরপর লিথিয়াম থেকে আরম্ভ ক'রে নিয়নের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি প্রথম খোলের দু'টিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় খোলে আসন পেল, একটি দু'টি ক'রে বাড়তে বাড়তে নিয়নের পরমাণুতে গিয়ে মোট হ'ল আটটি ইলেকট্রন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খোলের সব কয়টি ইলেকট্রনের আসন পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথম খোলের দুটি এবং দ্বিতীয় খোলের আটের পর নতুন একটি ইলেকট্রন বাড়লেও তার আসন হবে তৃতীয় খোলে। এমনি ক'রে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে একটি একটি ক'রে প্রোটনের সংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে ইলেকট্রনেরও সংখ্যাও বাড়বে এবং সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন খোলে নিজেদের আসন ক'রে নেবে। কিন্তু দু'টি ইলেকট্রনযুক্ত প্রথম খোলটি ছাড়া প্রত্যেকটি পদার্থের বেলায় সব চেয়ে বাইরের খোলে ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যা হ'তে পারে আট। পরমাণুর রাসায়নিক স্বভাব নির্ভর করে সব চেয়ে বাইরের খোলে কয়টি ইলেকট্রন আছে তার ওপরে। অন্যান্য পদার্থেরা কোন্ কোন্ পরমাণুর সংগে এবং কয়টি পরমাণুর সংগে সংযুক্ত হ'য়ে নতুন যৌগিক পদার্থ গ'ড়ে তুলতে পারবে তা' নির্ভর করে পদার্থের সব চেয়ে বাইরের খোলের এই সব ইলেকট্রনদের ওপর। কিন্তু বাইরের খোলে ইলেকট্রনদের জন্য যে কয়টি আসন আছে তার সব কয়টিই যদি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তা'হ'লে পদার্থ পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন প্রোটনের পরস্পরের আকর্ষণ সমন্বিত হয়ে সমগ্র পরমাণুটিকে এমন সুস্থির ক'রে রাখে যে পদার্থটি অপর কোন পদার্থের সংগে মিলে কোন যৌগিক বস্তু গ'ড়ে তোলবার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। হিলিয়ামের খোলে রয়েছে দুটি, নিয়নের দুটি খোলে ১০টি (২+৮), আরগণের তিনটি খোলে ১৮টি (২+৮+৮), ক্রিপটনের চারটি খোলে ৩৬টি (২+৮+১৮+৮) জিননের পাঁচটি খোলে ৫৪টি (২+৮+১৮+১৮+৮) এবং রেডনের ছ'টি খোলে ৮৬টি (২+৮+১৮+৩২+১৮+৮) ইলেকট্রন বাইরের খোলের প্রত্যেকটি আসন একেবারে পুরোপুরি ভাবে দখল ক'রে রয়েছে। একটি ইলেকট্রনের আসনও শূন্য প'ড়ে নেই। ফলে এই সব পদার্থ-পরমাণু-

গুলির অন্য পদার্থের সংগে সংযুক্ত হবার ক্ষমতাও নেই—তাই বিজ্ঞানে এই মৌলিক পদার্থ কয়টির নাম দেওয়া হয়েছে উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অন্যান্য পদার্থ পরমাণুর বেলায়ও বাইরের খোলের সব কয়টি ইলেকট্রনের আসন পুরো করবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। সোডিয়ামের বাইরের খোলে আছে মাত্র একটি ইলেকট্রন, বাকী ৭টি আসনই খালি। তাই একলা এই ইলেকট্রনটির জন্য সোডিয়ামের মায়া খুব কম এবং সহজে এই মায়া ছেড়ে দিয়ে নিয়নের ইলেকট্রনের সংগঠনের অনুকরণ করতে চায়। আবার ক্লোরিণের বাইরের খোলে আছে সাতটি ইলেকট্রন, সুতরাং ক্লোরিণের বাইরের খোলের নির্দিষ্ট আটটি আসনের একটি আসন রয়েছে অপূর্ণ। ক্লোরিণ তাই ধারে অন্য পদার্থ থেকে একটি ইলেকট্রন কেড়ে নিয়ে খোলের আসন কয়টি পূর্ণ ক'রে উদাসীন আরগণের মত সুস্থির হ'য়ে উঠতে চায়। এমনি সব পদার্থের বেলায় বাইরের খোলের ইলেকট্রনদের শূন্য আসনগুলো পূর্ণ ক'রে নিজের পরমাণবিক সংগঠনকে সুস্থির ক'রে তুলতে চায়।

বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সংগঠনের মোটামুটি খবর বিজ্ঞানীর আয়ত্তে এসেছে কিন্তু পরমাণু মহলের সম্পূর্ণ সংবাদ আজও রয়েছে অজ্ঞাত। পরমাণু কেন্দ্রকের মূল উপাদান কি কি, কি কি ভাবে এই মূল উপাদানগুলি সংগঠিত এবং কোন শক্তিবলে পরমাণুকেন্দ্রকের সংগঠন এতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী এমনিতর অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে অনুত্তর। তেমনিতর রয়েছে পরমাণুর ইলেকট্রন মহলে ইলেকট্রনের কক্ষগুলির আকার, ভংগী, ও সংগঠনের পরিপূর্ণ সংবাদের অভাব। তবু সংগঠনের যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতেই পদার্থের মৌলিক উপাদান, প্রকৃতি এবং বিভিন্ন যৌগিক বস্তুর বিচিত্র রীতিনীতির অনেক রহস্য সমাধানের সন্ধানই পাওয়া গেছে মৌলিক পদার্থ পরমাণুর সংগঠন সংবাদ থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থের রূপান্তর

পদার্থের মূল উপাদান বিদ্যুৎ। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুরাশিতে বিদ্যুতের তিলমাত্র চিহ্নও দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় বস্তুরাশি অজস্ররূপে, বিচিত্র ঢঙে, নানাবর্ণে, বিভিন্ন প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর চারিদিকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই বিচিত্র বস্তুরাশির গোত্র পরিচয় জানতে চাওয়া বুঝিবা মানুষের বাতুলতা। কোটি কোটি অজস্র বস্তুপুঞ্জের মিছিল থেকে কে নেবে কার খোঁজ? কে বলবে, এই অজস্র রকমের বস্তুরাশিতে রয়েছে কি কোন নীতি নিয়মের শৃংখলা? রয়েছে কি বস্তুরাশির সমাজ সংগঠন?

মানুষ ইতিহাসের আদি যুগ থেকে পৃথিবীর অজস্র বস্তুরাশিকে দেখেছে, প্রশ্ন করেছে, অজস্রতার মধ্যেও পদার্থের সামাজিক শৃংখলা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। তাদের সে চেষ্টার ধারাবাহিকতাই আজকের বিজ্ঞানের পরিণতি।

প্রথমে কল্পনা করা হয়েছিল পৃথিবীর বস্তুরাশি মাত্র পাঁচটি মৌলিক উপাদানে গড়া এবং এই পাঁচটি মৌলিক পদার্থই অজস্ররূপে সংগঠিত হ'য়ে গ'ড়ে তুলেছে বস্তুরাশির এই বিচিত্র সমাজ। গত দু'শ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গিয়েছে পাঁচটি নয়, বিরানব্বুইটি মৌলিক উপাদানে গড়া এই রকমারী পদার্থরাশি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গবেষণার ইতিহাসের আদি যুগের কল্পনা থেকেও সরল হ'য়ে ধরা পড়ল পদার্থের মৌলিক স্বরূপ। জানা গেল, বহু নয় মাত্র দ্বিবিধ প্রকৃতির বৈদ্যুতিক পদার্থে গড়া অজস্র বস্তুরাশির এই পৃথিবী।

বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব খোয়া গেল বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য গেল না। পদার্থের সংগঠন বিশ্লেষণ থেকে জানা গেল বিরানব্বুইটি পদার্থের পরস্পরের পার্থক্যের কারণ শুধু বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণগত প্রভেদ। কিন্তু বিদ্যুতের বিশিষ্ট পরিমাণ ও বিদ্যুৎ-কণার বিশিষ্ট সংখ্যার ওপর নির্ভর ক'রে মৌলিক পদার্থরূপে এক একটি সংগঠন গ'ড়ে ওঠে এবং সেই সংগঠনগুলি বিভিন্ন পদার্থের সংগে মিলে মিশে যৌগিক পদার্থ গ'ড়ে তুললেও

অটুট থাকে। মৌলিক পদার্থ অক্সিজেনকে অন্য যে কোন পদার্থের সংগে যৌগিক পদার্থরূপে যে কোন অবস্থায় বা যে কোন বস্তুরাশিতেই পাওয়া যাক্ না কেন, অক্সিজেন পরমাণু যে আটটি প্রোটন ও আটটি ইলেকট্রনের সমবায়ে এক বিশিষ্ট সংগঠনে গড়া রয়েছে সে সংগঠনের কোন পরিবর্তনই হয় না। সমস্ত বস্তুর মধ্যে মিলে গিয়েও অক্সিজেন পরমাণুর নিজস্ব সংগঠন বজায় থাকে। অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সংগে মিলে যৌগিক বস্তু গ'ড়ে উঠলে সাময়িক ভাবে অক্সিজেন নিজস্ব প্রকৃতি ও গুণগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বটে, কিন্তু আবার অক্সিজেনকে সেই যৌগিক পদার্থ থেকে আলগা ক'রে ছাড়িয়ে আনা হ'লে দেখা যায়, ফিরিয়ে-পাওয়া অক্সিজেন-পরমাণুর কি সংগঠনে, কি প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তনই হয় নি। একটি জলের অণুতে আছে দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। জলের সংগে মিশে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ের গুণগত স্বকীয়তার লোপ হয়েছে কিন্তু সংগঠনগত বিশিষ্টতার পরিবর্তন হয় নি। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থ কিন্তু জলের মধ্যে লুপ্ত রয়েছে তরল পদার্থরূপে। তথাপি জলের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু সংগঠনগুলি অটুটই রয়েছে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে তেমনি রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন পরমাণুতে আটটি প্রোটন ও আটটি ইলেকট্রন।

বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের সংগঠনের প্রত্যেকটির বেলায় এই একই সত্য প্রযোজ্য। অজস্র বস্তুরাশিতে এরা অজস্র রূপে প্রতিভাত হ'লেও, এদের মৌলিক পদার্থের সংগঠনগত স্বকীয়তা লুপ্ত হয় না। ইলেকট্রন ও প্রোটনের আবিষ্কারের ফলে মৌলিক পদার্থেরা মৌলিকত্ব হারিয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুজগতের অজস্র যৌগিক পদার্থ সংগঠনে মৌলিক পদার্থেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকত্ব হারায় নি। বিভিন্ন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের পারস্পরিক রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় যে সকল প্রাথমিক পদার্থকণা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে তারা হ'ল মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কণা। পদার্থের মৌলিক উপাদান অনুযায়ী ইলেকট্রন ও প্রোটনকে পদার্থের মৌলিক কণা বলা যায় কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘট্‌বার সময় ইলেকট্রন ও প্রোটন এক একটি বিশিষ্ট সত্তা রূপে কোন অংশ গ্রহণ করে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংঘরূপে পরমাণুর সংগঠন অটুট এবং

অখণ্ড থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভিড় থেকে যখন নতুন নতুন অণুর সৃষ্টি হয় তখন পদার্থ পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন প্রোটনগুলি আগাগোড়া নিজেদের ঢেলে সাজিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে সংগঠিত করে না। পরমাণু রূপে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংগঠন অপরিবর্তিতই থাকে শুধু পরমাণুগুলি নিজেদের নতুন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে অণুর নতুন মহল তৈরী করে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্, জলের সংগে সোডিয়াম ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা। জলের ওপর একটুকরো সোডিয়াম ধাতু ফেলে দিলে সোডিয়ামের সংগে জলের সংযোগ ঘটতে থাকে এবং যার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্ষারের সৃষ্টি হয়। ক্ষারের মধ্যে রয়েছে একটি সোডিয়ামের পরমাণু, একটি অক্সিজেনের পরমাণু এবং একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু—এই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের তিনটি পরমাণু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষার। এই প্রক্রিয়াটিকে নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায়, সোডিয়ামের অণুর সংগে জলের অণুর সংযোগের ফলে হাইড্রোজেন ও ক্ষার অণুর সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সোডিয়ামের এগারটি ইলেকট্রন ও প্রোটন এবং জলের অণুর (জলের অণুতে রয়েছে একটি অক্সিজেন ও দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু) দশটি প্রোটন ও দশটি ইলেকট্রন সর্বসাকল্যে মিলে দুটি ইলেকট্রন ও দুটি প্রোটনের একটি হাইড্রোজেন অণু এবং কুড়িটি প্রোটন ও কুড়িটি ইলেকট্রনের একটি ক্ষার বা কস্টিক সোডার অণু সৃষ্টি করেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, এক অণু জল ও এক অণু সোডিয়ামের মোট একুশটি ইলেকট্রন এবং একুশটি প্রোটন কি সবাই অংশ গ্রহণ করে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ?—এই ইলেকট্রন প্রোটনেরা কি সোডিয়াম, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংগঠনগুলি ভেংগে দিয়ে সবাই আবার নতুন ভাবে সংগঠিত হয় হাইড্রোজেন ও ক্ষারের অণুতে ?—তা হয় না। ইলেকট্রন ও প্রোটেনের সংঘরূপে পরমাণুর সংগঠনগুলি অটুটই থাকে। যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে নতুন অণু সৃষ্টি হয় তখন শুধুমাত্র পরমাণুগুলি নতুন ভাবে নিজেদের নতুন বন্ধনে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। সোডিয়াম পরমাণু মৌলিক বস্তু জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুগুলির সংগে মিলে একটি হাইড্রোজেন, একটি অক্সিজেন ও একটি সোডিয়াম পরমাণুর সমন্বয়ে একটি কস্টিক সোডা অণু ($NaOH$) এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমন্বয়ে একটি হাইড্রোজেন অনু (H_2) গ'ড়ে তুলেছে। সকল প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ই দেখা যায় পদার্থের পরমাণুকণাগুলিই প্রাথমিক এবং

মৌলিক কণা রূপে অংশ গ্রহণ করে। পরমাণুর এরূপ প্রকৃতির ফলে তথাকথিত মৌলিক পদার্থগুলি মৌলিক না হ'য়েও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মোটামুটি মৌলিক পদার্থ রূপেই ব্যবহার করে। বিভিন্ন মৌলিক বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটবার সময় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থগুলি প্রথমে বস্তুর আভ্যন্তরীণ বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে ভেংগে যায় মুক্ত পরমাণুরূপে এবং এই মুক্ত পরমাণুরা আবার পরস্পর নতুন ভাবে মিলে মিশে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে নতুন বস্তু গ'ড়ে তোলে। লবণের সংগে সালফিউরিক এ্যাসিড্ মেশালে পরস্পরের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং লবণ ও সালফিউরিক্ এ্যাসিড্ ভেংগে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন বস্তু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড্ ও সোডিয়াম্ সালফেট্ তৈরী হয়। প্রথমে লবণ অণুর বন্ধন থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরিণ পরমাণু এবং সালফিউরিক অণুর বন্ধন থেকে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ও গন্ধক পরমাণুগুলি নিজেদের নেয় মুক্ত ক'রে কিন্তু পরক্ষণেই আবার সোডিয়াম, ক্লোরিণ, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ও গন্ধক পরমাণুদের ভিড় থেকে নতুন পরমাণুর সংঘ গ'ড়ে উঠতে থাকে। সোডিয়াম, গন্ধক ও অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে সোডিয়াম সালফেট্ এবং হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণ পরমাণুর সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড নামের সম্পূর্ণ নতুন বস্তু। এমনিতর প্রত্যেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ই যৌগিক বস্তুর বন্ধন থেকে প্রথমে পরমাণুরা নিজেদের মুক্ত ক'রে নেয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নতুন যৌগিক বস্তুতে দলে দলে পুনর্গঠিত হ'তে থাকে।

যৌগিক পদার্থ

এই পৃথিবীতে আমরা যত বস্তুরাশি দেখতে পাই তার প্রায় বেশির ভাগই যৌগিক বস্তু। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, উদাসী গ্যাস ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি এবং সোনা, রূপা, পারদ ইত্যাদি ধাতুগুলিও আমরা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাই বটে, কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থেরা সবাই রয়েছে দুই তিন বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যার মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত যৌগিকপদার্থ-অণুরূপে। যে সকল মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদেরও পরমাণুরূপে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অণুরূপে। অবশ্য সোনা বা রূপার মত মৌলিক পদার্থ যাদের অণুমাত্র একটি পরমাণুতে গঠিত তাদের বেলায় অণু এবং পরমাণুর সংগঠনের কোন পার্থক্য নেই।

পদার্থের অণুকে পৃথিবীর বস্তুসমাজের মৌলিক বা আদি বাসিন্দা বলা যায়। এই বাসিন্দার পরিচয় মিলবে হয় মৌলিক অণুরূপে, নয় যৌগিক অণুরূপে। এই বাসিন্দা পদার্থ অণুরা দলে দলে গ'ড়ে তুলেছে পৃথিবীর জৈব পদার্থ—ফুল, ফল, গাছ, লতাপাতা ও জীবজন্তু ; অজৈব পদার্থ—মাটি, বাতাস ; এবং ধাতব ও অধাতব পদার্থ।

মৌলিক অণু

একই জাতের দু'টি বা তা'র চেয়ে বেশি পরমাণু নিয়ে যে অণু গ'ড়ে ওঠে তাকে বলা হয় মৌলিক অণু, যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ ইত্যাদি পদার্থের অণুগুলি দু'টি দু'টি পরমাণুতে এবং আরসেনিক ও ফসফরাসের অণুগুলি চার চারটি পরমাণু নিয়ে গঠিত। সাধারণতঃ একটি পরমাণুকণার যে গুণ দেখা যায়, অণুকণাতেও পদার্থের সেই গুণই দেখা যায়। স্বভাবে ও গুণে অক্সিজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন অণু প্রায় হুবহু একরকম। একমাত্র পরমাণবিক অবস্থায় শুধু অক্সিজেন নয়, সকল পদার্থই একটু বেশিরকম কর্মক্ষম। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক অণুর বেলায়, এ নিয়ম খাটে না। অক্সিজেন অণু দুটি পরমাণু দিয়ে গড়া কিন্তু দুটির জায়গায় পরমাণুর সংখ্যা তিনটি হ'লেই এক নতুন পদার্থ গ'ড়ে ওঠে বিজ্ঞানে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ওজোন'। 'ওজোন'ও পুরোপুরি অক্সিজেন তথাপি সাধারণ অক্সিজেনের চেয়ে অনেক রকমেই পৃথক। অক্সিজেনের কোন বর্ণ নেই, গন্ধ নেই। কিন্তু 'ওজোন' দেখতে নীলাভ এবং 'ওজোন'-এ পাওয়া যায় মাছের আঁসের গন্ধ। এমনিতর ফসফরাস, গন্ধক ও কারবনের মৌলিক অণুর বেলায়ও একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। একই গন্ধককে পাওয়া যায় হলদে ও শক্ত পদার্থরূপে এবং নরম তুলতুলে ও রজনের মত রঙের ভিন্ন পদার্থরূপে। একরকম ফসফরাস অণু বর্ণহীন ও মোমের মত নরম এবং অত্যন্ত বিষাক্ত। আবার ফসফরাসেরই আর একরকম অণু জবাফুলের মত লাল, যার কোন বিষ গুণই নেই। কারবন অণুর বেলায় পার্থক্যটি আরো আশ্চর্য্য রকমের। হীরা, গ্রেণাইট, ঝুল বা অংগার—মূলে একই মৌলিক পদার্থ কারবন। তথাপি রূপে ও গুণে পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ওজোন ছাড়া অন্যান্য পদার্থের বেলায় একই পদার্থ অণুর এরূপ পার্থক্যের কারণ এখনো নিঃসন্দেহে জানা যায়নি। তবে সম্ভবত একই পদার্থের (হীরার অণুতে রয়েছে বারটি

কারবন পরমাণু, গন্ধকে রয়েছে আটটি পরমাণু, 'ওজোনে' রয়েছে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু) অভ্যন্তরে পরমাণুকণাগুলি একই সাজে সংগঠিত হ'য়ে নেই, বিভিন্ন ছাঁচে গ'ড়ে তুলেছে অণু দেহের গড়ন। তাই এরূপ প্রকৃতির বিভিন্নতা।

এই কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থ—অক্সিজেন, গন্ধক, ফসফরাস, কারবন ইত্যাদি ছাড়া মৌলিক অণু মাত্রেরই পদার্থের পরমাণুকণার সংগে স্বভাবে ও গুণে কোন পার্থক্য থাকে না। শুধু কয়েকটি পরমাণুর সমবায়ে পদার্থের মৌলিক অণু গ'ড়ে উঠতে পারে এই যা।

যৌগিক অণু

কিন্তু এই বিচিত্র পৃথিবীর অজস্র বস্তু রাশির বেশির ভাগই যৌগিক অণুর সমষ্টি। অজৈব বস্তু—মাটি, জল, ক্ষার, এসিড, লবণ; জৈব পদার্থ—গাছ পালা, ফুল ফল, জীবজন্তুর দেহ, চাল ডাল, চিনি, ঘি সবই যৌগিক পদার্থের অণু দ্বারা গঠিত। অজৈব পদার্থের অণুগুলি, সাধারণতঃ দু'টি, তিনটি বা চারটি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকণা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে। অজৈব বস্তুর অণুতে সাধারণতঃ চারজাতের বেশি ভিন্ন রকমের পরমাণু না দেখা গেলেও বিভিন্ন জাতের মোট পরমাণু সংখ্যায় চারের চেয়ে হ'তে পারে অনেক বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জলের অণুতে রয়েছে হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু, সোডা বা সোডিয়াম কারবনেটের অণুতে রয়েছে দুটি সোডিয়াম পরমাণু, একটি কারবন পরমাণু ও তিনটি অক্সিজেন পরমাণু, এবং প্রুশিয়ান্ ব্লু বা পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড অণুতে রয়েছে চারটি পটাসিয়াম পরমাণু একটি লোহা ও দুটি কারবন ও দুটি নাইট্রোজেনের পরমাণু। মোট সতেরটি বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু মিলে সংগঠিত করেছে প্রুশিয়ান ব্লু পদার্থটি।

জৈব পদার্থ

অজৈব পদার্থের তুলনায় জৈব পদার্থের আণবিক সংগঠন অত্যন্ত বিচিত্র। বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের সকলটিকেই প্রায় কোন না কোন যৌগিক বস্তুতে পাওয়া যায় কিন্তু জৈব পদার্থ যে কয়টি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে তাদের সংখ্যা মাত্র তিনটি—হাইড্রোজেন, অকসিজেন ও কারবন।

এই তিনটি ছাড়া নাইট্রোজেনকেও অনেক জৈবিক পদার্থে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আগের তিনটি মৌলিক পদার্থের তুলনায় নাইট্রোজেন সম্বলিত জৈব পদার্থের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সময় সময় গন্ধক, ফসফরাস এবং ক্লোরিণও জৈব পদার্থের অণুতে দেখা যায় কিন্তু এরূপ জৈব পদার্থের সংখ্যা তুলনায় নগণ্য বললেও চলে। জৈব পদার্থের সমষ্টি মাত্র এরূপ কয় জাতের মৌলিক পদার্থ নিয়ে গড়া বটে, কিন্তু জৈবিক পদার্থ সংখ্যায় মৌলিক পদার্থ থেকে বহুগুণ বেশি। এ যাবৎ প্রকৃতিতে যে সকল জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে এবং বিজ্ঞানাগারে যে সকল জৈব পদার্থ তৈরী হয়েছে, সর্বসাকল্যে তাদের সংখ্যা প্রায় লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া জৈব পদার্থেরা পরমাণুর জাতে সরল বটে, কিন্তু সংখ্যায় জটিল হ'তেও জটিলতর হ'তে পারে। যে গ্যাস আপনি জ্বলে জ্বলে আলেয়ার সৃষ্টি করে সেই মিথেন গ্যাসের অণু মাত্র একটি কারবন ও চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে গঠিত অর্থাৎ মাত্র দুই জাতের পাঁচটি পরমাণু মিথেন অণুতে। কিন্তু চিনি, বিভিন্ন জৈব তেল, মোম, পেট্রল, ষ্টার্চ, সেলুলুজ ইত্যাদি জৈব পদার্থগুলিতে আছে এক দল হাইড্রোজেন ও কারবন বা কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের ত্রয়ী দল। অথচ এদের কোন কোন পদার্থের অণুতে বিভিন্ন পরমাণুর মোট সংখ্যা পঞ্চাশ শ'য়েরও অধিক হ'তে পারে। এখন পর্য্যন্ত অনেক ষ্টার্চ ও সেলুলুজের আণবিক সংগঠন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি কিন্তু যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেই দেখা যায়, কোন কোন ষ্টার্চে বার শ' কারবন, বিশ শ' হাইড্রোজেন, দশ শ' অক্‌সিজেন পরমাণু নিয়ে গ'ড়ে তুলেছে এক একটি ষ্টার্চ অণু। অজৈব পদার্থের এমন একটি যৌগিক অণুও দেখা যায় না কি প্রকৃতিতে, কি বিজ্ঞানাগারে তৈরী পদার্থে, যার অভ্যন্তরে পরমাণুর সংখ্যা একশ'র বেশি হ'বে। জৈবিক পদার্থের আর একটি বৈচিত্র্য দেখা যায় যা অজৈবিক পদার্থের নেই। এক অণু সালফিউরিক এসিড দু'টি হাইড্রোজেন, একটি গন্ধক ও চারটি অক্সিজেনে গঠিত (H_2SO_4) ; এবং দুই এক ও চার এই অনুপাতে হাইড্রোজেন গন্ধক ও অক্‌সিজেনে গঠিত যে কোন পদার্থ রচনা করার চেষ্টা হ'ক না কেন সব সময়েই পাওয়া যা'বে একটি মাত্র পদার্থ সালফিউরিক এসিড। কিন্তু জৈব পদার্থের বেলায় এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দুটি কারবন ছ'টি হাইড্রোজেন ও একটি অক্‌সিজেন পরমাণুতে গড়া একটি যৌগিক অণু (C_2H_6O) অ্যালকোহলও হ'তে পারে, ইথারও হ'তে পারে। এমনতর

$C_8H_{22}O_8$ অর্থাৎ আটটি কারবন পরমাণু বাইশটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও আটটি অক্সিজেন পরমাণুকে বিভিন্ন ঢঙে সংগঠিত ক'রে ছেষট্টি রকমের জৈব পদার্থ গ'ড়ে তোলা যায়, যারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে একেবারে বিভিন্ন। অজৈব পদার্থের বেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যার পরমাণু-জোট কোন সময়েই ভিন্ন পদার্থ হওয়া সম্ভব নয়। জৈব পদার্থের অণুর অভ্যন্তরে কি ঢঙে পরমাণুরা সজ্জিত হয়ে অণুর ঘর বানাবে, তার নক্সার উপর নির্ভর ক'রবে জৈব পদার্থের দ্রব্যগুণ। জৈব পদার্থের আণবিক সংগঠন সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া

অহরহ প্রকৃতিতে পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তনের মূলে কিছু পরিমাণে রয়েছে পদার্থের অবস্থান্তর, কিন্তু অজস্র পরিবর্তনের বেশির ভাগের মূলেই রয়েছে পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর। জল গরম হ'য়ে বাষ্পরূপে যায় উড়ে। আবার ঠাণ্ডা পেয়ে মেঘ জমে বৃষ্টিরূপে পড়ে ঝ'রে। কিন্তু জল জলই থাকে আগাগোড়া। চন্দ্রের টানে সমুদ্রে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়। সূর্যের উত্তাপ লেগে বাতাসের আসা যাওয়া চলে—কিন্তু জলের বা বাতাসের কোন রূপান্তর হয় না। পক্ষান্তরে প্রতিদিন কত ভাবে আগুন জ্বলে জ্বলে কাঠ, তেল নিঃশেষ ক'রে রূপান্তরিত ক'রে দিচ্ছে—সকল দাহ্য পদার্থের কারবন ও হাইড্রোজেন বাতাসের অক্সিজেনের সংগে মিলে কারবন-ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে, গাছপালা বাতাস থেকে কারবন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন নিয়ে, মাটি থেকে জল নিয়ে, দৈহিক সংগঠনের জন্য কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ ক'রে গাছপাতার নতুন নতুন দেহ তৈরী করেছে। জীবজন্তু দিনরাত খাদ্য সংগ্রহ ক'রে পাকযন্ত্রের রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে পরিপাক ক'রে দেহের বিভিন্ন জীবকোষের বৃদ্ধি ক'রছে। দুধ থেকে দই, ছানা, মাখন ও ঘি হ'চ্ছে। এমনিতর কি প্রকৃতির লীলাখেলায়, কি মানুষের কারসাজিতে অজস্রভাবে পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর হ'চ্ছে। আজ যে বস্তু ছিল, কাল তার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অণুকণার পরমাণুগুলি ভেংগে ভেংগে মুক্ত হ'য়ে পরক্ষণেই আবার নতুন ভাবে দল বেঁধে নতুন নতুন অণুকণার সংগঠন রচনা ক'রে নতুন বস্তুর সৃষ্টি করছে। এমনি ক'রে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন চলছে বস্তুজগতে, যে ভাংগাগড়ার লীলা চ'লছে তা আর কিছুই নয় পদার্থের

আণবিক রূপান্তর মাত্র। বিশ্বজগতের বস্তুরাশির সৃষ্টি ও বিলয়ে বিজ্ঞানী দেখছেন শুধু বস্তুর রূপান্তর। অজস্র নমুনার পদার্থ অণুর পরমাণুগুলি পুরান আণবিক সংগঠনের বন্ধন ছিন্ন ক'রে বিচিত্র প্রকারের নতুন নতুন আণবিক সংগঠন সৃষ্টি ক'রে নতুন ভাবে আবার সংগঠন করছে নিজেদের। সৃষ্টির প্রথমদিকে বিশ্বজগতে বস্তুরাশির যে পরিমাণ ছিল আজও অমর হ'য়ে সেই পরিমাণ বস্তুরাশিই রয়েছে হুবহু, ইলেকট্রন প্রোটনের যে মোট সংখ্যা মোট ওজন ছিল তার একতিল কমবেশিও হয়নি। শুধু হয়েছে বস্তুরাশির দল বাঁধার অদল-বদল। বিজ্ঞানীর চোখে যেন এই বস্তুপুঞ্জের বিশ্বজগৎ অজস্র পরমাণুর একটি বিচিত্র মেলা। এ মেলাতে ক্ষণে ক্ষণে পুরান অণুদল ভেংগে পরমাণুর ভিড় গ'ড়ে উঠছে আবার মুহূর্ত মধ্যেই ভিড়ের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে, সুশৃংখলিত ও সুসংগঠিত পরমাণুদের নতুন দল। কিন্তু নয়া পুরান অণুকণার কোন দলই ঠিক থাকছেনা চিরকাল।

এ অণুকণার দলের সংগে ও অণুকণার দলে যদি গায় গায় লাগে, জলের মধ্যে গ'লে গিয়ে দু' জাতের দু' দল অণু যদি পরস্পরের সংগে মেলামেশা করতে পারে, কোন একটি অণুদল যদি বিভিন্ন অণুদলের সমষ্টির উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ বা ধ্বনির উসকানি পায়, যদি অন্য কোন শক্ত অণুদল এসে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে দেয় কোন অণুর দলকে, অথবা এমন যদি হয় কোন চতুর ও কর্মঠ অণুর দল দু'টি ভিন্ন জাতের অণুদলের মাঝে প'ড়ে পরস্পরের মিলনের পথে দূতিয়ালী ক'রে দেয় তা'হ'লে পুরাণ পদার্থ-অণুরা রূপান্তরিত হ'য়ে যায় নতুন পদার্থ অণুর সংগঠনে। বিজ্ঞানের কাছে তাই জীবজন্তু, মাটি, জল, গাছপাতায় গড়া এই বস্তুজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয় পদার্থের অভিনব ও বিচিত্র রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

পদার্থ সমাজের শৃংখলা

পদার্থের যে রূপান্তর ঘটছে প্রতিনিয়ত তার কি কোন আইন-কানুন নেই ? কোন্ পরমাণু অন্য কোন্ পরমাণুর সংগে মিলবে, কে কয় সংখ্যায় কার সংগে মিলতে পারবে তা'র কি কোন নির্দিষ্ট মান নেই ? পদার্থ-জগৎ কি শৃংখলাহীন ? সামাজিক কাঠামোর কোন প্রয়োজন নেই পদার্থ পরমাণুদের ? পদার্থ পরমাণুর জগতে অন্তহীন যে দলগড়ার সংগ্রাম চ'লছে তা কি চ'লছে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ? মাত্র কয়েক শ' কোটী মানুষের পৃথিবীতেও তো র'য়েছে

রাষ্ট্র, সমাজ, ও পরিবারের শৃংখলা, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করবার রীতিনীতি! আর বস্তুজগতের অগণিত বাসিন্দারূপ পদার্থপরমাণু যাদের সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এক সংগে বসে জীবনভর গুণেও শেষ ক'রতে পারবে না, তারা কি পারে খামখেয়ালী ক'রে বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে? বস্তুত বস্তুজগতেরও পদার্থ পরমাণুর পরস্পরের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করবার রীতিনীতি র'য়েছে, সামাজিক 'অণু'-সংঘ গঠনের শৃংখলা র'য়েছে। এ শৃংখলা না থাকলে মুহূর্তে মুহূর্তে পরমাণু জগতে প্রলয়ংকর বিপ্লব ঘটত এবং বস্তু-জগত বিশৃংখল হ'য়ে উঠত।

পদার্থ পরমাণুর সামাজিক প্রথা বিশ্লেষণ ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন বিরানব্বুই জাতের পদার্থ পরমাণুরা নির্বিচারে প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকে মিলে যুক্ত পরমাণু অণু গঠন করতে পারে না। কোন্ জাতির সংগে কোন জাতির পরমাণুর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ সম্ভব তা' পদার্থের সামাজিক আইনে নির্দিষ্ট রয়েছে। মেণ্ডেলিফের তালিকায় বিরানব্বুই জাতের পদার্থকে আটটি পরিবারে গুছোনো হয়েছে। আটটির যে কোন পরিবার এক পরিবারে ভুক্ত সভ্যেরা পরস্পরকে সংগে মিলতে পারেনা। এক পরিবারে ভুক্ত পটাসিয়াম্; সোডিয়াম্; সোনা, রূপা; প্লাটিনাম; লোহা; ক্লোরিণ, ফ্লোরিন; নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি মৌলিক পদার্থেরা পরস্পরের সংগে মিলে যৌগিক অণুসংগঠনে জোট বাঁধতে পারে না; অণুরূপে জোট বাঁধবার বেলায় এক পরিবারের সভ্যদের সংগী খোঁজবার নজর স্বভাবতই পড়ে অন্য পরিবারের সভ্যদের প্রতি। বিশেষ করে যদি সে পরিবারে সভ্যদের নেগেটিভ বিদ্যুতের দিকে ঝোঁক থাকে (Electro-negative) তারা অবশ্যম্ভাবী পজিটিভ বিদ্যুতের দিকে ঝোঁকা (Electro-positive) পরিবারের সভ্যদের সংগে মিলে জোট বাঁধবে ও যৌগিক অণুসংগঠন গ'ড়বে। অবশ্য মৌলিক অণুসংগঠনে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বেলায় ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। মৌলিক অণু একই পরিবারের সমজাতের দু'টি বা দু'টির বেশি পরমাণু নিয়ে অণু সংগঠন করতে পারে। যেমন হাইড্রোজেন পারে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে মৌলিক অণু গড়তে, ক্লোরিণ পারে দু'টি ক্লোরিণ পরমাণু নিয়ে মৌলিক ক্লোরিণ অণু গড়তে। অক্সিজেন একই পরিবারের সভ্য গন্ধকের সংগে মিলে গন্ধক-অক্সাইডের অণু গঠন করে পরস্পর জোট বাঁধতে পারে। হাইড্রোজেনও তেমনি পারে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির সংগে

জোট বাঁধতে। তবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পদার্থদের পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ রচনা করবার ক্ষেত্রে ছ'টি বিশেষ ব্যতিক্রমমাত্র, এবং ছোটখাট এমনিতর ব্যতিক্রম অবশ্য খুব অল্প আরো কয়েকটি পদার্থের বেলায়ও দেখা যায়।

সংগী বিচারে পদার্থ পরমাণুরা কে কার সংগে মিলতে পারবে তার বাঁধা নিয়মের সংগে কোন্ পদার্থ পরমাণু অপর কোন্ পদার্থ পরমাণুর কয়টির সংগে মিলে আণবিক জোট বাঁধতে পারবে তারও নির্দিষ্ট রীতি র'য়েছে। এই রীতির মাপকাঠি হল হাইড্রোজেনের সংগে সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় জোট বাঁধবার ক্ষমতা। একটি ক্লোরিণ পরমাণু সাধারণতঃ একটি হাইড্রোজেন, একটি অক্সিজেন পরমাণু ছ'টি হাইড্রোজেন, একটি বোরন পরমাণু তিনটি, একটি কারবন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সংগে মিলতে পারে। হাইড্রোজেনের সংগে মেলবার এই সর্বোচ্চ সংখ্যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'মৈত্রাংক' (valency)। স্থতরাং ছুই মৈত্রাংক সংখ্যার ছুইটি ও তিনটি অক্সিজেন পরমাণু যথাক্রমে চার মৈত্রাংক সংখ্যার মাত্র একটি কারবন পরমাণু এবং ছয় মৈত্রাংকের একটি গন্ধক পরমাণুর সংগে আণবিক জোট বাঁধতে পারবে। তেমনি ভাবে ছুই মৈত্রাংক অক্সিজেনের সংগে তিন মৈত্রাংক এ্যালুমিনিয়ামের মিলতে হ'লে তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংগে মিলতে হবে ছ'টি এ্যালুমিনিয়ম পরমাণুকে। অনেক সময় মৈত্রাংক সব কয়টি সংখ্যায় পুরো হ'লে পদার্থ পরমাণুরা পরস্পরেরা মিলে না, যে পদার্থ মিলবে এবং যার সংগে মিলবে তাদের পরস্পরের পরমাণুর সংখ্যা যদি পর্যাপ্ত না থাকে, অথবা উত্তাপ, বিদ্যুৎ বা অন্য কোন বাইরের প্রভাব যা উসকানি দিয়ে ভিন্ন জাতের পদার্থ পরমাণুর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেয়, তাদের জোর যদি কম হয়, তবে মৈত্রাংক পুরাপুরি কাজে নাও লাগতে পারে। একটি কারবন পরমাণুর সংগে সাধারণতঃ ছুটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে কারবন-ডাই-অক্সাইড্ (CO_2) বানিয়ে মৈত্রাংক পরিপূর্ণ করতে পারে। কিন্তু অবস্থার অকসাইড অভাবে ছ'টির বদলে একটি অক্সিজেন পরমাণুর সংগে মিলে কারবন-মন-অক্সাইডও (CO) গড়তে পারে। তবে অবস্থার স্থযোগ ও স্থবিধা হলেই একটি কারবন ও একটি অ সিজেন পরমাণুতে গড়া কারবনমনক্সাইড্ আর একটি অক্সিজেন পরমাণুকে টেনে নিয়ে মৈত্রাংক পূরণ করে কারবনডাইঅকসাইড গড়ে তোলবার দিকে একটি বিশিষ্ট ঝোঁক দেখা যায়। অন্যান্য সকল পদার্থের

বেলায় অপূর্ণ মৈত্রাংক সুযোগ পাওয়া মাত্রই পূর্ণ ক'রে ফেলবার দিকে কোন শৈথিল্য দেখায় না।

পদার্থের পরমাণু-সমাজের আণবিক শ্রেণী সংগঠন, সামাজিক শৃংখলা, পরস্পরের জোট বাঁধবার রীতিনীতি এবং এক অণু সংগঠন থেকে আর এক অণু সংগঠনে রূপান্তরের প্রচলিত আইনকানুন সব কিছুর মূল-চাবি র'য়েছে মৈত্রাংকের ওপর, অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ পরমাণুর পরস্পরের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট পরিমাপের উপর। তাই পদার্থ-পরমাণুর সমাজ-শাসনের মূল বনিয়াদ গাঁথা র'য়েছে এই মৈত্রী বন্ধনের নির্দিষ্ট প্রথায়। পরমাণুতে পরমাণুতে মৈত্রী বন্ধনের প্রথা নির্দিষ্ট ব'লেই, অজস্র যৌগিক অণুর সংগঠনের নক্সাও নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। জলের অণুতে রয়েছে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। এবং জলের অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর এই সংখ্যা চিরস্থির ব'লেই অপরিবর্তিত থাকবে এই অনুপাতে। তেমনি বারটি কারবন বাইশটি হাইড্রোজেন ও এগারটি অক্সিজেন পরমাণুরা তাদের এই নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুপাতে চিরদিন জোট বাঁধবে চিনির অণুতে। কি জলের অণু, কি চিনির অণুতে এই নির্দিষ্ট অনুপাতের এক কণা বেশি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন বা কারবন পরমাণু শত চেষ্টা ক'রেও কোনদিন ঢুকান যাবে না। মেণ্ডেলিফের তালিকায় অবস্থিত পদার্থ পরমাণুদের মৈত্রাংক সরল ও পূর্ণসংখ্যার হওয়ায় বস্তু অণুতে যে পরিমাণে বিভিন্ন পদার্থেরা এসে জোট বাঁধে তাদের সংখ্যার অনুপাতও হয় সহজ ও সরল। জৈব পদার্থের অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু খুব বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় বটে এবং তাদের আণবিক সংগঠনের নক্সাও খুব জটিল হয় বটে কিন্তু মৈত্রাংকের দিক থেকে পদার্থ পরমাণুদের আনুপাতিক সংখ্যাতে বিশেষ জটিলতা দেখা যায় না।

মেণ্ডেলিফের তালিকা ও রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও মৈত্রাংকের রহস্য

কারণ না জেনেও মেণ্ডেলিফের আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা বস্তুজগতে পদার্থ পরমাণুদের সামাজিক শৃংখলার এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবহারিক রীতিনীতি লক্ষ্য করেছেন এবং বস্তুজগতের রূপান্তর উপলব্ধি করবার জন্য পরমাণু সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে বিভিন্ন থিয়োরিতে বা তত্ত্বে সংজ্ঞা

দিয়েছেন। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থ পরমাণুর পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতার অর্থাৎ মৈত্রাংকের নির্দেশও করেছেন। পদার্থ পরমাণু সমাজের এই রীতি-নীতি জানবার ফলে প্রকৃতিতে পাওয়া হাজার হাজার রকমের জৈব ও অজৈব পদার্থ অণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতের পরমাণুর সমবায়ে বস্তুঅণুদের কাঠামো ও সংগঠনের নক্সা জানাও সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রকৃতি জগতে ছড়িয়ে থাকা পদার্থ পরমাণুদের ঐ সব খবর জানার ফলে যে জিনিষগুলি আগে একমাত্র প্রকৃতিতেই পাওয়া যেত এমনিতর হাজার রকমের পদার্থ বিজ্ঞানাগারে মানুষই আজ তৈরী করছে। প্রকৃতিতে যে সকল বস্তু পাওয়া যায় না এমনিতর কত রকমের বস্তু বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন সংখ্যার পরমাণুদের পরস্পরের সংগে সংযুক্ত ক'রে নতুন নতুন যৌগিক অণুতে জোট বাঁধিয়ে বিজ্ঞানাগারে ও কারখানায় তো হামেশাই কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হ'চ্ছে। কে না জানে আজকের মানবসভ্যতায় অজস্র রকম বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত নতুন উপকরণ ও হাজারো রকমের ওষুধপত্র ও রাসায়নিক উপকরণের আমদানীর কথা। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা শুধু জেনেছেন পদার্থ সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এবং এ জানাকে তাঁরা কাজেও লাগিয়েছেন পুরোপুরি। কিন্তু পদার্থ সমাজের প্রচলিত প্রথার কারণ কি তা বিজ্ঞানীদের কাছে আগাগোড়াই রয়ে গিয়েছিল রহস্যময়। কেন প্রতিনিয়ত বস্তুপৃথিবীতে রূপান্তর চল্‌ছে? কেন হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং সে প্রক্রিয়ায় কেনই বা হয় উত্তাপের আদানপ্রদান? কেন পদার্থ পরমাণুরা পজিটিভ বা নেগেটিভ বিদ্যুতের প্রতি ঝোঁক দেখায়? কেন পদার্থ পরমাণুরা অণুরূপে জোট বাঁধবার সময় বিশেষভাবে পরস্পরের সংগী বেছে নেয়? কেনই বা দু'জাতের দু'দল অণু পরস্পরের সংগে এসে মিললে দল ভাঙগাভাঙগি হয়ে যায় এবং এদলের পরমাণু নিজের দল ছেড়ে ওদলের সংগে গিয়ে যোগ দেয়? কেনই বা জৈব পদার্থের অণুতে মাত্র তিনজাতের পরমাণুরা হাজার সংখ্যায় মিলে পরমাণুর বিশাল অট্টালিকা গড়ে তোলে? জৈব পদার্থে কেন বা একই সংখ্যার বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন নকসায় সংগঠিত হ'য়ে নিজস্ব গুণের আলাদা আলাদা বস্তু তৈরী করে? এমনিতর কত প্রশ্নের জবাবই র'য়ে গিয়েছিল অজানা। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ পরমাণুর মূল উপাদান এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠনের মোটামুটি খবর জানার ফলে বস্তুজগতের অনেক প্রশ্নেরই সমাধান হয়েছে বটে, কিন্তু সব রহস্যই এখনো উদ্ঘাটিত হয় নি।

বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ পর পর বেড়ে যাওয়া পরমাণবিক ওজনের ক্রমান্বয়তায় মৌলিক পদার্থগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি তালিকা রচনা করেছিলেন। এবং তালিকার নক্সা থেকে তিনি দেখিয়ে ছিলেন বিভিন্ন পদার্থ পরমাণুদের শৃংখলা, পরস্পরের গভীর সম্বন্ধ ও নিকট ঐক্য। কিন্তু তিনি তালিকার গোড়ার কারণ কিছুই বলতে পারেননি। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এরূপ চমকপ্রদ শৃংখলা ও বিচিত্র মিল মেণ্ডেলিফের কাছে একটা বিশেষ আকস্মিক ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছিল মাত্র। তাই তালিকার ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেণ্ডেলিফের তালিকা রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পদার্থের মূল উপাদান এবং পদার্থ পরমাণুর সংগঠনের খবর মোটামুটি জানা গেল, মৌলিক পদার্থ-সমাজের শৃংখলা ও পারস্পরিক ঐক্যানুবোধের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল। রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় পদার্থ পরমাণুদের সংগী বাছাইয়ের কারণ আন্দাজ করা সম্ভব হ'ল ও বিভিন্ন সংখ্যার পর্যায়ে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাবার কারণের সন্ধানও আর গোপন রইল না। মেণ্ডেলিফের তালিকারও সংশোধন হ'ল।

পদার্থের মূল উপাদান ও পরমাণবিক সংগঠন আবিষ্কৃত হ'লে জানা গেল মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই মূল উপাদান হ'ল ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। এদের সংখ্যাভেদের উপর নির্ভর করে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের প্রকৃত ভেদ। পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে প্রোটনের সংখ্যার উপর। পদার্থের কেন্দ্রে প্রোটনের সহবাসী নিউট্রনেরা শুধুমাত্র পদার্থের ওজন বাড়ায়। কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যার হের ফেরে পদার্থের মৌলিকত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। পরমাণুতে রয়েছে একটি প্রোটন এবং পর পর মৌলিক পদার্থে প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে য়ুরেনামে গিয়ে ঠেকেছে বিরানব্বুইটিতে। এক একটি প্রোটনের সংখ্যা বেড়েছে আর এক একটি মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয়েছে। মেণ্ডেলিফ ভেবেছিলেন পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে পরমাণবিক ওজনের ওপর, কিন্তু দেখা গেল মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজনের কোন স্থিরতা নেই [সমঘর পদার্থ দ্রষ্টব্য]। ফলে মেণ্ডেলিফের তালিকায় মৌলিক পদার্থদের পরমাণবিক ওজন অনুযায়ী না সাজিয়ে, প্রোটনের সংখ্যা অনুযায়ী পরপর নতুন ক'রে সাজান হ'ল এবং দেখা গেল কোবলট, নিকেল, আয়ডিন, টেলুরিয়াম, বিরলমাটি ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের তালিকার কোন্ কোন্ ঘরে স্থান হবে সে সম্বন্ধে কোন অসুবিধা বা অনিশ্চয়তা আর রইল না।

পদার্থের মৌলিকত্বের সন্ধান দিল প্রোটনের সংখ্যা। তেমনি মৌলিক পদার্থদের পরস্পরের স্বভাবের ঐক্য এবং বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যার পর্যায়ে পর্যায়ে এই ঐক্য ঘুরে ঘুরে আসবার হেতু এবং অণুরূপে জোট বাঁধতে গিয়ে সংগী বাছাইয়ের বেলায় পদার্থের পক্ষপাতিত্ব করার কারণের খোঁজ দিল পরমাণুর বিভিন্ন খোলের ইলেকট্রনেরা। মেণ্ডেলিফের তালিকার ২,৮,৮,১৮,৩২,১৮,৮ এরূপ বিভিন্ন সংখ্যার পরমাণুদের সাতটি পর্যায়ে সাজালে এক একটি পরিবারের পদার্থগুলির মধ্যে একটা বিশেষ ঐক্য দেখা যায় (পর্যাবৃত্ত তালিকা দ্রষ্টব্য), কারণ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন পথের কক্ষপথ, এমনিতর কমবেশি বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রনের সাতটি স্তরে বা খোলে সাজান রয়েছে (ইলেকট্রন খোল দ্রষ্টব্য)। পরমাণুর সংগঠনে সব চেয়ে বাইরের স্তরে বা খোলে যে ইলেকট্রন আছে তার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি, মৈত্রাংক এবং সংগী বাছাইয়ের পক্ষপাতিত্ব। মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রকার ভেদের জন্য দায়ী এই বাইরের ইলেকট্রনের। বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা যা হবে, তাই হবে মৌলিক পদার্থের মৈত্রাংক, অর্থাৎ অন্য পদার্থ পরমাণুর ক'টির সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে অণুসংগঠন করতে পারবে তার নির্দেশক হবে বাইরের খোলের ইলেকট্রনের সংখ্যা।

রাসায়নিক ক্রিয়া এবং অণু-গঠন

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুরা বেছে বেছে সংগী নির্বাচন ক'রে কেন অণুরূপে জোট বাঁধে তার কারণ প্রথম নির্দেশ করেছেন বিজ্ঞানী নিল্‌স্‌বোর। মেণ্ডেলিফের তালিকার পর্যায়ের সংগে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু সংগঠনে ছয়টি স্তরে ইলেকট্রনের খোল রচনার সম্বন্ধ স্থাপনও করেন তিনি। বোরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল পদার্থ পরমাণুতে ২, ১০, ১৮, ৩৬, ৫৪ বা ৮৬ সংখ্যার ইলেক্‌ট্রন রয়েছে সেই পদার্থের আভ্যন্তরীণ সুস্থিরতা বিশেষ রকম অসাধারণ। এই অসাধারণ পদার্থদের নাম হ'ল হিলিয়াম, নিয়ন, আরগণ, ক্রিপটন, জিনন, রেডন, এরা সবাই গ্যাসীয় এবং মেণ্ডেলিফের তালিকার উদাসী পরিবারে রয়েছে এদের স্থান। এদের নাম উদাসী দেওয়া হয়েছে এইজন্যে, যে উদাসী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মত সকল অবস্থায়ই এরা থাকে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। মুহূর্তের জন্যও অন্য কোন পদার্থের

সংগে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, অণুরূপে কারো সংগেই জোট বাঁধে না, চিরকাল থাকে সংগ-নিস্পৃহ। উদাসী গ্যাসীয় পদার্থগুলি কেন এরূপ সংগ-নিস্পৃহ? কারণ এদের পরমাণুর অভ্যন্তরে বিভিন্নস্তরে যে সব ইলেকট্রন খোল রয়েছে সেগুলিতে একটি আসনও ফাঁকা নেই। এক একটি খোলের পিঠে যে কয়টি ইলেকট্রন কক্ষ ধারণ করবার ক্ষমতা আছে পরমাণুর, তা'র সব কয়টি সংখ্যাই পুরো হ'য়ে গেছে। বাইরের খোলে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা পুরো না হ'য়ে যদি একটিও কম হ'ত তা' হ'লেও এরা অন্য মৌলিক পদার্থের সংগে মিতালী ক'রে জোট পাকাতে পারত।

নিয়নের পরমাণুতে র'য়েছে দু'টি ইলেকট্রনের খোল। প্রথম খোলে র'য়েছে দু'টি ইলেকট্রন এবং দ্বিতীয় খোলে আটটি। ইলেকট্রনের সংখ্যা তাই পুরো হ'য়ে গেছে দু'টি খোলেই, একটি আসনও খালি নেই। নিয়ন তাই কারো সংগে জোট পাকাতে পারে না।

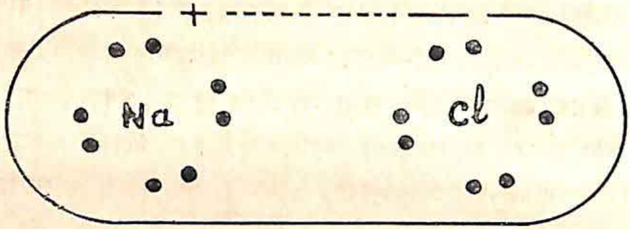
নিল্‌স্‌বোরের মতে যে কোন পদার্থপরমাণুর সব চেয়ে বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কোন ক্রমেই আটটির বেশি হ'তে পারে না এবং যেই বাইরের খোলের ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটি পর্যন্ত পুরো হ'ল অমনি পাওয়া গেল একটি উদাসী মৌলিক পদার্থ পরমাণু। ক্লোরিণের বাইরের খোলে আছে সাতটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের সংখ্যা আর একটি বাড়লেই পাওয়া যাবে স্থস্থির উদাসী পদার্থ আরগন। বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটির কম হ'লে মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই সব সময়েই একটা চঞ্চলতা দেখা যায়। এবং সকল পদার্থই যে-কোন ভাবে ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটিতে পুরো ক'রে উদাসী পদার্থের মত খাঁটি স্থস্থির হয়ে থাকবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে। এই ব্যগ্রতার জন্য বাইরের খোলের ইলেকট্রনগুলি ঝেড়ে ফেলে দিতে বা অন্য কোন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন কেড়ে নিয়ে আটটি সংখ্যা পুরো ক'রে ফেলতে দ্বিধা বোধ করে না। সোডিয়ামের পরমাণুতে আছে তিনটি খোল, বাইরের খোলে আছে মাত্র একটি ইলেকট্রন। সোডিয়াম এই একটি ইলেকট্রন কেড়ে ফেলে দিয়ে নিয়নের মত (নিয়নের ভিতরের খোলে আছে দু'টি, বাইরের খোলে আছে আটটি ইলেকট্রন) বাইরের খোলে আটটি ইলেকট্রন নিয়ে স্থস্থির হবার জন্য সদা ব্যস্ত হ'য়ে থাকে। তেমনি গন্ধকের বাইরের খোলে আছে ছ'টি ইলেকট্রন আর দু'টি ইলেকট্রন পেলেই গন্ধকের বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটিতে পুরো হ'য়ে আরগণের মত স্থস্থির হ'তে পারে। গন্ধক তাই

সুযোগ পেলেই অন্য পদার্থ থেকে এই দু'টি ইলেকট্রন কেড়ে নেয় [তালিকা দ্রষ্টব্য—একমাত্র হাইড্রোজেন ও নিয়নের পরমাণুতে রয়েছে মাত্র দু'টি ইলেকট্রনের একটি খোল। তাই প্রথম পর্যায়ের পদার্থ লিথিয়াম, বেরিলিয়াম বা বোরন যদি নিজেদের বাইরের খোল থেকে ইলেকট্রন ঝেড়ে ফেলে দেয় তা'হ'লে তাদের বাইরের খোলে থাকে মাত্র দু'টি ইলেকট্রন কিন্তু যেহেতু উদাসী পদার্থ নিয়নের খোলেও মাত্র দু'টি ইলেকট্রন আছে তাই এই রূপান্তরিত পদার্থগুলিও নিয়নের মতই সুস্থির হ'য়ে থাকতে প্রয়াস পায়।]

বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটিতে পুরো করবার দিকে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের যে ঝোঁক দেখা যায় সে ঝোঁকের মধ্যেই লুকান রয়েছে পদার্থদের পরস্পর মিলে মিশে 'অণু'রূপে জোট বাঁধবার রহস্য। সোডিয়ামের পরমাণুতে আছে এগারটি ইলেকট্রন ও এগারটি প্রোটন, অর্থাৎ এগারটি পজিটিভ রেণু এবং এগারটি ইলেকট্রনের মধ্যে সব চেয়ে বাইরের খোলে আছে মাত্র একটি ইলেকট্রন। সোডিয়াম সুযোগ পেলেই ইলেকট্রনটি ঝেড়ে ফেলে দেয়। ফলে সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা দাঁড়ায় দশটি কিন্তু যেহেতু পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ রেণুর সংখ্যা র'য়েছে এগারটি তাই একটি পজিটিভ রেণু সোডিয়াম পরমাণুতে উদবৃত্ত থেকে যায়। এবং বাস্তবিক সোডিয়াম পরমাণুতে এমন একটি পজিটিভ রেণুর লক্ষণও দেখা যায়।

পক্ষান্তরে ক্লোরিণের কথা ধরা যাক। ক্লোরিণের পরমাণুতে রয়েছে ১৭টি ইলেকট্রন এবং ১৭টি প্রোটন অর্থাৎ পজিটিভ রেণু। এবং বাইরের খোলে আছে ৭টি ইলেকট্রন। আর একটি ইলেকট্রন পেলেই বাইরের খোলে হবে আটটি ইলেকট্রন। তাই ক্লোরিণ পরমাণু সব সময় চেষ্টায় থাকে কোন উপায়ে একটি ইলেকট্রন কেড়ে আনা যায় কিনা। কিন্তু আর একটি ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়লেই পরমাণুর পজিটিভ রেণুর সংখ্যা থেকে এক রেণুর নেগেটিভ বিদ্যুতের সংখ্যা যায় বেড়ে (কারণ ইলেকট্রন তো নেগেটিভ্ বিদ্যুৎকণা ছাড়া আর কিছুই নয়)। ফলে সমস্ত ক্লোরিণ পরমাণুতে দেখা দেয় একটি নেগেটিভ রেণুর লক্ষণ। সুতরাং দেখা যায় যে পদার্থ বাইরের খোল থেকে ইলেকট্রন ঝেড়ে ফেলে দেয় তার মধ্যে দেখা দেয় উদবৃত্ত পজিটিভ বিদ্যুতের লক্ষণ এবং যে পদার্থ ইলেকট্রন কেড়ে নেয় তার গায়ে দেখা দেয় উদবৃত্ত নেগেটিভ বিদ্যুতের লক্ষণ। এখন কোন উপায়ে যদি একটি ক্লোরিণ পরমাণু একটি সোডিয়াম পরমাণুর সংস্পর্শে আসে, তা' হ'লে সোডিয়াম

পরমাণু যে ইলেকট্রনটি বর্জন করতে চায় ক্লোরিণ পরমাণু তা লুফে নেয় পরম আগ্রহে। এই দেওয়া নেওয়ার ফলে সোডিয়ামে জ'মে ওঠে এককণা উদবৃত্ত পজিটিভ রেণু এবং ক্লোরিণেও জমে ওঠে সমপরিমাণের এককণা নেগেটিভ রেণু। এই উদবৃত্ত পজিটিভ ও নেগেটিভ রেণুরা পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে এবং সোডিয়াম ও ক্লোরিণ পরমাণু পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে লবণ



লবণ অণু

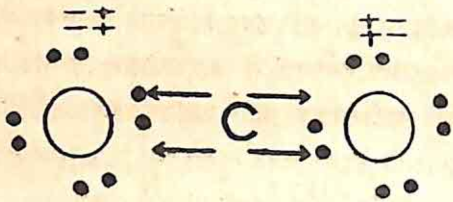
(NaCl) অণু গ'ড়ে তোলে। প্রথম পরিবারের এবং সপ্তম পরিবারের সকল পদার্থই ইলেকট্রন দেওয়া নেওয়ার বেলায় সোডিয়াম ও ক্লোরিণের মত ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় পরিবারের চূণ বা ক্যালসিয়াম এবং ষষ্ঠ পরিবারের অক্সিজেনের মিলনে কিভাবে পোড়া চূণ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) অণু গঠিত হয়—তার কথাই ধরা যাক। চূণের পরমাণুতে আছে ২০টি ইলেকট্রন ও ২০টি প্রোটন, এর মধ্যে বাইরের খোলে আছে মাত্র দু'টি ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রন দু'টি চূণের পরমাণু ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চূণের পরমাণুতে দু'টি উদবৃত্ত পজিটিভ রেণু সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে অক্সিজেনের পরমাণুতে আছে মোট আটটি প্রোটন এবং আটটি ইলেকট্রন। তার মধ্যে বাইরের খোলে আছে ছ'টি ইলেকট্রন। আর ছ'টি ইলেকট্রন পেলে অক্সিজেনের বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা পুরো আটটি হয় এবং সংগে অক্সিজেনের পরমাণুতে দু'টি নেগেটিভ রেণু জমে ওঠে অক্সিজেনের গায়। সুতরাং চূণ অকসিজেনের সংস্পর্শে এলে বা বাতাসে চূণ পোড়ালে, চূণের ইলেকট্রন দু'টি ক্ষুধিত অক্সিজেন কেড়ে নেয়। কিন্তু সংগে সংগে উভয়ের গায় যে দুইকণা পরিমাণ উদবৃত্ত পজিটিভ ও নেগেটিভ রেণু জমে ওঠে তারা চূণ ও অক্সিজেন পরমাণু দুটিকে পরস্পরে আকর্ষণ ক'রে মিলিয়ে দিয়ে একটি একাংগ ক্যালসিয়াম অক্সাইড অণুর সৃষ্টি করে।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিবারের পদার্থদের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই দুই পরিবারের মৌলিক পদার্থ পরমাণুরা বাইরের খোলের ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে বর্জনও করতে পারে। কখন বর্জন করবে আর কখন গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে যার সংগে মিতালী পাতাবে তার স্বভাবের ওপর। যদি অক্‌সিজেনের সংগে 'অণু'রূপে জোটবাঁধে তাহ'লে ইলেকট্রন ছুড়ে ফেলে দেয় বাইরের খোল থেকে। হাইড্রোজেনের সংগে মিলনাবদ্ধ হলে ইলেকট্রন কেড়ে নিয়ে নিজের বাইরের খোলের ইলেকট্রনের সংখ্যা আটটিতে পূরণ করে। তাই চতুর্থ ও পঞ্চম পরিবারের পদার্থগুলি অনেকেই দু' ভাবে যৌগিক অণু গড়ে তুলতে পারে। চতুর্থ পরিবারের কারবনের কথাই ধরা যাক্। কারবন হাইড্রোজেনের সংগে মিলে মিথেন অণু গঠন করে। মিথেন অণু হঠাৎ বাতাসের সংগে মিলে জলে ওঠে ব'লে আলেয়ার সৃষ্টি করে। সেই কারবন অণু আবার অক্‌সিজেনের সংগে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কারবন-ডাই-অক্‌সাইডও গড়ে তুলতে পারে। কারবন পরমাণুতে আছে ৬টি ইলেকট্রন ও ৬টি প্রোটন। কিন্তু বাইয়ের খালে আছে মাত্র ৪টি ইলেকট্রন। কারবন এই চারটি ইলেকট্রন ছুঁড়ে ফেলে দিলে অক্‌সিজেন এই ইলেকট্রন চারটিকে লুফে নেয়। কিন্তু একটি অক্‌সিজেন পরমাণু দুটির বেশি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে না। কারণ অক্‌সিজেনের বাইরের খোলে যে ৬টি ইলেকট্রন আছে তার সংগে দু'টি ইলেকট্রন এসে মিললেই ইলেকট্রনের সংখ্যা পূরা আটটি হয়ে যায়। সুতরাং একটি কারবন পরমাণু যে চারটি ইলেকট্রন বর্জন করে তা' গ্রহণ করবার জন্য দু'টি অক্‌সিজেন পরমাণুর দরকার। চারটি ইলেকট্রন বর্জন করার ফলে কারবন পরমাণুতে চারটি উদবৃত্ত পজিটিভ বিদ্যুত রেণু দেখা দেয়। কিন্তু দু'টি দু'টি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করবার ফলে এক একটি অক্‌সিজেন পরমাণুতে দেখা দেয় মাত্র দু'টি উদবৃত্ত নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু। তাই কারবনের চা'রটি পজিটিভ বিদ্যুৎরেণুর সংগে দু'টি অক্‌সিজেন পরমাণুর চা'রটি নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু এসে মিলে। ফলে একটি কারবন-ডাই-অকসাইড অণুর সৃষ্টি হয়।

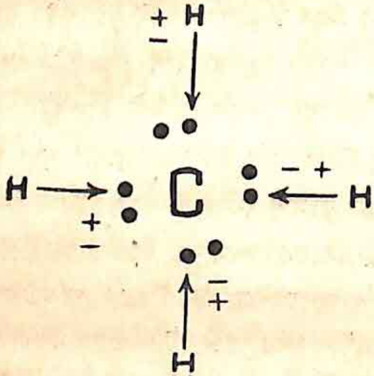
[O = অক্‌সিজেন, C = কারবন, ∘ = ইলেকট্রন, + = পজিটিভ রেণু, – = নেগেটিভ রেণু। এরূপ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে কারবন-ডাই-অক্‌সাইড (Carbon dioxide) অণুর সাংকেতিক গঠন লিখা যায় নিম্নলিখিত ভাবে, কিন্তু কারবন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিতালী করলে নিজের ইলেকট্রনগুলি বর্জন

করে না বরং হাইড্রোজেন থেকে চারটি ইলেকট্রন কেড়ে নেয়। একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুতে আছে মাত্র একটি ইলেকট্রন তাই কারবনকে চারটি ইলেকট্রন দিতে হ'লে চারটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর প্রয়োজন। কিন্তু এবার চারটি



কারবন

ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে কারবনে চারটি নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু উদ্‌বৃত্ত হয় এবং হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বর্জনের ফলে পজিটিভ বিদ্যুৎরেণু উদ্‌বৃত্ত হয়। এবং এই বিরুদ্ধগুণে উদ্‌বৃত্ত বিদ্যুৎরেণুরা পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে একটি মিথেন অণু গঠন ক'রে তোলে। H যদি হয় হাইড্রোজেনের প্রতীক 'C' কারবনের প্রতীক তা'হ'লে মিথেন অণুকে সাংকেতিক ভাবে লেখা যায়।



মিথেন

উদ্‌বৃত্ত বিদ্যুৎরেণু-সহ আয়ন গঠন না ক'রে এবং এইভাবে ইলেকট্রন আদান-প্রদান না ক'রেও আর একভাবে অণু সংগঠন করতে পারে পদার্থ পরমাণুরা—বিশেষ ক'রে মৌলিক অণু সংগঠনের বেলায়। একজাতের দুটি পরমাণু যদি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে যায় তা'হ'লে এক জোড়া ইলেকট্রন দু'টি পরমাণুই সমানভাবে উপভোগ করবার সুযোগ পায়—নিছক নিজস্ব ভাবে ইলেকট্রন যুগলের উপর দাবী কারোরই নেই, অথচ সমবেত ভাবে প্রত্যেক টি

পরমাণুরই সমান দাবী ইলেকট্রনদ্বয়ের ওপর। একটি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর খুব কাছে আসে তা'হ'লে হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয়ের ইলেকট্রন দু'টি একটি জোড় বাঁধে। হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটনের পজিটিভ বিদ্যুৎরেণু দু'টি তখন ইলেকট্রন যুগলের নেগেটিভ বিদ্যুৎ-রেণু দু'টিকে আকর্ষণ করে, ফলে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি মৌলিক অণুতে সংযুক্ত হয়। সাংকেতিক ভাবে হাইড্রোজেনের মৌলিক অণুকে লেখা

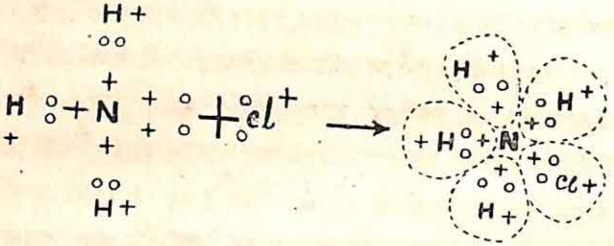
$$H\,(+):(+)\,H$$

যায়—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, ব্রমিন ইত্যাদিও এমন ভাবে মৌলিক অণু সংগঠন করতে পারে। এমনি ভাবে গন্ধকের অণুতে আটটি, ফসফরাসের এবং আরসেনিকের চা'রটি, কারবনের বারটি পরমাণু নিয়ে এক একটি মৌলিক অণু গ'ড়ে তুলতে পারে। অংগার এবং হীরা একই পদার্থ কারবন হয়েও আশ্চর্য রকম পার্থক্য দেখানর মূলে রয়েছে এমন ভাবে বিভিন্ন সংখ্যার পরমাণু নিয়ে মৌলিক অণু সংগঠনের উপর।

একজাতের পরমাণু না হ'য়ে বিভিন্ন জাতের পরমাণুরাও ইলেকট্রনদ্বয়কে সমানভাবে উপভোগ ক'রে অণু সংগঠন করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এ্যামোনিয়ার কথাই ধরা যাক্। এ্যামোনিয়া সংগঠিত হয় একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হ'য়ে। নাইট্রোজেন পরমাণুর বাইরের খোলে আছে পাঁচটি ইলেকট্রন। নাইট্রোজেনের তিনটি ইলেকট্রন, হাইড্রোজেনের তিনটি ইলেকট্রনের সঙ্গে তিনজোড়া ইলেকট্রন গড়ে তোলে। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু সমান ভাবে এই তিনজোড় ইলেকট্রনকে উপভোগ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর তিনটি পজিটিভ বিদ্যুৎরেণু এবং নাইট্রোজেনের তিনটি পজিটিভ রেণুকে আকর্ষণ ক'রে এ্যামোনিয়া অণু সংগঠিত হয়। কিন্তু নাইট্রোজেনের পরমাণুতে রয়েছে পাঁচটি উদ্বৃত্ত পজিটিভ রেণু এবং এই পাঁচটির তিনটি মাত্র আবদ্ধ হ'ল তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে, কিন্তু বাকী রয়ে গেল দু'টি। তাই সুযোগ পেলেই এ্যামোনিয়া অন্য পদার্থ থেকে দুটি ইলেকট্রন সংগ্রহ ক'রে জটিল অণু সংগঠন করে। সাংকেতিক ভাবে এ্যামোনিয়া এবং ক্লোরিণের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ অণুর সংগঠন দেখান হ'ল।

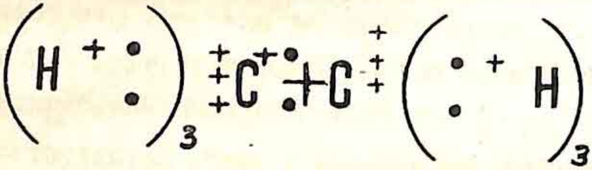
জৈব পদার্থের অণুতে যে কারবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

পরমাণু আছে তারা প্রত্যেকে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রনের সমান ভাগীদার হয়ে অর্থাৎ জোড় বাঁধা ইলেকট্রনদ্বয়কে সমান ভাগে উপভোগ ক'রে গ'ড়ে তুলেছে বিশিষ্ট এবং স্থিতিশীল অণুগুলি। জৈব পদার্থের অজস্র প্রকার



এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

অণুগুলি এমনি ইলেকট্রন জোড়ের প্রথায় সংঘবদ্ধ এবং এরূপ প্রথায় জৈব পদার্থের অণুর অভ্যন্তরস্থ পরমাণুগুলি সংঘবদ্ধ ব'লেই জৈব পদার্থগুলি স্থায়িত্বে এত পাকা। উদাহরণ স্বরূপ ইথেনের সাংকেতিক সংগঠন লেখা যায় এই ভাবে—



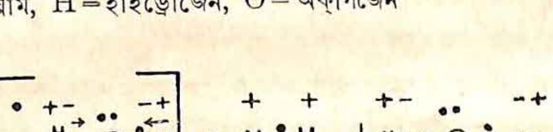
ইথেন অণু

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রথা

পদার্থ-পরমাণুর মৌলিক সংগঠন থেকে অজস্র প্রকারের অণু সংগঠনের মূল কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হ'ল। প্রতিনিয়ত পদার্থ পরমাণুর সমাজে যে ভাংগাগড়ার লীলা চ'লছে—পুরানো অণু ভাংগছে নতুন অণু গড়ছে—ত'ার মূলে রয়েছে পরমাণুর বাইরের খোলের ইলেকট্রন কণাগুলির কর্তৃত্ব। পদার্থ-পরমাণুরা নিজেদের ইলেকট্রন পরস্পরে গ্রহণ বর্জন ক'রে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ-রেণু সৃষ্টি করছে। এবং এই উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎরেণুরা বিরুদ্ধধর্মী হওয়ায় পরমাণুদের অণুরূপে আবদ্ধ ক'রে রাখছে। আবার অনেক পদার্থ-অণু এমনি ভাবে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন না ক'রে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রনের সমভাগী হ'য়ে অর্থাৎ সমানভাবে উপভোগ ক'রেও গড়ে তুলছে অণুরূপী পরমাণুর সংঘ।

বাতাসে তেলের প্রদীপ জ্বলে, মোম বাতি আলো দেয়, আগুনে কাঠ পোড়ে—আবার কতপ্রকার জৈব পদার্থ মানুষের জঠরে ফুসফুস-বহা বাতাসের সাহায্যে হজম হয়ে যায়। পদার্থের এরূপ সব বিচিত্র রূপান্তরে সাধারণ মানুষেরা হয়ত অবাক হয়। কিন্তু বিজ্ঞানী দেখেন, এতে শুধু ইলেকট্রন আদানপ্রদানের ফলে পুরানো অণু ভেংগে নতুন অণু গঠনের খেলা। এই কয়টি ব্যাপারেই দাহ্য পদার্থের কারবন নিজের বাইরের ইলেকট্রনগুলি অক্সিজেনকে দক্ষিণা দিয়ে কারবন ডাইঅক্সাইড বা অন্য কোন নতুন অণু সংগঠন করে। তেমনি লোহার গায়ে যে মরিচা পড়তে দেখা যায় তা' আর কিছুই নয় বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে লোহার পরমাণু বাইরের খোলের ইলেকট্রনগুলি পুরস্কার দিয়ে অক্সিজেন পরমাণুর সংগে লোহার অক্সাইড অণুরূপে জোট বাঁধে। জলের মধ্যে সোডিয়াম ধাতু ফেলে দিলে জল দু'টি হাইড্রোজেন অণু এক জোড়া ইলেকট্রনকে সমান জোরে আঁকড়ে ধরে হাইড্রোজেনের মৌলিক অণুরূপে উড়ে বেরিয়ে যায় আকাশে এবং সংগে সংগে যে অক্সিজেন পরমাণুর সৃষ্টি হয় জল থেকে সেই অক্সিজেন পরমাণু সোডিয়ামের বাইরের খোলের ইলেকট্রনটিকে এবং নবসৃষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর ভিড় থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনটিকে কেড়ে নিয়ে নিজের বাইরের খোলের আটটি ইলেকট্রন পুরো করে তোলে। এবং সংগে সংগে সোডিয়াম, হাইড্রোজেনে যে উদ্‌বৃত্ত পজিটিভ বিদ্যুৎ-রেণু এবং অক্সিজেনে যে নেগেটিভ বিদ্যুৎরেণু সৃষ্টি হ'ল তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে একটি অক্সিজেন, একটি হাইড্রোজেন ও একটি সোডিয়াম পরমাণু নিয়ে একটি ক্ষার বা কষ্টিক সোডা অণু গ'ড়ে তোলে। সাংকেতিক ভাবে ক্ষার অণু গঠনের নকসা লেখা যায়—

Na = সোডিয়াম, H = হাইড্রোজেন, O = অক্সিজেন



পদার্থে পদার্থে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংগঠনের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় উত্তাপ, আলো বা এমনিতর কিছু দিয়ে বাইরে থেকে একটু উসকানি দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ পদার্থেরা সাধারণ অবস্থায় থাকে অণুরূপে। এবং বাইরের এই

উসকানি পেয়ে অণুগুলি পরমাণুরূপে প্রথমে ভেংগে গিয়ে পুরানো অণুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই মুক্ত অবস্থায় পরমাণুরা অত্যন্ত কর্মচাঞ্চল্য দেখায় এবং ইলেকট্রনের জোড় বেঁধে অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন ক'রে নতুন অণু সংগঠনের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যেই নতুন অণুরূপে নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। জল থেকে নবসৃষ্ট তাজা হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির কর্মক্ষমতা তাই এত উগ্র হ'তে দেখা যায়।

কোন পদার্থ যদি জলে গোলা থাকে তবে সাধারণত আপনা থেকেই পদার্থ-অণুটি ভেংগে যায় এবং বিভক্ত অংশে উদ্‌বৃত্ত বিদ্যুৎরেণুর লক্ষণ দেখা যায়। তাই দ্রব বা গোলা অবস্থায়ও বাইরের কোন উসকানীর বড় প্রয়োজন পড়ে না। আপনা থেকে গোলা পদার্থরা কর্মব্যগ্র হয়ে থাকে। গোলা সিলভার নাইট্রেটের সংগে গোলা লবণ মেশালে, সিলভার নাইট্রেটের সিলভার এবং লবণের ক্লোরিণ একত্র হয়ে নতুন সিলভার ক্লোরাইড অণু গঠন করে এবং এই সিলভার ক্লোরাইড জলে গলে না বলে সাদা সাদা পদার্থরূপে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অপর নবগঠিত অণু সোডিয়াম নাইট্রেট বা সোরা জলেই গোলা অবস্থায় থেকে যায়।

এখানে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যদি ইলেকট্রনের আদানপ্রদানের ফলে নতুন নতুন অণু সংগঠন সম্ভব হয় তা'হলে তো এক পরমাণু থেকে আর এক পরমাণুতে ইলেকট্রন চলাচলের সময় বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া উচিত। কারণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তো ইলেকট্রনের চলাচল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন চলাচলের ফলে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নিয়ে ভলটামিটার নামক ব্যাটারী এবং পরমাণবিক অবস্থার অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে তড়িৎদার রূপে কাজে লাগিয়ে গ্যাস ব্যাটারী বানান সম্ভব হয়েছে।

তথ্যের অপূর্ণতা

ইলেকট্রনকে কেন্দ্র ক'রে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূল কারণ নির্ণয়ের চেষ্টার ভিত্তিতেই কিন্তু এখনো অনুদ্ঘাটিত বিরাট রহস্য রয়ে গেছে। কোন পদার্থ পরমাণু ইলেকট্রন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বা ইলেকট্রন কেড়ে নিয়ে বাইরের খোলে ইলেকট্রন অষ্টক গড়ে তোলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে এবং কেন উদাসী মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি এরূপ অসাধারণ স্থায়িত্ব দেখায়, কেন তারা অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সংগে মিলনাবদ্ধ হ'তে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখায় তার যথাযথ কারণ নির্ণয় করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। বাস্তবক্ষেত্রে

উদাসী পদার্থদের এরূপ সব সময়েই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, বিজ্ঞানীদের শুধু এইটুকুই জানা আছে।

অপূর্ণতা আরো রয়েছে। শুধুমাত্র যে বাইরের খোলের ইলেট্রনেরাই অণুবন্ধনের জন্য দায়ী তা' নয়। অষ্টম পরিবারের পদার্থগুলি অর্থাৎ লোহা, কোবল্ট, নিকেল ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি এবং ১৬টি বিরলমাটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ঐক্য দেখা যায়। এই ঐক্য দেখে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে এদের প্রত্যেকের বাইরের খোলে হয়ত হুবহু সমান সংখ্যার ইলেকট্রন রয়েছে। কিন্তু এদের পরমাণুতে তো প্রোটনের সংখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থতরাং এদের বাইরের খোলে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান হবে কি করে? ঐ প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন হয়ত এই বাড়তি ইলেকট্রনগুলি কোন মতে ভিতরকার ইলেকট্রন খোলে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই ক'রে নেয়। তাই এই সব মৌলিক পদার্থেই বাইরের খোলে সমান সংখ্যার ইলেকট্রন থাকে এবং পদার্থেরা একরকম প্রকৃতির পরিচয় দেয়।

তারপর কোন কোন মৌলিক পদার্থ যে কেন সংগী নির্বাচনে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখায় তার কারণ বলাও শক্ত। লবণ জলের সংগে সিলভার নাইট্রেট গোলা জল মিশালে দেখা যায় সোডিয়াম পরমাণু লবণ অণুকে ত্যাগ করে সিলভার নাইট্রেট অণুর নাইট্রেট অংশের সংগে মিশে গিয়ে নতুন সোডিয়াম নাইট্রেট অণু গঠন করে। আবার সিলভার—অর্থাৎ রূপার পরমাণু লবণের অণু ক্লোরিণের সংগে মিশে সিলভার ক্লোরাইড অণু গঠন করে।

সিলভার নাইট্রেট + সোডিয়াম ক্লোরাইড—

$$AgNO_3 + NaCl$$

সিলভার ক্লোরাইড + সোডিয়াম নাইট্রেট

$$AgCl + NaNO_3$$

কিন্তু পরমাণুরা কেন এরূপ সংগী অদলবদল করে, কেন এক সংগীকে ত্যাগ ক'রে আর এক সংগীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখায়? এর সন্তোষজনক কোন জবাবই মেলেনি এখনও।

অণু সংগঠনে আরো অনেক বিশেষত্ব দেখা যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। অনেক জৈব পদার্থের অণু সমজাতের অণুর সংগে বহু সংখ্যায় মিলে এমন এক প্রকার সম্মিলিত পদার্থের সৃষ্টি করে যে তাদের সমষ্টির বাইরের চেহারা এবং

গুণাগুণ দেখে মনে হয় যেন কোন নতুন জৈব অণু সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু আসলে সেই অণুগুলি একই জাতের বিভিন্ন অণুগুলির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কোটী জলের অণু এক সংগে মিশিয়ে যদি গরম করা যায় তা'হলে জল জলই থাকে, জলের অণুসমষ্টির কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু জৈব পদার্থ ফরমেলডিহাইডকে গরম করলে দেখা যাবে কিছু পরে জলীয় ফরমেলডিহাইড একরকম দানাদানা সাদা পাউডারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একটি ফরমেল-ডিহাইড অণুতে রয়েছে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু, একটি কারবন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। রূপান্তরিত দানাদার ফরমেলডিহাইডের অণুতেও পরমাণুগুলি এই সংখ্যার অনুপাতেই রয়েছে, কিন্তু ফরমেলডিহাইড অণুগুলি এক বিশেষ রকমে পরস্পরের সংগে সংযুক্ত হয়ে আছে বলেই জলীয় ফরমেল-ডিহাইড দানাদার সাদা ফরমেলডিহাইডে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় কেন ফরমেলডিহাইড অণুরা পরস্পর এমন সমষ্টিগতভাবে সংযুক্ত হয়—যে স্বভাব সাধারণত কোন যৌগিক অণুর মধ্যেই দেখা যায় না ? (আরো অনেক জৈবিক পদার্থের মধ্যে এরূপ স্বভাব দেখা যায়) পুরোপুরি যুক্তিসংগত উত্তর বলতে পারেন না বিজ্ঞানীরা।

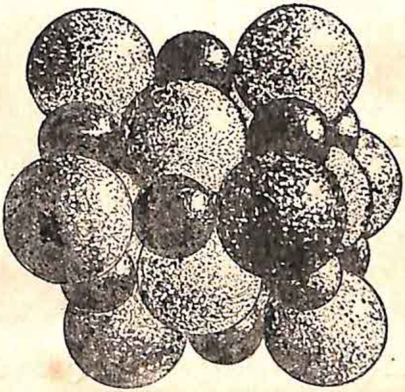
এমনিতর আরো কয়েকটি উদাহরণের কথা বলা যায় যাদের বেলায় যুক্ত অণুসংগঠনের কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না। সোডার অণুর সংগে তিনটি জলের অণু এসে জড়িয়ে থাকে কেন ?—অথচ জল আর সোডা মিলে তো কোন নতুন যৌগিক অণু সংগঠন করে না প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা অণু হিসাবে থাকে তবু কিসের আকর্ষণে পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকে ? ফিট্‌কিরির মধ্যে একটি এ্যালুমিনিয়াম সালফেট অণু, একটি পটাসিয়াম সালফেট অণু এবং ২৪টি জলের অণু পরস্পরে কিসের জোরে মিলেমিশে স্বচ্ছ ফিট্‌কিরির দানা গড়ে তুলেছে ? কি ক'রে প্রত্যেকটি পদার্থের অণু নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরস্পরে মিলে এক নতুন আপাতরূপান্তরিত পদার্থের অংশ হয়ে রয়েছে ? এমনিতর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সমন্বয়ে যে অজস্র প্রকার অণু সংগঠিত হয় তার সন্তোষজনক কারণ আজও বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করতে পারেননি।

বস্তুজগতে অজস্রভাবে কেন যে পদার্থের রূপান্তর হচ্ছে, কেন যে মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা পরস্পর মিলে কোটী কোটী অণু গড়ে তুলছে তার

কারণ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত না হ'লেও পদার্থ পরমাণুর মৌলিক সংগঠন থেকে পদার্থ জগতের অনেক রহস্যের আবরণই উদ্ঘাটিত করা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানাগারে।

পদার্থ অণু সংগঠনের আকৃতি

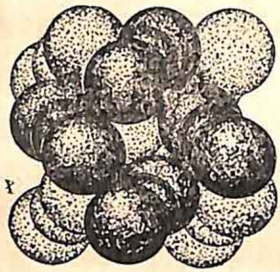
অণুর সংগঠনে বন্দী হয়েও পরমাণুরা সুস্থির হয়ে থাকে না। অবিরাম কোন না কোন বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে স্পন্দিত হতে থাকে। শুধু তাই নয় —বিভিন্ন পদার্থের অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুরা নানাপ্রকার বিশিষ্ট ঢঙে এবং বিচিত্র নক্সায় পরস্পরের স্থান সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। যার ফলে বিভিন্ন পদার্থ অণুর সংগঠন বিভিন্ন আকৃতিতে গড়ে ওঠে। অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুরা সবাই সব সময় এক সমতল ক্ষেত্রেও থাকে না। যৌগিক অণুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন পরমাণুর অবস্থান বিভিন্ন সমতল ক্ষেত্রে হতে পারে। জল-অণুর সাংকেতিক লিপি যদি লেখা যায় এবং যদি পদার্থ



একটি সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ অণুর চিত্রের একটি দিক দেখানো হয়েছে। বড় গোলক ক্লোরিণ পরমাণু এবং ছোট গোলক সোডিয়াম পরমাণুর চিত্র। অণুর মধ্যে বিভিন্ন পরমাণুগুলির পারস্পরিক অবস্থান ও সংগঠনের রূপ এই চিত্রে দেখানো হয়েছে।

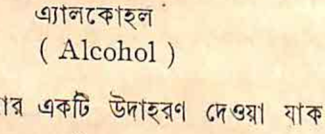
পরমাণুদের বৈদ্যুতিক আকর্ষণের জোরকে চিহ্নিত করা যায় "—" দিয়ে, তা'হ'লে জলের সাংগঠনিক লিপি লিখতে হবে H—O—H কিন্তু H—H—O নয়, অর্থাৎ জলের অণুতে অক্সিজেনকে মাঝে রেখে দু'পাশে রয়েছে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু।

অজৈব পদার্থে বিভিন্ন অণুর সাংগঠনিক আকৃতির বিশেষ কোন গুরুত্ব বোঝা যায় না। কিন্তু জৈব পদার্থের বেলায় পদার্থ অণুর সাংগঠনিক আকৃতি অত্যন্ত বিচিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি জৈব অণু সংগঠনে আকৃতি ভেদের জন্য জৈব পদার্থে বিশেষ রকম গুণাগুণ ও প্রকৃতি ভেদ হ'তেও দেখা যায়। শুধুমাত্র আকৃতির ভেদ ঘটিয়ে আটটি কারবন, বারটি

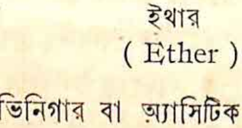


একটি কারবন-ডাই-অকসাইড অণুর চিত্র। চিত্রে কালো গোলক কারবন এবং অপেক্ষাকৃত সাদা গোলক অক্সিজেন পরমাণুরূপ আঁকা হয়েছে।

হাইড্রোজেন ও চারটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ও গুণের ৬৬টি জৈব অণু গড়ে তোলা যায়। মিথিল ইথার ও ইথিল এ্যালকোহল উভয় অণুতে রয়েছে দু'টি কারবন, ছ'টি হাইড্রোজেন ও একটিমাত্র অক্সিজেন অণু। বিভিন্ন পরমাণুর সংখ্যা এক হ'লেও এ্যালকোহল ও ইথার সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ইথার একটি গ্যাস কিন্তু এ্যালকোহল জলের মত তরল। অণুর সাংকেতিক লিপি লেখা যায়—



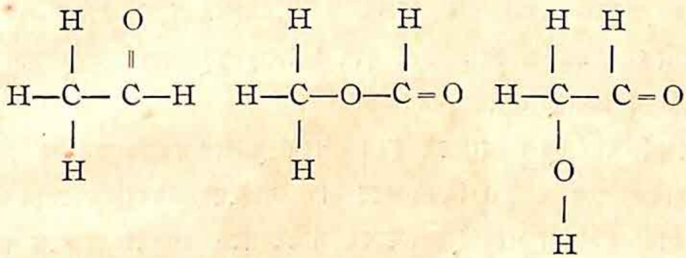
এ্যালকোহল
(Alcohol)



ইথার
(Ether)

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।—ভিনিগার বা অ্যাসিটিক এ্যাসিড, মিথিল ফরমেট, গ্লাইকল এ্যালডিহাইড অণুর প্রত্যেকটিই দু'টি কারবন, চারটি হাইড্রোজেন ও দু'টি অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, তথাপি প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। ভিনিগার স্বাদে

অম্ল এবং তরল। মিথিল তরল কিন্তু অতি সুগন্ধি। গ্লাইকল মিঠে মিঠে এবং দানাদার পদার্থ। সাংকেতিক লিপিতে এদের সংগঠনের নক্সা দেওয়া যাক্—



ভিনিগার　　মিথিল ফরমেট　　গ্লাইকল এ্যালডিহাইড
(Vinegar)　(Methyl formate)　(Glycol aldehyde)

(সাংকেতিক লিপিগুলিতে অণুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন পরমাণুরা কোন্ কোন্ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত তা দেখান হয়নি, পরমাণুদের পরস্পরের দূরত্ব দেখান হয়েছে মাত্র)

জৈব পদার্থের সমাজে অণুর সাংগঠনিক আকৃতি এবং অণুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমতল ক্ষেত্রে মৌলিক পরমাণুদের অবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে দেওয়া হয়। কারণ আকৃতি ও অবস্থানের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে কারবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। মাত্র এই চার রকম মৌলিক পদার্থ নিয়ে সহস্র সহস্র রকমের জৈব পদার্থ গড়ে উঠে জীব, জন্তু ও মাটি জলের পৃথিবীকে বিচিত্র বসুন্ধরায় রূপান্তরিত করেছে।

পরমাণুর রূপান্তর

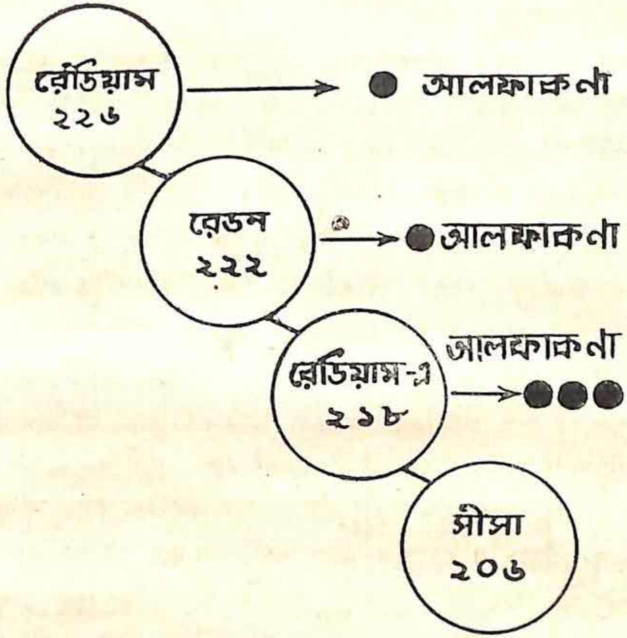
বস্তুজগতের যে রূপান্তরের কথা এ পর্যন্ত আলোচনা করা হ'ল তার মূলে রয়েছে পদার্থের পরমাণবিক রূপান্তর নয়, আণবিক রূপান্তর। পদার্থের বিচিত্র অণুপুঞ্জ বাইরের উসকানি পেয়ে ভেংগে যাচ্ছে পরমাণুরূপে। আবার পরক্ষণেই নতুন নতুন সংগী নির্বাচন ক'রে গড়ে তুলছে অজস্র ধারায় নতুন অণুপুঞ্জ। প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তন, জীবজন্তু উদ্ভিদের জীবন-মৃত্যু—সব কিছুই বিজ্ঞানীর চোখে পদার্থের আণবিক রূপান্তর মাত্র। বিরানব্বুইটি পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ দলে দলে জোট বাঁধছে। সে জোট ভাংগছে, নতুন

ক'রে আবার জোট বাঁধছে। চঞ্চল পদার্থ পরমাণুরা শুধু এ' অণু থেকে ও' অণুতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পদার্থের পরমাণবিক সত্তার কোন রূপান্তর হচ্ছেনা। পরমাণুর সংগঠন শক্তি ও ওজন রয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অটুট। সুতরাং দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যে রূপান্তরকে বলা হয় রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তার মূলে রয়েছে শুধু পদার্থ অণুর রূপান্তর, কিন্তু পদার্থ পরমাণুর রূপান্তর নয়।

পদার্থ পরমাণুরও রূপান্তর হয়। পরমাণুর রূপান্তর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপরে একটুও নির্ভর করে না। বাইরের উসকানির কোন ধারও ধারে না। বিজ্ঞানী পরমাণু রূপান্তরের গতিবেগকে বাড়াতে কমাতে পারেন না। এমন কি ভাংগনের পরিণতি থেকে পরমাণুকে অব্যাহতিও দিতে পারেন না। সব রকম বাধাবিপত্তি উপেক্ষা ক'রে যে সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা নিরন্তর অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে, বিজ্ঞানে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। (পদার্থের পরমাণবিক সংগঠন অধ্যায়ে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।)

রূপান্তরের পথে তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা নিজেরাই এসে না থামলে ওদের ভাংগনের পালা কোন ক্রমেই আটকানো যায় না। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ য়ুরেনাম নিজের পরমাণবিক কেন্দ্র থেকে তেজ বিকিরণ ক'রে ক'রে তেরটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরের পরে চৌদ্দ নম্বর রূপান্তরে নিজেই থামিয়ে দেয় আত্মঘাতী ভাংগনের পালা। এবং মৌলিক পদার্থ সীসারূপে সুস্থির হ'য়ে থাকে চিরকাল। আর ভাংগেনা কোনদিন। প্রকৃতিতেই স্বাভাবিক পদার্থরূপে মিলে এরূপ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। কিন্তু য়ুরেনাম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, এ্যাকটিনিয়াম ও রেডন ছাড়া বাকি সবগুলিই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 'সমঘর' পদার্থমাত্র। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের আরো বিশেষত্ব এই যে এরা সবাই জন্ম লাভ করে মাত্র তুটি আদি মৌলিক পদার্থ য়ুরেনাম ও থোরিয়াম থেকে। এই পদার্থ তুটি পর পর ভেংগে নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে, নবসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা আবার ক্রমাগত নিজেদের ভেংগে নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের ভাংগনের পালা অব্যাহত রাখে। য়ুরেনাম ভেংগে পর পর তুটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার পর তুটি তেজস্ক্রিয় সারিতে ভাগ হয়ে যায়। একটি যায় রেডিয়ামের লাইনে এবং পর পর রেডন, রেডিয়াম, এ, বি, সি, ডি, ই, এফ্, জি ইত্যাদি

মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে স্থায়ী মৌলিক পদার্থ সীসায় পরিণত হয়। তেমনি আর একটি যায় এ্যাকৃটিনিয়ামের লাইনে এবং এমনিতর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে পর পর রূপান্তরিত হয়ে সীসায় গিয়ে স্থায়ী হয়ে সুস্থিরতা লাভ করে। য়ুরেনাম থেকে সৃষ্ট হওয়া কি রেডিয়াম, কি এ্যাকটিনিয়াম সারি বা কি থোরিয়াম সারি সব কয়টি তেজস্ক্রিয় পদার্থই পর পর ভেংগে গিয়ে অন্তিম



রেডিয়াম পরমাণু ভেংগে ভেংগে সীসা পরমাণুতে রূপান্তরিত হবার সময় আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরিত করছে

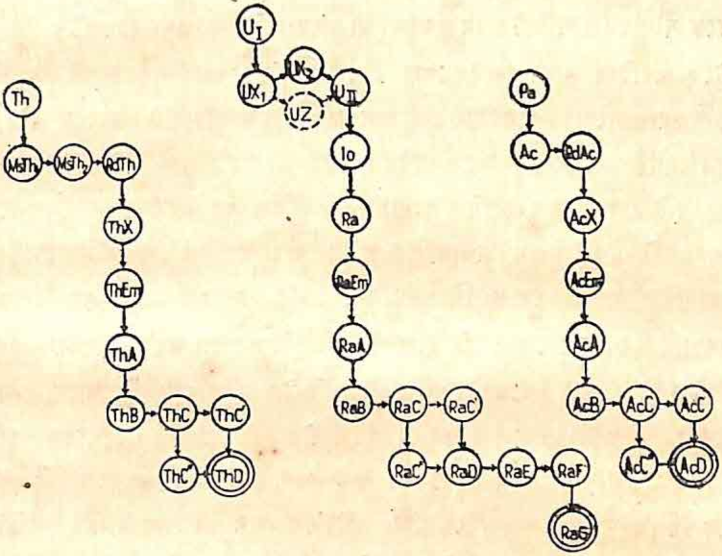
স্থায়িত্ব লাভ করে মৌলিক পদার্থ সীসা রূপে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া সীসা প্রকৃতিতে পাওয়া স্বাভাবিক সীসার সমঘর। তাই এদের পরমাণবিক ওজনে প্রাকৃতিক সীসার সংগে অমিল রয়েছে। কিন্তু গুণে ও প্রকৃতিতে স্বাভাবিক সীসা এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া সীসার মধ্যে কোন প্রভেদই নেই।

তেজস্করণের প্রকৃতি

তিনটি তেজস্ক্রিয় সিরিজের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ শুধুমাত্র রেডিয়াম সিরিজের পরপর রূপান্তরিত পদার্থগুলির বিবরণ দেওয়া হ'ল।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ	প্রোটন সংখ্যা	বিচ্ছুরিত রশ্মি	অর্দ্ধ আয়ুকাল	আণবিক ওজন
রেডিয়াম	৮৮	আলফা+বিটা +গামা	১৫৮০ বৎসর	২২৬
রেডন	৮৬	আলফা	৪ দিন	২২২
রেডিয়াম-এ	৮৪	আলফা	৩ মিনিট	২১৮
রেডিয়াম-বি	৮২	বিটা+গামা	২৭ মিনিট	২১৪
রেডিয়াম-সি	৮৩	আলফা+ বিটা+গামা	২০ মিনিট	২১৪
রেডিয়াম-সি	৮৪	আলফা	১ সেকেণ্ড	২১৪
রেডিয়াম-সি″	৮১	বিটা+গামা	এক মিনিট	২১০
রেডিয়াম-ডি	৮২	বিটা+গামা	১৬ বৎসর	২১০
রেডিয়াম-ই	৮৩	বিটা+গামা	৫ দিন	২১০
পোলোনিয়াম	৮৪	আলফা	১৩৫ দিন	২১০
সীসা	৮২		চিরস্থায়ী	২০৬

তেজক্রিয় পদার্থ পরমাণুরা কম ওজনের মৌলিক পদার্থ পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় কেন? কারণ, পরমাণুকেন্দ্রে যে পজিটিভ বিদ্যুৎকণা আছে তেজক্রিয় পদার্থেরা অবিরাম তাই বিচ্ছুরিত ক'রে ছিটকে ফেলে দেয় বাইরে। পজিটিভ বিদ্যুৎকণাগুলি কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে এলে উদ্বৃত্ত ইলেকট্রনগুলিও আর থাকতে পারে না পরমাণু-মহলে। তাই



(ক) (খ) (গ)

উপর থেকে নিচে আলফা কণার বিচ্ছুরণ ; এক পাশ থেকে অপর পাশে বিটা কণার বিচ্ছুরণ ;
(ক) থোরিয়াম সিরিজ (খ) য়ুরেনাম সিরিজ (গ) প্রটোঅ্যাক্টিনিয়াম সিরিজ ;
সব কয়টি পরমাণু সিরিজ তেজস্করণ ক'রে ক'রে বিভিন্ন পরমাণুতে রূপান্তরিত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত সীসা পরমাণুতে রূপান্তরিত হ'য়ে তেজস্করণ বন্ধ করছে। পরমাণুগুলি যখন উপর থেকে নিচের দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন আলফা কণা বিচ্ছুরণ করছে। আর একপাশ থেকে অপর পাশে রূপান্তরের সময় বিটাকণা বিচ্ছুরণ করছে।

পজিটিভ কণার সংগে ইলেকট্রনও বেরিয়ে আসে পরমাণু মহল থেকে। সমপরিমাণ পজিটিভ ও নেগেটিভ কণার সংখ্যার ওপর মৌলিক পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে। তাই বিচ্ছুরণের ফলে মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা কমে যায় এবং সংগে সংগে মৌলিক পদার্থও রূপান্তরিত হয়ে যায় আর একটি নতুন মৌলিক পদার্থে। রেডিয়াম কেন্দ্র

থেকে একজোটে দুটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। ফলে রেডিয়াম রূপান্তরিত হয়ে যায় রেডনে। রেডিয়াম কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎ কণা আছে ৮৮টি। দু'টি কমে রেডনের কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টিতে। থোরিয়াম পরপর দশটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়। আদি পদার্থ থোরিয়ামের পরমাণুতে রয়েছে ৯০টি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা এবং এর আটটি ছিটকে গিয়ে থোরিয়াম রূপান্তরিত হয়েছে সীসায়। পজিটিভ বিদ্যুৎকণা না হ'য়ে যদি এক কণা নেগেটিভ বিদ্যুৎ ছিটকে বেরিয়ে যায় পদার্থ কেন্দ্র থেকে তাহ'লে পদার্থ পরমাণুতে নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা কমে যায়। ফলে রূপান্তরিত পদার্থটি উপরের দিকের কোন মৌলিক পদার্থের সমঘরে পরিণত হয়।

এক্‌টিনিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা ৮৯। কিন্তু একটি ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের ফলে একটি একটিনিয়াম রূপান্তরিত হ'য়ে যায় রেডিও একটিনিয়ামে, যার পরমাণবিক সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৯০। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণবিক কেন্দ্র থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হ'লে পরমাণুর কেন্দ্রে একটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা বেড়ে যায়। এই পজিটিভ বিদ্যুৎকণাটি আসে কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ইলেকট্রন ও প্রোটন পরস্পরকে কঠিন আলিংগনে আবদ্ধ ক'রে নিউট্রনের সৃষ্টি করে, সেই নিউট্রন থেকে যদি কোন ক্রমে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায় তা'হ'লে অবশিষ্ট থেকে যায় পজিটিভ কণা প্রোটনটি এবং এই পজিটিভ কণাটি পদার্থের পরমাণবিক কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎকণা বা প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি

তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে বিপুল বেগে বিদ্যুৎকণাগুলি বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসে রশ্মির মত। তাই তেজস্ক্রিয় পদার্থের বেলায় এই সব পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণাগুলির বিশিষ্ট নাম দেওয়া হয়েছে আলফা রশ্মি এবং বিটা রশ্মি। পজিটিভ বিদ্যুৎকণাগুলি এক একটি আলাদা কণারূপে ছিটকে বেরোয় না, বেরোয় দু'টি দু'টি করে জোট বেঁধে। সুতরাং একটি আলফা রশ্মিকণায় রয়েছে দুটি পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। উদাসী গ্যাস হিলিয়ামের কেন্দ্রে রয়েছে দুটিমাত্র পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। তাই একটি আলফা রশ্মি ইলেকট্রন-বর্জিত হিলিয়াম কেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। আলফা রশ্মিকণা

তাই তেজস্ক্রিয় পদার্থের অভ্যন্তর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে প্রথম সুযোগেই দুটি ইলেকট্রন কেড়ে নেয় বাতাস থেকে এবং নিরপেক্ষ ও স্বাভাবিক হিলিয়াম পরমাণুরূপে মিশে যায় বাতাসে। হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন চার ; তাই যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা রশ্মি ছিটকে বেরিয়ে যায় তার পরমাণবিক ওজন চার কমে যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়ামের পরমাণবিক ওজন ২১০ এবং একটি আলফা রশ্মিকণা ছিটকে বেরিয়ে যায় বলে পরমাণবিক ওজন চার হ্রাস পেয়ে পোলোনিয়াম (২১০-৪)=২০৬ পরমাণবিক ওজনের সীসাতে রূপান্তরিত হয়।

ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের ফলে মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক ওজনের তেমন কোন পরিবর্তন হয় না কারণ ইলেকট্রনের ওজন এত তুচ্ছ যে দুই হাজার ইলেকট্রন একত্র করলে একটি প্রোটনের সমান ওজন হয়।

আলফারশ্মি ও বিটারশ্মির সংগে সংগে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে একপ্রকার আলোকরশ্মিও বের হয়। পরমাণুর কেন্দ্রে ভাংগন লাগার ফলে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাই থেকে জন্মায় এই আলোক তরংগ। এই আলোকরশ্মির নামই গামারশ্মি। সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই যে অবধারিত রূপে একই সংগে এই তিনপ্রকার রশ্মিই বিচ্ছুরিত হয় তা নয়। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে হয় তো আলফা রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'ল। কোনটা থেকে বিটা, কোনটা থেকে গামা। আবার এমন তেজস্ক্রিয় পদার্থও দেখা যায় যার পরমাণু থেকে আলফা, বিটা, গামা তিনপ্রকার রশ্মিই বিচ্ছুরিত হয়। য়ুরেনাম থেকে আলফা ; রেডিয়াম থেকে আলফা, বিটা, গামা ; পোলোনিয়াম থেকে আলফা, থোরিয়াম বি থেকে বিটা, গামা, একটিনিয়াম থেকে খালি বিটারশ্মিই বিচ্ছুরিত হয়। (এই সব রশ্মিদের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে পদার্থের পরমাণবিক সংগঠন অধ্যায়ে)

তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ুষ্কাল

তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা ভেংগে ভেংগে পর পর যে সব নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করে তারা চিরকাল বেঁচে থাকে না। কোনটি হয়ত কয়েক সেকেণ্ড, কোনটি মিনিট, কোনটি ঘণ্টা আবার কোনটি হাজার বছরেরও বেশি বেঁচে থাকে। যত বেশি তাড়াতাড়ি তেজরশ্মি ছড়ায় তত শীঘ্র তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা

পরমাণু কেন্দ্র ভেংগে ভেংগে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক রূপান্তরিত হ'তে যে সময় লাগে বিজ্ঞানের ভাষায় সে সময়কে বলে অর্ধ আয়ুষ্কাল। তেজ বিচ্ছুরিত ক'রে এক পরমাণু রেডিয়ামের ভেংগে ওজনে অর্ধেক হ'তে সময় লাগে ১৫৮০ বছর। পোলোনিয়মের লাগে ১৩৬ দিন। একটিনিয়াম সি'র লাগবে দুমিনিট। একটিনিয়াম ইমালসনের লাগে ৪ সেকেণ্ড। (তেজস্ক্রিয় তালিকা দ্রষ্টব্য)

তেজস্ক্রিয়ার কারণ কি ?

কয়েকটি মাত্র পদার্থ আপনা থেকেই এমন ভেংগে যায় কেন ? এরা বাইরের কোন উসকানি বা উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে না। ভেংগে একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুরই ভ্রূক্ষেপ করে না। নিরন্তর রূপান্তরিত হ'তে থাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা। তেজস্ক্রিয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমে নজর পড়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণবিক ওজনের ওপর। দেখা যায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের আদি জনক য়ুরেনাম ও থোরিয়ামের পরমাণবিক ওজন যথাক্রমে ২৩৮ ও ২৩২। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা এত অত্যধিক ভারী হওয়ায় এদের পরমাণুর অভ্যন্তরে পদার্থের মৌলিক উপাদানরূপ কণা কণা বিদ্যুৎগুলি এক প্রচণ্ড ভিড় ক'রে এত ঠাসাঠাসি হ'য়ে থাকে যে পরমাণু কেন্দ্রের এক মুহূর্তও সুস্থির হ'য়ে অবস্থান করবার উপায় নেই। বিদ্যুৎকণাদের ভিড়ের চাপে সর্বদা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে পরমাণু কেন্দ্র। এই উত্তেজিত অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেয়ে শান্ত ও সুস্থির হবার জন্য নিরন্তর বাড়তি বিদ্যুৎকণাগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকে বাইরের দিকে। তেজরশ্মিরূপে বিদ্যুৎ-কণাগুলি বিচ্ছুরিত ক'রে ক'রে পদার্থ পরমাণু কেন্দ্রের ভিড়ের চাপ হালকা হ'তে থাকে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন পর্যাপ্ত তেজ বিচ্ছুরণ ক'রে মৌলিক ধাতু সীসাতে পরিণত হয় তখন পরমাণুর বিদ্যুৎকণাগুলি সুস্থির হ'য়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে কেন্দ্রে।

পরবর্তী গবেষণায় বিজ্ঞানীদের এরূপ যুক্তিতে ত্রুটি বেরিয়ে পড়ল। তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রাথমিক আবিষ্কারের যুগে জানা গিয়েছিল যে একমাত্র সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থরাই তেজ বিকিরণ করে। কিন্তু পরের আবিষ্কারে জানা যায় যে অপেক্ষাকৃত হালকা ওজনের পদার্থ ৩৯ পরমাণবিক

ওজনের পটাসিয়াম এবং ৮৫ পরমাণবিক ওজনের মৌলিক পদার্থ রুবিডিয়ামও তেজ বিকিরণ করে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের পূর্বেকার কল্পনার ভিত্তি আর টিকল না। তেজস্ক্রিয়ার কারণ আবার রহস্যময়তার অন্ধকারে ডুবে গেল। এখন পর্যন্ত পদার্থ পরমাণুর কেন্দ্রীয় সংগঠন ও মৌলিক উপাদানের স্বরূপ সম্বন্ধে পাওয়া খবর এত অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ যে বিজ্ঞানীরা আজও তেজস্ক্রিয়ার কারণ পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন নি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজ বিকিরণ পরীক্ষা ক'রে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। আকাশে বাতাসে ভূগর্ভস্থ জলে এবং পর্বতকন্দরে গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। জলে ও বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পেয়ে এবং এদের পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তরের মাটির সংগে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশে রয়েছে এবং নিরন্তর তেজ বিকিরণের সংগে সংগে তাপ বিকিরণ করছে। পৃথিবীর ভূ-স্তর থেকে অবিরাম যে তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে তাপের আংশিক সূর্যালোক থেকে পাওয়া যায় যা ভূ-পৃষ্ঠ আবার বিচ্ছুরিত ক'রে দেয়। বাকি অংশ পূর্ণ হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের তাপ বিচ্ছুরণে। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপের একটা ভারী অংশ পূরণ করছে।

তাপ বিতরণের কারণ নির্ধারণ করা ছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থেরা পৃথিবীর বয়স হিসাব করার সন্ধানও দিয়েছে বিজ্ঞানীদের। য়ুরেনাম ধাতুর সংগে সীসাও পাওয়া যায়, এবং য়ুরেনামের সংগে-পাওয়া এই সীসার জন্ম হয় তেজস্ক্রিয় য়ুরেনামের রূপান্তরের ফলে। সুতরাং একটি য়ুরেনাম ধাতবপিণ্ডে য়ুরেনাম ও সীসার আনুপাতিক পরিমাণ যদি জানা যায় তা' হ'লে কতখানি য়ুরেনাম থেকে এই সীসা পাওয়া গেল তা'ও য়ুরেনামের অর্ধায়ুষ্কাল থেকে হিসেব ক'রে বের ক'রে দেওয়া যায়। অনেক খনিজ পদার্থের অভ্যন্তরে হিলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাপ্ত হিলিয়ামের পরিমাণ ওজন ক'রে সেই হিলিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভেংগে কতদিনে রূপান্তরিত হয়েছে তা নির্ধারণ করা যায়। এমনি ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়সের হিসাব ক'রে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো পাথরের বয়স ১৬০ কোটী বৎসর। এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে ১২০ কোটী বৎসর আগে।

পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর

কৃত্রিম উপায়ে কি পদার্থের রূপান্তর করা যায় ? এ কল্পনা মানুষের আজকের নয়। যুগ যুগ ধরে দেশবিদেশের মানুষ 'পরশ পাথরের' সন্ধান ক'রে আসছে। যদি এমন পরশ পাথর মিলত যা'র ছোঁয়া দিয়ে লোহাকে সোনা করা যায়, পারদকে সোনা করা যায়, অপধাতু মাত্রকেই স্বর্ণ ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়! কিন্তু পরশ পাথরের সন্ধান মেলেনি কোন দিন। মানুষ পদার্থের স্বরূপই জানত না সে যুগে, রূপান্তর করবে কি ক'রে? বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা পরশ পাথরের সন্ধান পান নি বটে কিন্তু পদার্থকে রূপান্তরিত করবার উপায় উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছেন।

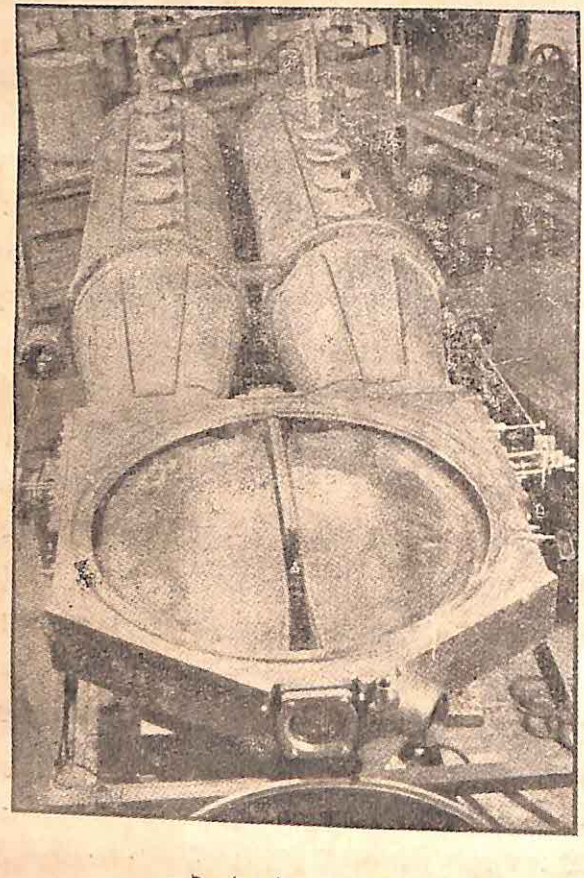
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পদার্থের মৌলিক উপাদানের আবিষ্কার হ'লে দেখা গেল মাত্র দু'রকম বিদ্যুৎকণার সমষ্টিতে গড়া এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর নির্ভর করছে পদার্থের মৌলিকত্ব। কোনক্রমে যদি এই বিদ্যুৎকণার সংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে দেওয়া যায় তা'হ'লেই মৌলিক পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে যাবে অন্য পদার্থে। যদি কোনক্রমে একটি পজিটিভ বিদ্যুৎরূপী প্রোটন কণা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় পরমাণুর কেন্দ্রে, তা'হ'লে মুহূর্তের মধ্যে কারবন রূপান্তরিত হয়ে যাবে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে, প্লাটিনাম রূপান্তরিত হবে সোনায়। প্রোটন কণা না ঢুকিয়ে যদি পদার্থের কেন্দ্র থেকে প্রোটন কণা বা ইলেকট্রন কণা কেড়ে নেওয়া যায় তা'হ'লে মৌলিক পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে যায় অন্য পদার্থে। একটি প্রোটন কণা খসিয়ে নিতে পারলেই পারদকে রূপান্তরিত করা যায় সোনায়; তিনটি প্রোটন কণা কেড়ে নিতে পারলে টিনকে রূপান্তরিত করা যায় রূপায়। একটি ইলেকট্রন কেড়ে নিতে পারলে লোহাকে রূপান্তরিত করা যায় কোবলটে, কোবলটকে নিকেলে। আপাতত মনে হয় কাজটি খুব সহজ—মাত্র পদার্থের পরমাণুতে বিদ্যুৎকণা কেড়ে নেওয়া বা জুড়ে দেওয়া। কিন্তু কার্যত এই রূপান্তর সাধন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেন্দ্রের পদার্থকণারা, কি প্রোটন, কি নিউট্রন এত প্রচণ্ড জোরে পরস্পরকে আলিংগন ক'রে কেন্দ্র-পিণ্ড সংগঠিত করে যে সহজে পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে বিদ্যুৎকণা জুড়ে দেওয়াও যায় না বা কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না। বিজ্ঞানীরা অবশ্য কৃত্রিম রূপান্তরের উপায় উদ্ভাবন ক'রছেন কিন্তু কাজটিকে এখনও সহজলভ্য করতে পারেন নি।

কৃত্রিম রূপান্তরের প্রথম কৃতিত্ব বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের। তিনি ভাবলেন

পদার্থকেন্দ্রকে যদি প্রচণ্ড বেগে আঘাত করা যায় তা'হ'লে হয়ত কেন্দ্রের কঠিন বন্ধন থেকে প্রোটন বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হ'তে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রচণ্ডবেগে যে আলফা কণা অর্থাৎ হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে তাই দিয়ে তিনি নাইট্রোজেন পরমাণুর ওপর আঘাত হানলেন। আলফা কণাগুলি বুলেটের মত গিয়ে প্রচণ্ড বেগে নাইট্রোজেন পরমাণুর ওপর গোলাবর্ষণ করল। কিন্তু বেশির ভাগ আলফা কণা সোজা গিয়ে পরমাণুকেন্দ্রের বক্ষ ভেদ করল এবং সংগে সংগে কেন্দ্র থেকে প্রচণ্ডবেগে প্রোটন ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত ক'রে দিল। যে বেগে আলফা কণা কেন্দ্রকে আঘাত করছে প্রোটন তা'র চেয়েও বেশি বেগে ছিটকে বেরিয়ে এল। কারণ যে বিপুল শক্তিতে কেন্দ্র প্রোটনকে বন্দী ক'রে রেখেছিল মুক্তি দেবার সময় সে দুরন্ত শক্তিতেই ছুঁড়েও দিল। এইভাবে আলফা কণা দিয়ে আঘাত ক'রে বোরণ, নাইট্রোজেন, এ্যালুমিনিয়াম থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে প্রোটন পাওয়া গেল। কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মৌলিক পদার্থেরও রূপান্তর হয়ে গেল।

পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেল শুধু আলফা কণা অর্থাৎ হিলিয়াম নয়, প্রচণ্ড বেগে ছোটা হাইড্রোজেন বা নিউট্রন গিয়ে আঘাত করলেও পদার্থের রূপান্তর ঘটান যায়। দুরন্ত বেগে ছোটা হাইড্রোজেন দিয়ে লিথিয়ামের কেন্দ্রে আঘাত ক'রলে, লিথিয়াম হিলিয়ামে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। হিলিয়াম দিয়ে বেরিলিয়ামকে আঘাত ক'রলে, ছয়টি প্রোটনের মালিক বেরিলিয়াম নিজের কেন্দ্রে হিলিয়ামকে আটক ক'রে ফেলে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ছয়টি থেকে আটটিতে বাড়িয়ে নেয় অর্থাৎ বেরিলিয়াম কারবন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সংগে বেরিলিয়াম কেন্দ্র থেকে একটি নিউট্রনও ছুঁড়ে দেয় বাইরে। রাদারফোর্ড নিউট্রন দিয়ে নাইট্রোজেন কেন্দ্রকে আঘাত ক'রে দেখেন কোন কোন নাইট্রোজেন থেকে হিলিয়াম বা আলফা কণা ছিটকে বেরিয়ে যায় কিন্তু নিউট্রনটি কেন্দ্রেই আটকা পড়ে যায়, আবার কোনটি থেকে প্রোটন বেরিয়ে যায় কিন্তু নিউট্রন আটকা পড়ে। প্রথম ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন বোরণে পরিণত হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কারবনে রূপান্তরিত হয়। কৃত্রিম রূপান্তরে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের রূপান্তরে দেখা যায় না—আলফা কণা দিয়ে বোরণকে আঘাত করলে বোরণ আলফা কণাকে আটক ক'রে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয় এবং নিউট্রন বিচ্ছুরিত করে, আবার

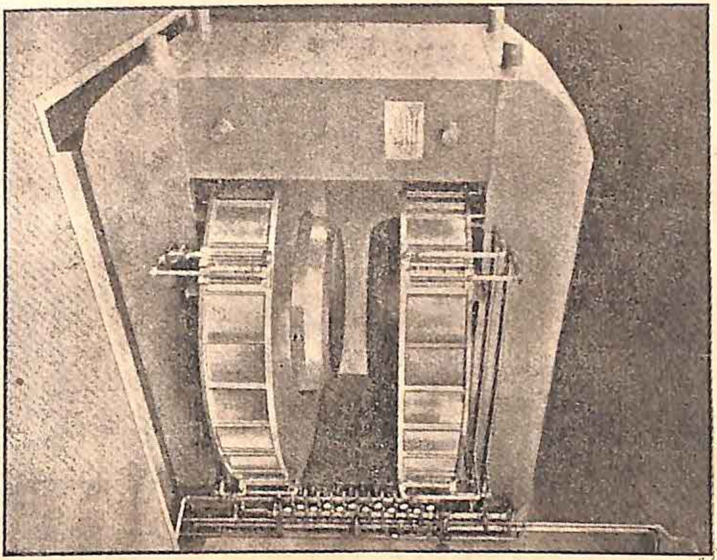
নিউট্রন দিয়ে নাইট্রোজেনকে আঘাত করলে নাইট্রোজেন নিউট্রন আটক করে কিন্তু কেন্দ্র থেকে আলফাকণা বিচ্ছুরিত ক'রে আবার বোরণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপান্তর দুদিকেই করা যায়। ভারী পদার্থকেও হালকা পদার্থে পরিণত করা যায় আবার হালকাকেও ভারীতে উন্নীত করা যায় এই কৃত্রিম উপায়ে।



একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্রের পূর্ণ চিত্র

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের রূপান্তর ঘটানর কাজ বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে সাইক্লোট্রন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে আলফা কণা পাওয়া যায় বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া আলফাকণা দিয়ে আঘাত ক'রে যে নিউট্রন পাওয়া যায় তাদের গতিবেগের ওপর বিজ্ঞানীর বড় হাত নেই। তাই কৃত্রিম রূপান্তরের প্রচেষ্টায় পরমাণুকেন্দ্রে আঘাতের মাত্রা বাড়ান কমান

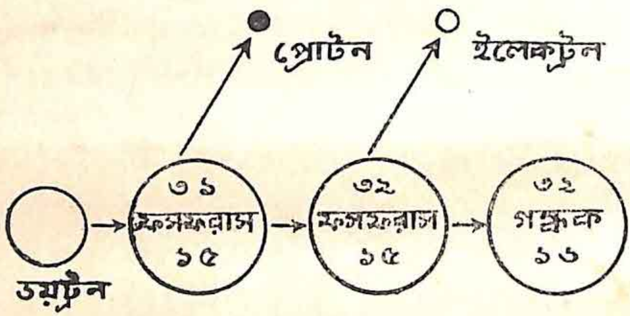
যায় না। সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের ফলে আঘাতকারী কণার গতিবেগ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। এই যন্ত্রের প্রচণ্ড চুম্বকী বৈদ্যুতিক প্রভাবের ফলে হিলিয়াম বা হাইড্রোজেন কণায় এক প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করা হয়। আঘাতকারী পদার্থকণার যখন পাঁচ কোটি 'ইলেকট্রন ভোল্ট' শক্তির (এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপের মধ্যে দিয়ে একটি ইলেকট্রন কণা পরিচালিত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে এক ইলেকট্রন ভোল্ট বলে) গতিবেগ সঞ্চার হয় তখন এই দুরন্ত বেগবান হিলিয়াম বা হাইড্রোজেন কণা দিয়ে যে পদার্থকে



এই চিত্রে সাইক্লোট্রনের চুম্বকের ক্ষেত্রটি দেখানো হয়েছে। এই চুম্বকের ক্ষেত্রের প্রভাবে আঘাতকারী পরমাণুকণা কৃত্রিম উপায়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলার চলন-শক্তি লাভ করে।

রূপান্তরিত করা হবে তার কেন্দ্রে আঘাত করা হয়। যা'র ফলে কেন্দ্র আঘাতকারীকে আটক ক'রে অথবা কেন্দ্র থেকে প্রোটন বর্জন ক'রে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফসফরাস্ কি ক'রে রূপান্তরিত হয় গন্ধকে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। হাইড্রোজেনের সমঘরের নাম "ডয়ট্রন"। ডয়ট্রন কেন্দ্রে রয়েছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন কিন্তু সাধারণ হাইড্রোজেনে আছে শুধু একটি মাত্র প্রোটন। এই ডয়ট্রনে যখন সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে পাঁচ কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের বেশি শক্তির বেগ সঞ্চার হয় তখন এই ডয়ট্রন

দিয়ে আঘাত করা হয় ফসফরাসকে। ফসফরাস কেন্দ্র এই ডয়ট্রনটিকে আটক করে ফেলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রোটনকে বিচ্ছুরিত ক'রে দেয় নিজের কেন্দ্রক থেকে। ফসফরাসের কেন্দ্রে আছে ১৫টি প্রোটন এবং ১৬টি নিউট্রন, অর্থাৎ ফসফরাসের পরমাণবিক ওজন হ'ল ৩১। কিন্তু ডয়ট্রন আটক এবং একটি প্রোটন বর্জনের ফলে কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাটি সমানই থেকে যায় কিন্তু ডয়ট্রন থেকে একটি বেশি নিউট্রন পেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭, অর্থাৎ ফসফরাস একটি সমঘর ফসফরাসে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই রূপান্তরিত ফসফরাস ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তের মধ্যে একটি ইলেকট্রন এই রূপান্তরিত সমঘর ফসফরাস থেকে



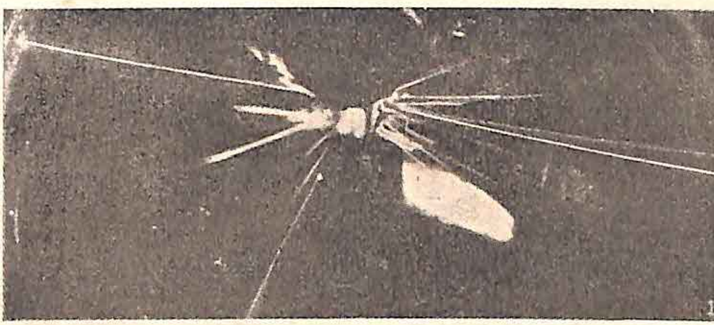
ফসফরাসের কৃত্রিম রূপান্তর | তেজস্ক্রিয় ফসফরাস | স্থায়ী গন্ধক

২ ৩১ ৩২ ১
ডয়ট্রন + ফসফরাস —> ফসফরাস + প্রোটন + বিচ্ছুরিত শক্তি
১ ১৫ ১৫ ১

৩২ ৩২
ফসফরাস —> গন্ধক + ইলেকট্রন + বিচ্ছুরিত শক্তি
১৫ ১৬

ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং সংগে সংগে কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যা কমে যায় ১৬-তে, এবং প্রোটনের সংখ্যা একটি বেড়ে হয় ১৬। কারণ নিউট্রনের সংগে যে ইলেকট্রন জড়িত ছিল তা' বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নিউট্রনের পজিটিভ কণা রূপান্তরিত হয়েছে প্রোটনে। রূপান্তরিত ফসফরাসের কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা ১৬ হওয়ায়, ফসফরাস রূপান্তরিত হয়ে যায় স্থায়ী গন্ধকে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া সাংকেতিক ভাবে লেখা হ'ল উপরে। উপরের সংখ্যা পরমাণবিক ওজনের এবং পদার্থের নামের নীচে লেখা সংখ্যা প্রোটনের প্রতীক।

সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত করাও সম্ভব হ'ল। সংগে সংগে তেজস্ক্রিয়ও করা হ'ল। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে শুধু এইটুকু পার্থক্য যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত হয় প্রোটন, ইলেকট্রন, ও গামা রশ্মি। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত হয় আল্‌ফাকণা অর্থাৎ হিলিয়াম কেন্দ্র, ইলেকট্রন ও গামা রশ্মি। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের মতই কৃত্রিম পদার্থের অর্ধায়ুকাল কয়েক মিনিট থেকে আরম্ভ ক'রে কয়েক বৎসর পর্যন্ত। প্রাকৃতিক রেডিয়ামের মত এত দীর্ঘ দিনের অর্ধায়ুকাল কা'রও নেই। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় কারবনের অর্ধায়ুকাল এক হাজারের বেশি, সোনার তিনদিন, এ্যালুমিনিয়ামের ছয় মিনিট ইত্যাদি। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থকে রূপান্তরিত ক'রে তেজস্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।



লিথিয়াম পরমাণু হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। হাইড্রোজেনের সমঘর অর্থাৎ ডয়ট্রন দিয়ে লিথিয়াম পরমাণুকে আঘাত করায় ক১ ক২ পদার্থকণা প্রবল বেগে দুদিকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। খ দুরন্ত বেগে ছোটা বিটা প্রোটনকণা। এমনিভাবে ৬ পরমাণু ওজনের লিথিয়াম ৪ পরমাণু ওজনের হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

চিকিৎসা কার্যে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে দিনদিনই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং তৈরী করাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। পারদ বা প্লাটিনামকে সোনায় রূপান্তরিত করা এখন আর অসম্ভব নয়, কিন্তু এই রূপান্তর ঘটাতে যে খরচ পড়বে তাতে প্রাকৃতিক সোনার চেয়ে রূপান্তরিত সোনার দাম অনেক বেশি প'ড়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা পরশ পাথরের সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু যন্ত্রশিল্পীরা এখনও এ পরশ পাথরকে কাজে

লাগাবার উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি। যেদিন পারবেন সেদিন বহু মুখ্য পদার্থ আর অমুখ্য পদার্থের অমর্যাদা পাবে না।

পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর প্রসংগে এ প্রশ্ন মনে আসা খুব স্বাভাবিক যে পদার্থ পরমাণু থেকে ইলেকট্রন প্রোটন বিচ্ছিন্ন ক'রে অথবা পরমাণুকেন্দ্রে নতুন ইলেকট্রন প্রোটন যোগ দিয়ে পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তরের চেষ্টা না ক'রে সোজাসুজি একেবারে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন, প্রোটন একজোট ক'রে পদার্থ পরমাণুতে জমাট বাঁধিয়ে দেওয়া যায় না? খণ্ড খণ্ড ইট দিয়ে যেমন ইমারত গড়ে তোলা হয় তেমনি ছ'টি প্রোটন, ছ'টি নিউট্রন, ছ'টি ইলেকট্রন একত্র ক'রে একটি কারবন পরমাণুতে জমাট বাঁধান যায় না? ৭৯ প্রোটন, ১১৮ নিউট্রন ও ৭৯ ইলেকট্রনকে সোনার একটি পরমাণুরূপে গেঁথে নেওয়া যায় না? এমনি সরাসরি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনকে জমাট বাঁধিয়ে পদার্থ পরমাণু গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। জমাট বাঁধাবার জন্য যে বিপুল তাপশক্তির প্রয়োজন তা' এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যে সকল নক্ষত্রে প্রচণ্ড তাপশক্তি বিদ্যমান সেখানে এরূপ সরাসরি ভাবে মৌলিক উপাদান থেকে পদার্থ পরমাণু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব একথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। যে প্রচণ্ড শক্তিতে পরমাণুকেন্দ্রে পদার্থকণারা আলিংগনাবদ্ধ হ'য়ে থাকে তা'র যোগান মেলে ওই তাপশক্তি থেকে। কিন্তু এরূপ তাপশক্তি উৎপন্ন করার যন্ত্র কোথায় আমাদের পৃথিবীতে?

তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধানের ফলে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে এক ইংগিত করেছেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু কেন্দ্র থেকে তেজবিকিরণের সংগে সংগে অবিরাম যে বিপুলশক্তি নির্গত হচ্ছে কোন দিন যদি বিজ্ঞানীরা এই প্রচণ্ড শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারেন, যদি নিজেদের খুশিমত একে কাজে লাগাতে পারেন তা'হ'লে পৃথিবীর যন্ত্র চালাবার জন্য কয়লা, বা বিদ্যুতের প্রয়োজন আর হবে না, সব কল চলতে পারবে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত বিপুল শক্তিরশ্মি দিয়ে। এ সম্ভাবনা যেদিন সত্য হবে সেদিন হয়ত পৃথিবীর যন্ত্রসভ্যতায় আসবে এক অচিন্তনীয় যুগান্তর।

য়ুরেনাম ভাঙন (Uranium Fission)

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং আরও অনেকে প্রোটন এবং আলফারশ্মি বা হিলিয়াম কণাদ্বারা আঘাত দিয়ে পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

সাইক্লোট্রন যন্ত্রদ্বারাও পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর করা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ফার্মি (Farme) প্রোটন ও আল্‌ফাকণার পরিবর্তে নিউট্রনকণা দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত ক'রে দেখলেন কেন্দ্রের রূপান্তরে নিউট্রনের ক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি নিউট্রনের বুলেট দিয়ে বিভিন্ন পদার্থ পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত ক'রে শত শত কৃত্রিম রূপান্তরের পরীক্ষা করলেন। কৃত্রিম রূপান্তরের পরীক্ষা করতে করতে এক সময় বিজ্ঞানী ফার্মির মনে প্রশ্ন জাগল—এক পদার্থ থেকে আর এক পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তরের বদলে একেবারে নূতন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করা যায় না ? প্রকৃতিতে ৯২টি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। য়ুরেনাম সব চেয়ে ভারী এবং সব চেয়ে শেষ সংখ্যার মৌলিক পদার্থ। য়ুরেনামের পরমাণবিক সংখ্যা ৯২। কিন্তু য়ুরেনামের চেয়েও ভারী মৌলিক পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যাবে না কেন ? প্রকৃতিতে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিভিন্ন রশ্মিকণা বিচ্ছুরিত ক'রে ক'রে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাদের পরমাণবিক সংখ্যা কমে কমে নীচের দিকে যায়। তাই প্রাকৃতিক রূপান্তর ৯২ সংখ্যার য়ুরেনামের উপরের দিকে যেতে পারবে না কেন ? কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে পদার্থকে উপরের দিকে রূপান্তর করা যায়। ৫ পরমাণবিক সংখ্যার বোরণকে ৭ সংখ্যার নাইট্রোজেন বা ১৫ সংখ্যার ফসফরাসকে ১৬ সংখ্যার গন্ধকে রূপান্তরিত করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে এমনিতর হালকা পদার্থকে যদি ভারী পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় তা'হ'লে ৯২ পরমাণবিক সংখ্যার সব চেয়ে ভারী এবং সব চেয়ে শেষের পদার্থ য়ুরেনামকে আরও ভারী পদার্থে কেন রূপান্তরিত করা যাবে না ? ৫ সংখ্যার পদার্থকে যদি ৭ সংখ্যার পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় তা'হ'লে ৯২ সংখ্যার মৌলিক পদার্থকে ৯৩, ৯৪, ৯৫ ইত্যাদি সংখ্যার আরও বেশি বেশি ভারী পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে না কেন ? তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলেই হ'ক বা কৃত্রিম রূপান্তরের ফলেই হ'ক প্রকৃতিতে পাওয়া ৯২টি পদার্থের বাইরে কোন নতুন এবং কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি হয় না। বিজ্ঞানী ফার্মি প্রশ্ন করলেন ৯২টির বেশি মৌলিক পদার্থ হবে না তার কারণ কি ? ৯২-এর চেয়ে বেশি পরমাণবিক সংখ্যার অধিক ভারী এবং সম্পূর্ণ নূতনতর এবং কৃত্রিম পদার্থ সৃষ্টি করা যাবে না কেন ? য়ুরেনামের কেন্দ্রে একটি দু'টি প্রোটন বা নিউট্রন ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তো হ'ল ?

কৃত্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করবার আশায় ফার্মি ৯২

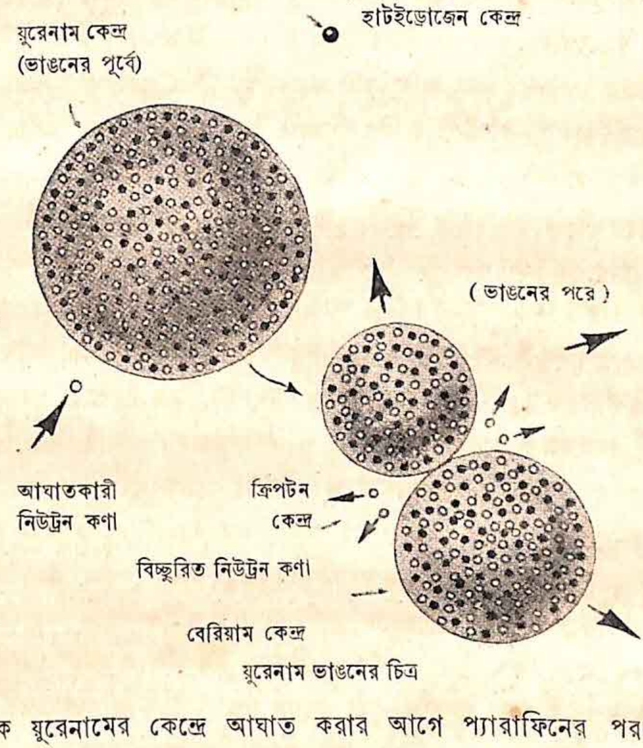
পরমাণু সংখ্যার সব চেয়ে ভারী পদার্থ য়ুরেনাম নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন। তিনি নিউট্রন কণা ছুঁড়ে মারলেন য়ুরেনামের কেন্দ্রে। নিউট্রনের আঘাত খেয়ে য়ুরেনাম রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং কয়েকটি নতুন পদার্থের জন্ম দিল। ফার্মি ভাবলেন নিউট্রনকণা য়ুরেনামের কেন্দ্রে ঢুকে গিয়ে আটকা পড়েছে এবং য়ুরেনামের কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত ক'রে নতুন ভারী পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফার্মির তাই বিশ্বাস হ'ল এই রূপান্তরিত পদার্থগুলি ৯৩, ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ পরমাণবিক সংখ্যার নতুন কৃত্রিম মৌলিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির কৃতিত্বে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

ফার্মির গবেষণার সিদ্ধান্তের ওপরে কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সন্দেহ রয়ে গেল। এ সময়ে জার্মাণ বৈজ্ঞানিক হান্ (Hahn) এবং মিটনার (Meitner) বার্লিনে এবং আই, কুরি ও স্যাডিচ (I. Curie & Saditch) প্যারির রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে ফার্মির পরীক্ষার উপর পরীক্ষা সুরু করেন এবং দেখেন যে বাস্তবিকই প্রায় নয় রকমের নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় য়ুরেনামকে রূপান্তরিত ক'রে। এ বিষয় নিয়ে কুরি আর গবেষণা চালান নি। কিন্তু বিজ্ঞানী হান্ এর মধ্যে এক আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে য়ুরেনামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত ক'রে যে নতুন পদার্থ পাওয়া যায় আসলে সে পদার্থগুলি কোন নতুন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, ৫৬ এবং ৩৬ অথবা ৩৭ পরমাণবিক সংখ্যার মৌলিক পদার্থের মিশাল মাত্র। ৫৬ সংখ্যার পদার্থ হ'ল বেরিয়াম এবং ৩৬ ও ৩৭ হ'ল ক্রিপটন ও রুবিডিয়াম। ফার্মি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই মিশাল পদার্থকে ভারী এক একটি নতুন মৌলিক পদার্থ ব'লে ভুল করেছিলেন। কিন্তু হান দেখিয়ে দেন যে এই পদার্থটি রেডিয়ামের সমঘর নয়, এটি মৌলিক পদার্থ বেরিয়াম ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানী হানের মনে প্রশ্ন জাগল, গবেষণাগারে পরীক্ষা হ'ল ৯২ সংখ্যার য়ুরেনামকে নিয়ে কিন্তু ৫৬ সংখ্যার রেডিয়াম এল কি ক'রে? এ প্রশ্নের সমাধানে হান সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে নিউট্রনের আঘাতের ফলে য়ুরেনাম কেন্দ্র দুইভাগে ভেংগে গিয়ে ৫৬ সংখ্যার বেরিয়াম এবং ৩৬ বা ৩৭ সংখ্যার মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করছে। হান আরও পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে য়ুরেনাম আরও বহু অনুপাতেই দুই খণ্ড হয়ে ভেংগে যেতে পারে। য়ুরেনামের এরূপ দুই খণ্ডে ভেংগে যাবার নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা য়ুরেনাম ভাঙন

(Uranium Fission)। য়ুরেনাম ভাঙনের এই তথ্য আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

য়ুরেনাম ভাঙনের ঘটনা লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগল য়ুরেনাম এমন দু'খণ্ড হ'য়ে ভেংগে যায় কেন? অন্যান্য পদার্থ তেজস্ক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হয় কিন্তু য়ুরেনামের মত দু'খণ্ডে ভেংগে দুটো মৌলিক পদার্থরূপে তো ভেংগে যায় না? বিজ্ঞানী আরো প্রশ্ন করলেন, নিউট্রনের আঘাতের জোরেই কি য়ুরেনাম ভেংগে যায়? নিউট্রনের আঘাতের জোরে য়ুরেনাম ভাংগে কিনা তা' পরীক্ষা করবার জন্য বিজ্ঞানী হ্যান আঘাতকারী নিউট্রনের সামনে একটি প্যারাফিনের পরদা টাংগিয়ে দিলেন। আঘাতকারী নিউট্রন-



য়ুরেনাম ভাঙনের চিত্র

কণাকে য়ুরেনামের কেন্দ্রে আঘাত করার আগে প্যারাফিনের পরদা ভেদ করতে হ'ল। তার ফলে পরদা ভেদ ক'রে যাবার সময় নিউট্রনের গতিবেগ অনেক কমে গেল। কিন্তু তথাপি দেখা গেল শ্লথগতি নিউট্রনের আঘাত খেয়েও য়ুরেনাম একইভাবে ভেংগে যায়। এমনিতর আরো পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে য়ুরেনাম ভেংগে যাবার জন্য নিজেই অস্থির হয়ে

আছে। নিউট্রন শুধু নিমিত্ত মাত্র, দেশলাইয়ের একটু আগুনের আঁচ বারুদে লাগলেই বারুদ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। দেশলাইয়ের কাজ শুধু বিস্ফোরণের কাজ সুরু ক'রে দেওয়া। কিন্তু বিস্ফোরণের মূল কারণ বারুদের আভ্যন্তরীণ দাহ্য পদার্থ। ঠিক তেমনি নিউট্রন য়ুরেনাম কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি করে, যার ফলে য়ুরেনাম টুকরো হ'য়ে ভেংগে যায়। নিজেকে ভাঙবার স্বভাব সব য়ুরেনামের সমান নয়। প্রকৃতিতে দু'রকম সমঘরের য়ুরেনাম পাওয়া যায়। একটির পরমাণবিক ওজন ২৩৫, দ্বিতীয়টির ২৩৮। ১৪০ গ্রাম য়ুরেনামে মাত্র একগ্রাম পাওয়া যায় ২৩৫ ওজনের য়ুরেনাম। এ দু'রকমের য়ুরেনামই সমানভাবে ভাংগতে পারে না। ২৩৫ ওজনের য়ুরেনাম সহজেই ভেংগে যায়, ২৩৮ ওজনের য়ুরেনামের চেয়ে ২৩৫ ওজনের য়ুরেনাম ১০০০ গুণ বেশি ভাঙতে পারে।

য়ুরেনাম ভাঙনের রহস্য আবিষ্কারের ফলে জানা গেল যে কেন য়ুরেনামের চেয়ে অধিক ভারী মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। য়ুরেনাম এবং তার কাছাকাছি মৌলিক পদার্থগুলি নিজেদের কেন্দ্রীয় কণার ভারে নিজেরাই অস্থির হয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই ভেংগে হালকা হয়ে যেতে চায়। তাই ৯২ পরমাণবিক সংখ্যার য়ুরেনাম ছাড়া ৯১ ও ৯০ সংখ্যার প্রোটেন এ্যাকটিনিয়াম এবং থোরিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ দু'টিও য়ুরেনামের ন্যায় নিউট্রনের আঘাতে ভেংগে যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন য়ুরেনামের চেয়ে বেশি পরমাণবিক ওজনের সুস্থির মৌলিক পদার্থ সংগঠন তাই সম্ভব নয়।

পরমাণু বোমা

আণবিক বোমার কথা সবারই জানা আছে। বাংলায় আণবিক কথাটি চালু হ'লেও আসলে এর নাম হবে পরমাণু বোমা (Atom bomb)। য়ুরেনাম ভাঙনের রহস্য আবিষ্কারের ফলেই পরমাণু বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। য়ুরেনাম নিউট্রনের আঘাত খেয়ে দু'খণ্ডে ভেংগে যায়। ভাঙবার পরে খণ্ড দু'টি এরূপ প্রচণ্ড বেগে পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে সরে যায় যে এই খণ্ড দু'টি ২০০০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্টের দুরন্ত বেগে ছোটার ফলে এক বিপুল শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শক্তি পরিমাণে এত বিপুল যে ২০ লক্ষ গ্রাম কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপাদন সম্ভব, মাত্র একগ্রাম য়ুরেনাম ভেংগে সে শক্তির জন্ম দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানীরা য়ুরেনাম ভাঙার থেকে জন্ম-নেওয়া এই শক্তি

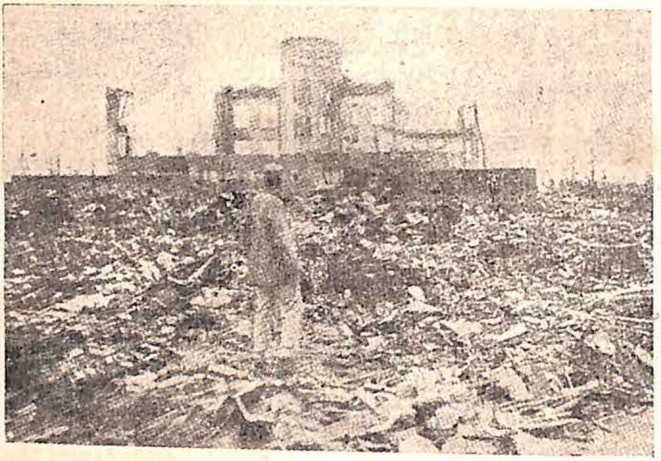
পরমাণু বোমা গঠনের কাজে লাগিয়েছেন। এক গ্রাম য়ুরেনাম থেকে যে ধ্বংসাত্মক শক্তির স্থষ্টি করা সম্ভব, হাজার হাজার পাউণ্ড দাহ্য পদার্থ থেকেও সে বিস্ফোরক শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। য়ুরেনাম ভাঙার এই বিরাট শক্তিই পরমাণু বোমার মধ্যে আটক করা হয়েছে। বোমার মধ্যে নানা জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে বোমাটি মাটিতে পড়বার সাথে সাথে বোমার ভেতরে যে য়ুরেনাম থাকে তা ভেংগে যায় এবং ভেংগে যাওয়ার সাথে সাথেই য়ুরেনাম ভাঙন থেকে যে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয় তাই এক প্রবল বাত্যার স্থষ্টি ক'রে আশেপাশের সব কিছু ধ্বংস ক'রে দেয়। একটি সহরের ওপরে যদি একটি পরমাণু বোমা ফাটে তার ফলে সোয়াকোটী মণ পরিমাণের বায়ুর চাপ স্থষ্টি হবে এবং প্রায় একহাজার লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপের আগুন জলে উঠবে। আকাশের জলন্ত তারার গা থেকে খানিকটা জলন্ত বস্তু পড়ে গেলে যা হবে, পরমাণু বোমায়ও তেমনি জলন্ত পিণ্ডের স্থষ্টি হবে। ১০০ গ্রাম য়ুরেনাম ভরা একটি পরমাণু বোমা দশলক্ষ লোকের একটি সহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। পরমাণু বোমার সংগঠনের মূল সূত্রগুলি কল্পনা করা সম্ভব হলেও পরমাণু বোমার আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী এখনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-সরকার গোপন রেখেছেন। পরমাণু বোমার মূলসূত্র প্রথম আবিষ্কার হয় জার্মাণীতে এবং জার্মাণীই গত যুদ্ধে পরমাণু বোমা গঠনের কাজে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম জার্মাণীই পরমাণু বোমা তৈরি করতে পেরেছিল, না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম পরমাণু বোমা তৈরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে তা একদিন জানা যাবে ভবিষ্যতে।

পরমাণু বোমার গঠনের মূলসূত্র সব বৈজ্ঞানিকের জানা থাকলেও এই বোমা তৈরী সহজসাধ্য নয়। প্রথমত, সব দেশে এবং অনেক পরিমাণে য়ুরেনাম পাওয়া যায় না। একমাত্র ক্যানাডা, বেলজিয়াম, কংগো ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে য়ুরেনাম অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া নরওয়ে, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা কিছু কিছু পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, য়ুরেনাম পাওয়া গেলেও সব য়ুরেনাম ভাঙবার কাজে তেমন কার্যক্ষম নয়।

তৃতীয়ত, য়ুরেনাম ভাঙবার জন্য আঘাতকারী নিউট্রন স্থষ্টি করাও কম কষ্টসাধ্য নয়। পরমাণু বোমার মধ্যে য়ুরেনাম ভাঙবার জন্য নিউট্রন স্থষ্টি ঠিক কিভাবে করা হয় সে কথাও গোপন রাখা হয়েছে।

য়ুরেনামের ১৪০ ভাগের মধ্যে ২৩৫ পরমাণবিক ওজনের যে একভাগ য়ুরেনাম সমঘর পাওয়া যায় তা ভাঙনের কাজে তৎপর। কিন্তু ২৩৮ ওজনের য়ুরেনাম থেকে ২৩৫ ওজনের য়ুরেনাম সমঘর আলাদা করা দুরূহ ব্যাপার। চুম্বক ক্ষেত্র বা উত্তাপ বিচ্ছুরণের সাহায্যে (mass spectrograph or thermal diffusion) ২৩৮ থেকে ২৩৫ ওজনের য়ুরেনাম পৃথক করবার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে বটে কিন্তু এ উপায় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। প্রতি বছরে ভারতবর্ষে যত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তার সব বিদ্যুৎ কাজে লাগালে বৎসরে ২৩৫ ওজনের মাত্র ১০০ গ্রাম য়ুরেনাম সংগ্রহ করা সম্ভব এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ৫০০০ গ্রাম য়ুরেনাম সংগ্রহ করা। তাই আমেরিকার



প্রথম পরমাণু বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জাপানের হিরোসিমা নগর।

পক্ষেও বছরে ৫০টির বেশি পরমাণু বোমা তৈরি করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। সুতরাং পরমাণু বোমা তৈরি করার মত খরচ একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার পক্ষেই বহন করা সম্ভব। অবশ্য ২৩৫ ওজনের য়ুরেনামকে আলাদা করবার কোন নতূন উপায় আমেরিকা বের করেছে কিনা সেকথা এখনও গোপন রয়েছে।

পরমাণু বোমা পৃথিবীতে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। পরমাণু বোমা যে শুধুমাত্র প্রলয়ংকর ধ্বংসসাধন করে তা নয় এর প্রতিক্রিয়াও হয় গুরুতর। পরমাণু বোমা ফাটার সংগে সংগে বিভিন্ন প্রকার তেজক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই তেজক্রিয় পদার্থের গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয় মানুষের দেহে। এই

প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহে তিনপুরুষ পর্যন্ত স্থায়ী থাকবার আশংকা রয়েছে। ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে যদি গঠনমূলক কাজে য়ুরেনাম ভাংগনের শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা হয় তাহলে যন্ত্রযুগে যুগান্তর দেখা দেবে। কয়লা বা বিদ্যুতের পরিবর্তে য়ুরেনাম-ভাঙনজাতশক্তি দ্বারা পৃথিবীর যন্ত্রচালনা সহজে ও অল্প ব্যয়ে সম্ভব হবে।

মানব সমাজের সামনে আজ প্রশ্ন—পরমাণু বোমা কি মানব সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে না নতুন গঠনমূলক কাজের পথে এগিয়ে নেবে ?

চতুর্থ অধ্যায়

পদার্থের নবপরিকল্পন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বছরের গবেষণায় নির্ভুলভাবে পাওয়া গেল পদার্থের মৌলিক উপাদানের সন্ধান। বিজ্ঞানীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—পদার্থের মৌলিক উপাদান হ'ল পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা। পদার্থের আদি পরিচয় দিতে গিয়ে আগাগোড়াই বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের নামকরণ করেছেন 'বিদ্যুৎ-কণা'রূপে। আদি পদার্থকে 'কণা'রূপে আখ্যাত করার অর্থ ছিল—পদার্থের অন্তিম আকৃতি যে একান্তই 'কণারূপ' সেই পরিচয়টিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া। গবেষণাকালে ইলেকট্রন ও প্রোটন যে প্রকৃতিতে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে তা'তে তাদের আদিরূপ যে একান্তই কণারূপ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না।

ইলেকট্রন ও প্রোটনের কণারূপ

দুরন্ত বেগে ছুটে গিয়ে ইলেকট্রন যদি কোন পদার্থ পরমাণুকে আঘাত করে তা'হ'লে পরমাণুর গা' থেকে নতুন নতুন ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায় বাইরে। ঢিলের আঘাত খেয়ে গাছের ডালে ঝোলান ফলের গুচ্ছ থেকে যেমন ফল ছিটকে পড়ে যায় নীচে, তেমনি ইলেকট্রনের ঘা খেয়ে পদার্থ পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন-পুঞ্জ থেকে গুটি কয়েক ইলেকট্রন ছিটকে পড়ে যায় বাইরে। ইলেকট্রনগুলি অতি সূক্ষ্ম ঢিলের মতো না হ'লে কি এমনি ক'রে পদার্থের গা থেকে ধাক্কা দিয়ে ইলেকট্রন ছিটকে ফেলে দিতে পারে? তা' ছাড়া ক্যাথোড রশ্মিরূপে ইলেকট্রনগুলি দুরন্তবেগে যে দিকে ছুটে চলে তার উল্টোদিক থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া বিটা রশ্মিরূপ ইলেকট্রনগুলি যদি আঘাত করে তা'হ'লে ইলেকট্রনের সংগে বিটা রশ্মির ঠোকাঠুকিতে এক তুমুল সংঘর্ষ বেধে যায়। এত প্রচণ্ডবেগে এই দু'দিক থেকে আসা ইলেকট্রনগুলি পরস্পরকে ধাক্কা দেয় যে এই মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় উভয়েই সোজা পথ ছেড়ে প্রায় এক সমকোণ বাঁকা পথে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। সে পথ দিয়ে ক্যাথোডরশ্মি ও বিটারশ্মি যাতায়াত করে সে পথে যদি জলীয় বাষ্পকণা ছড়ানো থাকে তা'

হ'লেই ইলেকট্রনের চলার পথের ফটো তোলা যায়। কারণ চলবার সময় ইলেকট্রন চলার পথের বাষ্পগুলিকে জমিয়ে একটি জলরেখাপথের সৃষ্টি ক'রে দিয়ে যায়। এই জলরেখাপথের ফটো সহজেই গ্রহণ করা যায়। তাই ইলেকট্রনেরা পরস্পর ঠোকাঠুকি ক'রে যে বাঁকান পথের সৃষ্টি করে তারও ফটো নেওয়া যায়। ইলেকট্রন যদি পদার্থকণা না হয় তা'হ'লে দু'দল ইলেকট্রনের পরস্পরের মাঝে এরূপ ঠোকাঠুকি হবে কেন? চারদিক থেকে ছুটে আসা সূর্যালোক রশ্মির পরস্পরের মধ্যে তো এমন ঠোকাঠুকি সংঘর্ষ বাধে না? সূর্যালোক রশ্মি তরংগ মাত্র, তার মধ্যে পদার্থকণা নেই। তাই উল্টোদিক থেকে এসে রশ্মিকণাগুলি পরস্পরকে আঘাত করলেও ঠোকাঠুকি হয় না। যদি হ'ত তা'হ'লে অবিরামই আকাশে আমরা আঁকা বাঁকা উজ্জ্বল আলোর রেখা হয়ত দেখতে পেতাম।

ইলেকট্রন ও প্রোটন উভয়েই যে অন্তিম গঠনে কণার মত তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরেকটি পরীক্ষায় পাওয়া যায়। কাঁচ ও জিংক সালফাইড দানা (জিংক সালফাইড, গন্ধক ও ধাতব জিংকের যৌগিকপদার্থ) একত্র গুঁড়ো ক'রে ধাতবপাত তৈরি ক'রে একটি অন্ধকার ঘরে যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যদি আলফা ও বিটারশ্মি এসে পদার্থটির গায়ে আঘাত করে তা'হ'লে দেখা যাবে প্রতিটি আঘাতের সংগে পর্দার গা থেকে ঝলকে ঝলকে আলোর ফুলকি বেরিয়ে আসছে। (আমাদের জানা আছে বিটারশ্মি ইলেকট্রন এবং আলফারশ্মি একজোড়া প্রোটন ছাড়া কিছুই নয়।) বুলেটের মতো এক একটি আলফাকণা অথবা এক একটি বিটাকণা দুর্দাম বেগে গিয়ে আঘাত করছে পর্দার গায়ে আর ঝলকে ঝলকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসছে পর্দার গা থেকে। প্রবল জোরে পাথরের গায় পাথর ছুঁড়ে মারলেই যেমন আগুনের ফুলকি বেরুতে থাকে এও অনেকটা তেমনি। প্রতিটি আলোর ফুলকি গুণে ব'লে দেওয়া যায় কয়টি আলফাকণা ধাতব পর্দাটিকে আঘাত করল। অবশ্য বিটাকণার আঘাতে যে আলোর ফুলকি সৃষ্টি হয় তা খুব স্পষ্ট নয়। তাই আলোর ফুলকি দেখে বিটাকণার সংখ্যা গণনা করা যায় না।

এমনি ক'রে প্রথম আলফারশ্মি এবং পরে বিটারশ্মি দিয়ে পর্দার গায়ে আঘাত করলে ঝলকে ঝলকে আলোর ফুলকির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কিন্তু গামারশ্মি দিয়ে আঘাত করলে একটি আলোর ফুলকিও পর্দার গা থেকে বেরোয়

না। এ পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ইলেকট্রন ও প্রোটন 'কণা'র মত কঠিন পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আলফারশ্মির প্রোটন এবং বিটা-রশ্মির ইলেকট্রন অতি সহজেই আলোর ফুলকি সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু গামা-রশ্মি পারে না। কারণ গামারশ্মি পদার্থকণা নয়—শুধু আলোক তরঙ্গের সমষ্টিমাত্র। এভাবে বিভিন্ন পরীক্ষায় নির্ভুলভাবে পদার্থের অন্তিম 'কণা'-রূপটি ধরা পড়ল। পদার্থের মৌলিক উপাদানের উল্লেখ হ'লে তাই ইলেকট্রন ও প্রোটনকে আখ্যা দেওয়া যায় 'ইলেকট্রনকণা' এবং 'প্রোটনকণা' ব'লে। যেন অন্তিমরূপে ইলেকট্রন ও প্রোটন আমাদের চোখে দেখা যায় না এমনতর অতি সূক্ষ্ম ও কঠিন গোলকের মত কণা মাত্র।

পদার্থের তরংগরূপ

ইলেকট্রন ও প্রোটন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ছাড়া কিছু নয়, এ ধারণায় প্রথম আঘাত করলেন বিজ্ঞানী লুই দে ব্রগলি। প্রকৃতি সব সময়েই স্বল্পতম শ্রমে নিজের কার্য সমাধা করে। গতি বিজ্ঞানে এ নীতি বহুকাল হ'তে পরিচিত ছিল। একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানে যেতে যতটুকু সময় না হলে নয় তার চেয়ে একটু বেশি সময়ও নেবে না ঢিলটি এবং ক্ষুদ্রতম যে পথটি দিয়ে না গেলে চলে না তার একটু অতিরিক্ত পথও ঘুরে যাবে না সে। এই জন্যেই দেখা যায় আকাশে একটি ঢিল ছুঁড়ে দিলে ঢিলটি অর্ধবৃত্ত অর্থাৎ ডিমের মতো চক্রাকার পথ রচনা ক'রে গিয়ে পড়ে দূরে। বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে প'ড়ে আর কোন পদার্থখণ্ড যখন স্থান হ'তে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয় তখন যতটুকু কম সময় না হ'লে তার চলে না, বা যতটুকু বেগে না ছুটলে নয়, ঠিক ততটুকু সময় নেবে বা ততটুকু বেগে ছুটবে পদার্থখণ্ডটি, তার একটু অতিরিক্ত সময় বা বেগের অপব্যবহার করবে না। এটা হচ্ছে প্রকৃতির বিধান আর গতিবিজ্ঞানের একটি মূলনীতি। কিন্তু দেখা যায় পরমাণু এবং ইলেকট্রনেরা গতিবিজ্ঞানের ঐ নিয়মকে মেনে চলে না। এই অসামঞ্জস্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী ব্রগলি 'কণা' ও 'তরংগের' গতি ও প্রকৃতির পাস্পরিক সম্বন্ধ অংকের সাহায্যে আলোচনা ক'রে তিনি বলেন ইলেকট্রন পদার্থ 'কণা' ব'লে ধরে নিলে এ অসমাঞ্জস্যের সমাধান হবে না কোনদিন। তিনি তাই ইলেকট্রনকে আখ্যাত করলেন তরংগরূপে। বললেন, যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য আলোক রশ্মি আলোকতরংগ ছাড়া

আর কিছু নয়, সে সব বৈশিষ্ট্য ইলেকট্রনেও রয়েছে। সুতরাং ইলেকট্রন শুধু কণা নয়, তরংগও। এই সিদ্ধান্ত ক'রে ছুটে চলা ইলেকট্রনের তরংগদৈর্ঘ্য কত হবে তা'ও অঙ্ক ক'ষে নির্ধারিত ক'রে দেন তিনি।

বিজ্ঞানী ব্রগলি গতিবিজ্ঞানের মূলনীতিতে সামঞ্জস্যবিধানপ্রয়াসে ইলেকট্রনকে তরংগ ব'লে অভিহিত করলেন বটে, কিন্তু গবেষণাগারে ইলেকট্রনের তরংগরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিতে পারলেন না। গতি-বিজ্ঞানের গবেষণায় ইলেকট্রনের তরংগরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ হবার তিন বছর পর ১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী ডেভিসন ও গারমার (Davission and Germer) সর্বপ্রথম হাতে কলমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দেন ইলেকট্রনদের তরংগরূপ। এর পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা আরও নানাপ্রকারের পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক'রে দেন বিজ্ঞানী ব্রগলির মতামতের সত্যতা। শুধু যে ইলেকট্রনের প্রকৃতি তরংগ ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে তাই নয়, তিনি আগে থেকেই ইলেকট্রনের তরংগদৈর্ঘ্যের যে মাপ হিসেব ক'রে বের করেছিলেন, প্রত্যক্ষ গবেষণায় মাপা ইলেকট্রনের তরংগদৈর্ঘ্যের সংগে সেই মাপ আশ্চর্যরূপে মিলে গিয়ে তাঁর আংকিক গবেষণার নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে।

ইলেকট্রন যে তরংগ ঐ সিদ্ধান্তটিকে যথাযথ অনুধাবন করতে হ'লে দৃশ্যমান আলোকরশ্মি ও অদৃশ্য রঞ্জনরশ্মির তরংগ-প্রকৃতি এবং যে যে পরীক্ষায় এদের তরংগ-প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে তার গোড়ার কথা কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

জলতরংগের উদাহরণ

জলের বুকে ঢেউ খেলতে দেখে, ঝোলান দড়ির একমাথা দিয়ে দড়ির গা বেয়ে তরতর ক'রে সর্পিল দোলা নেমে যেতে দেখে স্বভাবতই জিজ্ঞাসুর মনে প্রশ্ন জাগবে—জলের ঢেউয়ে এবং দড়ির দোলায় যে তরংগ খেলে যাচ্ছে তার যথার্থ স্বরূপ কি? বস্তুকে স্থানান্তরিত না ক'রে বস্তুর গা বেয়ে যে গতির দোলা চলে যায় তাই তরংগ। জলের উপর দিয়ে যখন তরংগ বয়ে যায় তখন জলের কণাগুলি উপরে নীচে দোলা খেয়েও যার যার আপনার জায়গায়ই থেকে যায়। কিন্তু ঢেউয়ের আকারে একটা গতিস্পন্দন ছড়িয়ে যায় চারদিকে। ঢেউ-দোলান জলের বুকে এক টুকরো শোলা ফেলে দিলে দেখা

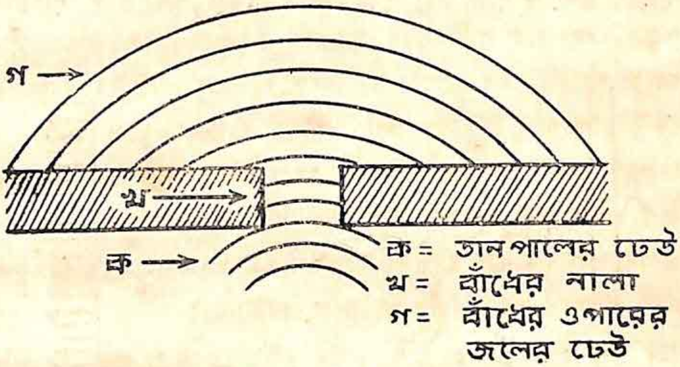
যাবে এক একটা ঢেউয়ের দোলা ব'য়ে যাচ্ছে আর শোলাটি একবার উপরে উঠছে আর একবার নীচে নামছে, কিন্তু স্থানচ্যুত হ'য়ে কখনও সামনে বা পিছনে যাচ্ছে না। কারণ ঢেউয়ের বিক্ষেপই শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, জলের কণা যাচ্ছে না।

জলের বুকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে দোল লাগে জলের গায়। এবং একটার পর একটা ঢেউ সমান বেগে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সারি সারি ঢেউগুলি একবার উঁচুতে উঠছে আবার নীচে নেমে যাচ্ছে। সব চেয়ে উঁচু দিককে বলে ঢেউয়ের মাথা এবং সব চেয়ে নীচুকে বলে ঢেউয়ের তলা। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে ঠিক পরের ঢেউয়ের মাথার যে দূরত্ব তাকে বলা হয় তরংগদৈর্ঘ্য (wave length), অর্থাৎ এক একটি ঢেউ কতখানি লম্বা তার মাপ ঠিক করা হয় এই দূরত্ব দিয়ে। যদি বলা যায় দুটি ঢেউএর মাথার দূরত্ব এক হাত, তা'হ'লে বুঝতে হবে ঢেউটি একহাত লম্বা। এক সেকেণ্ডে একটি ঢেউ যতদূর যেতে পারে তাই দিয়ে মাপা হয় ঢেউয়ের গতি। যদি এক সেকেণ্ডে পনেরো গজ এগিয়ে যায় একটি ঢেউ তা' হ'লে বলা হয়—ঢেউয়ের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে পনেরো গজ। তেমনি ঢেউয়ের স্পন্দন-সংখ্যা নির্ধারিত হবে একটা নির্দিষ্ট স্থানের জল এক সেকেণ্ডে কতবার ঢেউয়ের মাথারূপে উপরে উঠল ও নামল তাই দিয়ে। একটা শোলা যদি জলের বুকে কুড়িবার ওঠানামা করে এক সেকেণ্ডে, তা' হ'লে বলব তরংগের স্পন্দন সংখ্যা হল কুড়ি। এমনি ক'রে একটি তরংগ কত বড় লম্বা, কতবার স্পন্দিত হয়, উচ্চতা কত এবং কোন পক্ষে, অর্থাৎ ঢেউয়ের মুখ উপরের দিকে চলছে না নীচের দিকে আছে—এই সব কয়টি সংবাদ পেলে একটি ঢেউয়ের গোটা পরিচয় জানা হ'য়ে যায়। তরংগ সম্বন্ধে এই সাধারণ কথা কয়টি মনে রেখে তরংগের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংগে আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, যেন তরংগের এই বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই জল-তরংগ, আলোক-তরংগ ও ইলেকট্রন-তরংগের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

তরংগ বিসরণ ও তরংগ সংঘর্ষণ

বিসরণ ও সংঘর্ষণ (diffraction and interference) তরংগ প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তরংগের প্রকৃতি বোঝবার জন্যে জলতরংগের

উদাহরণ দিয়েই শুরু করা যাক। কল্পনা করা যাক একটা পুকুরের মাঝামাঝি একটা বাঁধ বেঁধে দিয়ে পুকুরটিকে দু'ভাগ করা হ'ল। কিন্তু বাঁধের মাঝখানে কেটে দেওয়া হ'ল একটা সরু নালা। যেন এ পাশের জলের সংগে ওপাশের সংযোগ থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। তখন ডানপাশের জল নেড়ে দিয়ে যদি

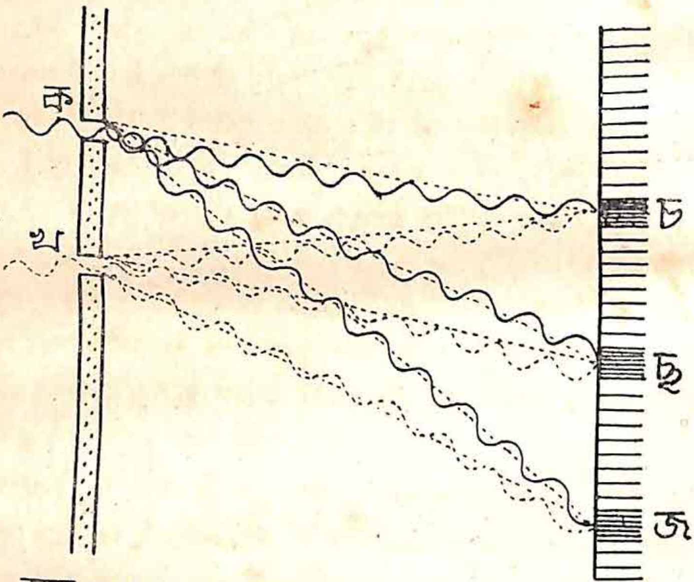


তরংগ বিসরণ

তরংগ তোলা যায় জলে, তা' হ'লে যে জায়গাটিতে তরংগ সৃষ্টি হ'ল তাকে কেন্দ্র ক'রে বৃত্তাকারে জলতরংগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ঢেউয়ের স্পন্দন নালার মুখ দিয়ে ঢুকে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করবে। মনে করা যাক ছড়িয়ে পড়া ঢেউয়ের একটি তরংগখণ্ড নালার ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। নালার সীমা পার হয়ে খণ্ড ঢেউটি ওপারের নিস্তরংগ জলের মধ্যে গিয়ে যখন পড়বে তখন ঢেউয়ের অবস্থাটা কি হবে? নালার মধ্যে ঢেউটির যে সীমাবদ্ধ আকৃতি ছিল তেমনি আকৃতিতেই কি একটি খণ্ড ঢেউ সরাসরি চলে যাবে বাঁধের ওপারের জলে?—তা যাবে না। নালার আবদ্ধ সীমা থেকে মুক্তি পেয়েই খণ্ড ঢেউটি আবার বৃত্তাকারে পূর্ণতরংগ রূপে ছড়িয়ে পড়বে জলের চারদিকে। বাঁধের এপারে ঢেউ যতবড় লম্বা ছিল, যত তার ছিল স্পন্দন সংখ্যা, যে গতিবেগে সে ছড়িয়ে পড়েছিল বৃত্তাকারে, ঠিক সেই তরংগদৈর্ঘ্যে, স্পন্দনসংখ্যায় ও গতিবেগে নালা থেকে মুক্তি পাওয়া জলতরংগও বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। নালার মুখে বাধা পেয়ে তরংগ এমনিভাবে যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তারই নাম তরংগ বিসরণ।

তরংগ সংঘর্ষণ
(Interference)

আমাদের কল্পনাটি এবার আরও কিছুটা সম্প্রসারিত করা যাক। মনে করা যাক বাঁধের প্রথম নালাটির পাশে আরেকটি নালা কাটা হ'ল। এবার জলের তরংগ দু'টি নালা দিয়ে একই ঢেউয়ের দুটি খণ্ডরূপে পার হ'য়ে গিয়ে পড়বে বাঁধের ওপরের জলে, এবং দু'টি নালার ঢেউই বৃত্তাকার তরংগে ছড়িয়ে



কচ = খচ ; কছ = খছ + ½ λ ;
কজ = খজ + λ ; λ = তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

[একই ঢেউয়ের দু'টি খণ্ড নালার ভিতর দিয়ে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। চ, ক ও খ থেকে সমান দূরে অবস্থিত। চ'র নিকটে ক ও খ মুখ থেকে আসা দু'টি ঢেউই উপরের দিকে মুখ ক'রে ঝুঁকে রয়েছে। এর ফলে চ'র কাছে ঢেউ দু'টি সংযুক্ত হয়ে ডবল উঁচু একটি ঢেউ গ'ড়ে তুলেছে। 'খ' থেকে 'ছ'র দূরত্ব 'ক' থেকে 'ছ'র যা দূরত্ব তার অর্ধেক, তরংগদৈর্ঘ্য কম। 'ছ'তে ঢেউয়ের মাথা দুটি উল্টোদিকে মুখ ক'রে ঝুঁকে ঝুঁকে রয়েছে। এরূপ উল্টোমুখী হওয়ায় 'ছ'র কাছে 'ক' ও 'খ' থেকে আসা ঢেউ দুটি পরস্পর কাটাকাটি ক'রে জলকে নিস্তরংগ সমতল ক'রে রেখেছে। আবার 'কজ' দূরত্বে 'খজ' থেকে এক তরংগদৈর্ঘ্য বেশি। এর ফলে 'ক' থেকে আসা ঢেউয়ের তলার সংগে 'ঘ' থেকে আসা ঢেউয়ের তলার সংযোগ হয়ে 'জ'তে ঢেউ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।]

পড়তে চাইবে নালার চারধারে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই প্রথম নালা থেকে বেরিয়ে আসা তরংগের সংগে দ্বিতীয় নালার তরংগের সংগে বাধবে ঠোকাঠুকি। এই তরংগ-সংঘর্ষের ফলে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে জলের ওপর। দেখা যাবে কোথাও জল নিস্তরংগ হ'য়ে পাটির মতো সমতল হ'য়ে গেছে, আবার কোথাও নালা থেকে আসা ঢেউয়ের সারি দ্বিগুণ উঁচু হ'য়ে খণ্ড তরংগ এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। এমনি ক'রে নালার এ পাশের জল চমৎকার ভাবে সুবিন্যস্ত হ'য়ে যাবে সারি সারি খণ্ড ঢেউয়ের পর পর সাজান ডবল উঁচু তরংগ ফালিতে এবং সমস্ত নিস্তরংগ জলের ফালিতে। তরংগে তরংগে সংঘর্ষের ফলে পাশাপাশি ডবল উঁচু তরংগের ফালিতে এবং নিস্তরংগ ফালিতে সমস্ত জল বিন্যস্ত হয়ে যে ঘটনা ঘটায় তাকে বলে তরংগ সংঘর্ষণ (interference)। সমজাতের এবং সমপ্রকৃতির সমদৈর্ঘ্যের তরংগ পরস্পর ঠোকাঠুকি ক'রে এমন সারি সারি দ্বিগুণ উঁচু তরংগ ফালির ও নিস্তরংগ ফালির বিন্যাস সৃষ্টি করে কেন ? একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তরংগের প্রকৃতি অনুধাবন করলেই স্পষ্ট হ'য়ে পড়বে এর কারণ।

নালা দু'টির মুখ থেকে যে ঢেউ বেরিয়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তাদের প্রত্যেকটি তরংগ লম্বায় সমান মাপের এবং সামনের দিকে এগিয়েও যাবে তারা সমান বেগে। দু'টি মুখ থেকেই বেরিয়ে এসে ঢেউগুলি চারদিকে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়তে চাইবে। ফলে প্রথম নালা থেকে আসা ঢেউয়ের সংগে দ্বিতীয় নালা থেকে আসা ঢেউয়ের ঘটবে সংঘর্ষ। কি অবস্থায় ঢেউ দু'টি পরস্পরের সংগে এসে মিলবে, তার ওপরে নির্ভর করবে মিলিত তরংগ দ্বিগুণ উঁচু হবে কি পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে নিস্তরংগ হ'য়ে যাবে। ঢেউ দু'টি যখন উপরের দিকে উঠ্‌ছিল তখন যদি ঢেউয়ের মাথা দু'টি একসাথে এসে মেলে, তা'হ'লে ঢেউয়ের মাথাদু'টি সংযুক্ত হয়ে দ্বিগুণ উঁচু একটি সংযুক্ত ঢেউয়ের মাথা গ'ড়ে তুলবে। কিন্তু যদি এমনি অবস্থায় এসে মেলে পরস্পরে, যখন একটা ঢেউ উঠছিল উপরের দিকে আরেকটা ঢেউ নামছিল নীচের দিকে, অর্থাৎ একটা ঢেউয়ের মাথার সংগে যদি আরেকটা ঢেউয়ের তলা এসে যুক্ত হয়, তা হ'লে সমান বেগের ও সমান লম্বা অর্থাৎ সম প্রকৃতির ঢেউ দু'টি সে স্থানের জলকণাগুলিকে পরস্পরের উল্টো দিকে টানতে থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকটি ঢেউয়ের সমান জোর হওয়ায় তরংগ দু'টি নিজেরাই কাটাকাটি ক'রে ক্ষয় হ'য়ে যাবে এবং সেখানকার জলের ওপরে ঢেউয়ের কোন প্রভাবই থাকবে

না। ফলে, সে জায়গার জল হবে পাটির মতো নিস্তরংগ। আবার যদি ছ'টি ঢেউয়ের মাথা না হ'য়ে তলা এসে একত্রিত হয় তা হ'লেও ঢেউ ছটি সংযুক্ত হবে এবং সংযুক্ত ঢেউয়ের তলা হবে দ্বিগুণ গভীর; এই কথা কয়টিকেই অন্যভাবে বলা যায়—কোথায় জল নিস্তরংগ হবে এবং কোথায় তরংগ সংযুক্ত হ'য়ে দ্বিগুণ উচ্চতা লাভ করবে তা নির্ভর করবে নালা ছ'টির মুখ থেকে কতদূরে এসে তরংগ ছ'টি মিলবে সেই দূরত্বের উপর। যে স্থানে এসে মিলবে ঢেউ ছ'টি নালা ছ'টির মুখ থেকে সে স্থানের যে দূরত্ব হবে তা'র পার্থক্য যদি হয় এক, ছুই, তিন, চার এমনি গুণিতক সংখ্যার তরংগদৈর্ঘ্যের সমান, তা'হ'লে তরংগ ছ'টি সংযুক্ত হয়ে দ্বিগুণ উচ্চতার একটি মিলিত তরংগের সৃষ্টি করবে। কিন্তু নালা ছ'টির মুখ থেকে সংযোগ স্থলের দূরত্বের ব্যবধান বা পার্থক্য যদি হয় আধা, দেড়, আড়াই, সাড়ে তিন ইত্যাদি তরংগদৈর্ঘ্যের সমান তা'হ'লে ঢেউ ছ'টি পরস্পর কাটাকাটি ক'রে নিস্তরংগ হ'য়ে পড়বে। এই একই যুক্তি খাটবে নালার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শত শত ঢেউয়ের বেলায়, এবং যে হেতু আধ-এর পর এক, একের পর দেড়, দেড়ের পর ছুই, এমনি ক'রে সংখ্যাগুলি পর পর বেড়ে যাচ্ছে, তাই জলের বুকেও দেখা যাবে একফালি নিস্তরংগ জল, তার পাশেই একটি দ্বিগুণ তরংগের ফালি এবং তার পাশে আবার নিস্তরংগ জল এবং পরে আবার তরংগ। এমনি ক'রে পরপর পাশাপাশি সাজান তরংগ ও নিস্তরংগের বিকাশে এক বিচিত্র চিত্র গ'ড়ে উঠবে জলের বুকে।

জলের এই তরংগপ্রকৃতি জানবার পর স্বভাবতই একটা প্রশ্ন উঠবে—দৃশ্যমান আলোর রশ্মি যদি তরংগ, তা'হলে আলোকতরংগও তো নালার মত খিড়কি দিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সারা ঘর আলোয় ভ'রে দেবে। বাধা পেলে জলতরংগের মতো বাধার গা ঘেঁষে বেঁকে যাবে এবং ছ'টি আলোকতরংগ চলার পথে পরস্পরে সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিস্তরংগ ও দ্বিগুণ উঁচু জলতরংগের মত ডোরা ডোরা আলো আঁধারের সৃষ্টি করবে। কিন্তু প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আলোক এমনতর তরংগগুণের কোনও পরিচয় দেয় না। বেড়ার সারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুটো দিয়ে প্রভাত সূর্যের আলো তীরের ফলকের মতো সোজাই চলে যায়। ফুটোর ধারে আঘাত পেয়ে একটু বাঁকেও না, অন্ধকার ঘরে ঢুকে একটু ছড়ায়ও না। অন্ধকার ঘর অন্ধকারই থাকে। শুধু মাঝখান দিয়ে চলে যায় ঋজু একটা আলোর রেখা। আলোর এরূপ তীরের ফলকের মত সোজা চলবার প্রকৃতি দেখে আঠার শতাব্দীর

বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আলো তরংগ নয়, অজস্র পদার্থ-কণার সমষ্টি। পদার্থ-কণা তো আর তরংগের মত একাই অজস্র হ'য়ে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। তাই আলোক রশ্মিরও বিসরণ হয় না। এই ছিল পুরানো যুক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে কিন্তু আলোর খাঁটি রূপ ধরা পড়ল। জানা গেল আলোও তরংগ, কিন্তু আলোকতরংগ লম্বায় অতি ক্ষুদ্র —এতো ক্ষুদ্র যে একটি দৃশ্যমান আলোকতরংগের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আলোকতরংগ অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন বাধাকেই বাধা ব'লে গ্রাহ্য করে না। তাই তরংগাকারে ছুটে চলবার বেলায় এধারে ওধারে বেঁকেও যায় না এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রকেও আলোকতরংগেরা চলার পক্ষে প্রশস্ত পথ ব'লেই মনে করে। যদি তীক্ষ্ণধার কিনারাযুক্ত এমন সূক্ষ্ম ছিদ্র করা যায় কোন বেড়ার গায় যা প্রস্থে মাত্র কয়েকটি তরংগের সমান, অর্থাৎ যেন ছিদ্রের ভিতর যাবার সময় আলোকতরংগকে ছিদ্রের এ-কিনারে সে-কিনারে ঠেকে ঠেকে যেতে হয়, তা'হ'লে ছিদ্রের ওপারে যেয়ে আলোর তরংগ জলতরংগের মত ছড়িয়ে যাবে চারদিকে এবং সৃষ্টি করবে আলোর বর্ণালী। যদি ছিদ্রের প্রস্থ হয় দু'টি তরংগদৈর্ঘ্যের সমান, তা'হলে ৩০° ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি ক'রে ছড়িয়ে পড়বে আলো। আর যদি ছিদ্রের প্রস্থ হয় একটা আলোক-তরংগের অর্ধেক লম্বা তা'হ'লে অজস্র তরংগ রূপে সমান ভাবে চারদিকেই ছড়িয়ে পড়বে ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসা আলোক তরংগ। ছিদ্র যদি একটি না হ'য়ে দু'টি হয়, তা'হ'লে জলতরংগের মতই ছড়িয়ে পড়া আলোকতরংগের মধ্যে ঘটবে সংঘর্ষ, এবং উল্টোমুখী আলোকতরংগেরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে সৃষ্টি করবে অন্ধকারের ফালি আর একমুখী তরংগেরা সংযুক্ত হ'য়ে গ'ড়ে তুলবে চারগুণ উজ্জ্বল আলোকতরংগের ফালি।

কিন্তু এমনতর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র করা বিশেষ কঠিন কাজ। এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের একভাগ স্থান নিয়ে একটি ছিদ্র করা কি সহজ কাজ? উনবিংশ শতাব্দীতে এমনিতর সূক্ষ্ম ছিদ্র করার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। সরাসরি ছিদ্র না ক'রে একখানি কাচের গায় তীক্ষ্ণধার হীরকের মুখ দিয়ে যদি সমান্তরালে আঁচড় কেটে লাইন কাটা যায়, তা'হ'লে কাচটি একটি ঝাঁঝরা কাচে পরিণত হবে। কিন্তু দেখতে হবে ঝাঁঝরা কাচের আঁচড়গুলি যেন খুব ফাঁক ফাঁক না হয়। একটা আঁচড়ের চেয়ে অপর একটা আঁচড়ের দূরত্ব

বড় জোর দু' তিনটা তরংগের যুক্তলম্বত্ব থেকে যেন বেশি না হয়, আবার যেন একটি তরংগের অর্ধেক লম্বার চেয়ে ছোট না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক ইঞ্চি কাচের গায় যদি বত্রিশ হাজার আঁচড় কাটা যায় তা'হ'লেই আলোকরশ্মির তরংগরূপ পরীক্ষা করা চলবে। আঁচড়ের সংখ্যা দু'টি না হয়ে বেশি হওয়ায় আলো-বিসরণের কোন তারতম্য হবে না বরং সংযুক্ত আলোর ডোরাগুলি বেশি উজ্জল হয়ে স্পষ্ট দেখাবে।

এমনিতর ঝাঁঝরা কাচের গায়ে আলোকপাত করলে কাচের গায়ে পড়া একটিমাত্র আলোকতরংগ আঁচড়ের তীক্ষ্ণধার আঘাত পেয়ে বহু তরংগরূপে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু প্রত্যেকটি তরংগ লম্বায় হবে সমান। এই সমস্ত তরংগেরা পরস্পর ঠোকাঠুকি করবে এবং যখন দু'টি তরংগ উল্টোদিকে যাওয়ার মুখে পরস্পর এসে সংঘর্ষ বাধাবে তখন পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে নিস্তেজ হ'য়ে অন্ধকারের সৃষ্টি করবে। কিন্তু যেখানে ঢেউ দু'টি একই দিকে যাওয়ার মুখে এসে মিলবে, সেখানে পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে উজ্জলতর আলোকতরংগের সৃষ্টি করবে। ঝাঁঝরা কাচদ্বারা বিসরিত আলোকের যদি ফটো নেওয়া যায় তা'হ'লে দেখা যাবে ফটোটি কতগুলি পরস্পর সাজান সাদা ও কালো ডোরায় ভ'রে রয়েছে। মসলিন কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেখলে অনেক সময় এমনিতর বিসরিত আলোর বর্ণালী দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতিতে যে অহরহ এরূপ আলোকতরংগের সংঘর্ষণ ঘটেনা তার কারণ আলোকতরংগের ক্ষুদ্রত্ব এবং যে তীক্ষ্ণধার কিনারায় আঘাত পেয়ে আলোক ছড়িয়ে পড়বে এমনতর বাধার অভাব।

রঞ্জনরশ্মি

দৃশ্যমান আলোর তরংগরূপ পরীক্ষায় ধরা পড়ার পর সমস্যা দেখা দিল অদৃশ্যমান রঞ্জনরশ্মির রূপ নিয়ে। রঞ্জনরশ্মির তরংগগুলি দৃশ্যমান আলোক-তরংগের চেয়ে লক্ষগুণ ক্ষুদ্রাকারের। সুতরাং ঝাঁঝরা কাচের যে তীক্ষ্ণধার কিনারা তাও রঞ্জনরশ্মির কাছে মোটেই তীক্ষ্ণ নয়। তাই ঝাঁঝরা কাচের গায় আলো ফেলে রঞ্জনরশ্মির তরংগ বিসরণ ও তরংগ সংঘর্ষণ কোনটাই সম্ভব নয়। ফলে পরীক্ষা দ্বারা রঞ্জনরশ্মির তরংগরূপ নির্ণয় করা বহুদিন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ১৯২২ সালে বিজ্ঞানী লাউয়ে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। বিজ্ঞানী লাউয়ে, ভাবেন, কৃত্রিম উপায়ে ঝাঁঝরা কাচ তৈরি করার প্রয়োজন কি? প্রকৃতিতেই

তো অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের চমৎকার ঝাঁঝরা কাচ রয়েছে। দানাদার বস্তুর মধ্যে পদার্থপরমাণুগুলি এমন সুবিন্যস্ত ভাবে সারিতে সারিতে সাজান এবং পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে এমন সূক্ষ্ম স্থান র'য়েছে যে একটুকরা দানাদার পদার্থ দিয়েই ঝাঁঝরা কাচের কাজ চালান যাবে। কল্পনাটি তিনি কাজে লাগালেন। জিংক সালফাইডের একটি দানা নিয়ে এবং দানার অক্ষটিকে ঠিকমত বসিয়ে রঞ্জন-রশ্মিপাত করলেন দানার গায়ে। এ পরীক্ষায় লাউয়ের কল্পনার যথার্থতা প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল রঞ্জনরশ্মিতরংগ সারিতে সারিতে এবং ফালিতে ফালিতে সাজান সুবিন্যস্ত পরমাণুর গা থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে তরংগ সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। একই তরংগ সম অবস্থায় মুখ ক'রে এসে বিভিন্ন স্তরের পরমাণুর গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে ভিন্ন অবস্থায় ফিরে যায় দানার গা থেকে। তরংগ-মুখের অর্থাৎ প্রতি ঢেউয়ের মাথা ও তলা প্রতিফলনের আগে সমপর্যায়ে থাকলেও প্রতিফলনের পরে বিভিন্ন হ'য়ে যায়। ফলে ফিরে যাওয়া তরংগ-শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। রঞ্জনরশ্মির এই তরংগ সংঘর্ষণের ফটো নিলে দেখা যাবে ফটোর গায়ে চক্রাকার ছড়িয়ে আছে কতগুলি সাদা ও কালোবর্ণের ডোরা। লাউয়ের মূলনীতির উপর ভিত্তি ক'রে পরীক্ষা ক'রে রঞ্জনরশ্মির তরংগরূপের ফটো গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

ইলেকট্রন তরংগ

সাধারণভাবে তরংগের প্রকৃতি আলোচনার পরও রঞ্জনরশ্মির তরংগ-প্রকৃতি আলোচনা করা হ'ল এই জন্যে যে রঞ্জনরশ্মির তরংগের সংগে ইলেকট্রন তরংগের একটা বিশেষ সামঞ্জস্য র'য়েছে। যে পরীক্ষণ-পন্থায় রঞ্জনরশ্মির তরংগরূপ সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে, ঠিক সেই পন্থায়ই ইলেকট্রনের তরংগরূপ বার করাও সম্ভব হয়েছে। রঞ্জনরশ্মির মতই ইলেকট্রন তরংগগুলিও অতি ক্ষুদ্র আকারের। এবং রঞ্জনরশ্মির মতই ইলেকট্রন তরংগের কোনও নির্দিষ্ট মাপ নেই। ইলেকট্রনের তরংগদৈর্ঘ্য নির্ভর করে ইলেকট্রনের গতিবেগের ওপরে। ইলেকট্রনের গতি আবার নির্ভর করে যে-জোরে পদার্থ থেকে ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়েছে সেই আদি গতির ওপর। ৭০ ভোল্ট বৈদ্যুতিক চার্জের জোরে ইলেকট্রনের জন্ম হ'লে ইলেকট্রনের তরংগদৈর্ঘ্য হবে ১·৫A°। [এক এ্যাংগষ্ট্রম একককে A° চিহ্নিত করা হয়। এক এ্যাংগষ্ট্রম একক এক সেন্টিমিটারের দশকোটি ভাগের একভাগের সমান। প্রায় আড়াই সেন্টিমিটার

এক ইঞ্চির সমান। খুব সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যের মাপ আলোকবিজ্ঞানে যে এককে মাপা হয় তাকে এ্যাংগষ্ট্রম একক বলা হয়।] ১০০ ভোল্টে হবে ১·০A°, ৩১০ ভোল্টে হবে ০·৭A°। চলার পথে ইলেকট্রন যদি ধীরে ধীরে ছোটে তা'হ'লে ইলেকট্রন তরংগগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত লম্বা হবে। কিন্তু ইলেকট্রনের ছুটে চলবার গতি যদি হয় দুরন্ত, তা'হ'লে তরংগের আকার ক্রমশ ছোট হ'য়ে যাবে। তরংগ যদি লম্বা হয় তা'হ'লে তরংগ সংঘর্ষণ ঘটানর পক্ষে সুবিধা হয়, কিন্তু তরংগ সংঘর্ষণের ফল পর্য্যবেক্ষণ করার পক্ষে আবার তেমনি কঠিন হয়। তাই পরীক্ষার জন্য এমনি বেগের ইলেকট্রনকে কাজে লাগান হয় যাদের বেগ খুব কমও নয় আবার অত্যন্ত বেশিও নয়। ইলেকট্রনের গতি এমনি ভাবে বাছাই করা হয় যেন তরংগ বিসরণও ভাল হয় সংগে সংগে বিসরিত তরংগের ফটোও মোটামুটি স্পষ্ট হয়।

রঞ্জনরশ্মির পন্থায় ইলেকট্রনের তরংগরূপ পরীক্ষায় আরেকটি অসুবিধা রয়েছে। পদার্থ ভেদ করার ক্ষমতা রঞ্জনরশ্মির এত তীক্ষ্ণ যে রঞ্জনরশ্মি পদার্থের অন্তর ভেদ ক'রে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইলেকট্রন একটা পাতলা ধাতব পাতও ভেদ করতে পারে না। তাই পরীক্ষার কাজে অতি পাতলা যে দানাদার ধাতব পাত ব্যবহার করা হয় তার প্রস্থ এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।

পরীক্ষা করা হয় এই ভাবে। ব্যাটারীর একটি তড়িৎদ্বার থেকে উৎপন্ন করা হয় ইলেকট্রন রশ্মি (ইলেকট্রন রশ্মিকে ক্যাথোড রশ্মিও বলা যেতে পারে কারণ ক্যাথোড রশ্মি তো ইলেকট্রনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়)। এই ইলেকট্রন রশ্মি কয়েকটি অতি সূক্ষ্ম সমান্তরাল ছিদ্র পার হয়ে তীক্ষ্ণ একটি রশ্মির মত এসে পড়ে একটি অতি পাতলা ধাতব পাতের উপর। এই ধাতবপাতে আহত হ'য়ে একটি ইলেকট্রন তরংগ থেকে সৃষ্টি হয় বহু ইলেকট্রন তরংগ। এই ইলেকট্রন তরংগগুলি বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে এবং রঞ্জনরশ্মির মতো বিভিন্নমুখী তরংগগুলির মধ্যে ঘটে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে অন্যান্য আলোর তরংগের মতই কোন কোন তরংগ পরস্পরে কাটাকাটি করে নিস্তরংগ হ'য়ে যায়। আবার কোন কোন তরংগ সংযুক্ত হয়ে উজ্জ্বলতর তরংগের সৃষ্টি করে। এইজন্য পরীক্ষায় পাওয়া ইলেকট্রন তরংগ সংঘর্ষণের ফটো নিয়ে দেখা গেছে হুবহু রঞ্জনরশ্মির মত গোল গোল সাদা-কালোর ডোরায় ফটোর প্লেটটি ভ'রে গেছে। তরংগ সংঘর্ষণের এরূপ ফটো দেখে নিঃসংকোচে বলা

যেত যে ইলেকট্রনও আলোকতরংগের মতই এক প্রকার তরংগ কিন্তু এ পরীক্ষায় একটু সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। ইলেকট্রন খুব দুরন্ত বেগে ছুটে গিয়ে কোন পদার্থের উপর আঘাত করলে সাধারণত দেখা যায় সেই পদার্থ থেকে রঞ্জনরশ্মি নির্গত হয়। সুতরাং ইলেকট্রনের তরংগরূপ পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় অতি পাতলা ধাতবপাতের গায়ে আঘাত ক'রে ইলেকট্রন যে রঞ্জনরশ্মির জন্ম দেয়নি, এবং ফটোতে যে তরংগ সংঘর্ষণের ছবি পাওয়া যায় তা' যে রঞ্জনরশ্মি তরংগ সংঘর্ষণের ছবি নয়, তার প্রমাণ কি? এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য ধাতব পাত থেকে নির্গত হওয়া তরংগের সামনে একটি চুম্বক এনে ধরা হ'ল। যদি নির্গত তরংগ রঞ্জনরশ্মি হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে তরংগ যেখানে রয়েছে, একটুও স্থানান্তরিত না হ'য়ে ঠিক সেইখানেই রয়ে যাবে। কারণ রঞ্জনরশ্মি চুম্বকের প্রভাবের কোন ধার ধারে না। কিন্তু নির্গত তরংগ যদি হয় ইলেকট্রন তরংগ, তা'হ'লে চুম্বকের প্রভাবে সমস্ত ইলেকট্রন তরংগ স্বাভাবিক চলার পথ থেকে বেঁকে যেতে বাধ্য হ'বে। কারণ ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে নেগেটিভ বিদ্যুতের গুণ। নির্গত তরংগের সামনে চুম্বক রেখে ফটো তুলে দেখা গেল আগের জায়গা থেকে সাদা কালো বৃত্তাকার ডোরাগুলি একপাশে বেড়ে গেছে। এই পরীক্ষার ফলে নিঃসন্দেহে এবং চূড়ান্তরূপে বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত হল যে আলোকতরংগের মত ইলেকট্রনও একপ্রকার বিশেষ জাতের পদার্থতরংগ।

সংঘর্ষণ ছাড়া তরংগের আর যে সব গুণ আছে পরবর্তী গবেষণায় ইলেকট্রন তরংগের মাঝে সে সব গুণেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রোটন তরংগ

১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী রুফ (Ruph) একই পন্থায় প্রোটনের তরংগ প্রকৃতিও আবিষ্কার করেন এবং প্রোটনতরংগ সংঘর্ষণে পাওয়া সাদা কালো চক্রাকার ডোরার ফটোও তোলেন। অবশ্য প্রোটনের তরংগপ্রকৃতি পরীক্ষায় সাধারণ ধাতুর বদলে সোনার পাত ব্যবহার করা হয়, এবং যে পজিটিভ রশ্মির প্রোটনকে পরীক্ষার কাজে লাগান হয় তা' উৎপন্ন করা হয় প্রায় দু'লক্ষ ভোল্ট চার্জের প্রভাবে।

এমনিভাবে শুধু যে ইলেকট্রন প্রোটনের তরংগরূপই আবিষ্কৃত হ'ল

তাই নয়, পরমাণুর প্রকৃতিও যে তরংগের সামিল বিজ্ঞানী ষ্টারম্যাস ও ষ্টার্ণের গবেষণার ফলে তাও আর অজানা রইল না।

আলোক তরংগ ও পদার্থ তরংগ

তরংগ প্রকৃতিতে আলোক ও পদার্থ অর্থাৎ ইলেকট্রন ও প্রোটন তরংগের মধ্যে যে বিশেষ ঐক্য রয়েছে তা দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আলোক তরংগ ও পদার্থ তরংগের মধ্যে পার্থক্য কি? আলোক ছুটে চলে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইলের নির্দিষ্ট গতিবেগে এবং বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের গবেষণা অনুযায়ী আলোক বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরংগ (Electro-magnetic wave) ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পদার্থ তরংগের নিজস্ব প্রকৃতি আজও বিজ্ঞানের গবেষণায় ধরা পড়েনি। উপরন্তু পদার্থ তরংগের কোন নির্দিষ্ট গতিবেগ নেই—পদার্থ তরংগের গতিবেগ নির্ভর করে বাইরের উস্‌কানির উপর অর্থাৎ যে বেগে ইলেকট্রন স্বষ্টি করা হয় সেই বেগের উপর। ইলেকট্রন তরংগ যে আলোক তরংগ থেকে পৃথক, খুব একটা সাধারণ পরীক্ষা থেকেই তা প্রমাণ করা যায়। ইলেকট্রন তরংগের সামনে একটা চুম্বক এনে ধরলে ইলেকট্রন তরংগ বেঁকে যাবে পক্ষান্তরে কিন্তু আলোক তরংগ চুম্বকের উপস্থিতি উপেক্ষা ক'রে একটুও না বেঁকে সোজাই চলে যায় সামনের দিকে।

পদার্থের আদি উপাদানের তরংগ প্রকৃতি আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের এক অভাবনীয় ঘটনা। পদার্থের মূল উপাদান মাত্র দুই জাতের বৈদ্যুতিক পদার্থে গড়া। এ আবিষ্কার পদার্থের অন্তিম পরিচয় নির্ধারণে যুগান্তর এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পদার্থের তরংগ-প্রকৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শুধু যে পদার্থের অন্তিম পরিচয় সম্বন্ধেই বৈজ্ঞানিক ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল তাই নয়, এই অভাবনীয় আবিষ্কারের ফলে এতকালের প্রচলিত বিজ্ঞানের মূলনীতির গোড়ায়ও একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল, যার ফলে বিজ্ঞানের বহুকালের বিশুদ্ধ সূত্র নতুন ক'রে না লিখে আর উপায় রইল না।

ইলেক্‌ট্রনের দ্বৈতরূপ

ইলেকট্রনের তরংগরূপ আবিষ্কারের ফলে গভীর প্রশ্ন জাগল বিজ্ঞানীদের মনে। ইলেকট্রন যদি তরংগই হয় তা'হ'লে চলবার সময় সোজা চিকন

চিকন রশ্মির মত ছোটে কেন? যা দেখে মনে হয় যেন অজস্র ইলেকট্রন কণা পিঁপড়ার সারির মত লাইন বেঁধে সোজা ছুটে চলছে সামানের দিকে। যদি বাধা না পায় তাহলে তরংগ তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যেমন পড়ে জলের তরংগ। আর যদি বাধা পায় তা'হ'লে একটা ঢেউ আবার অনেক হ'য়ে বিসরিত হ'য়ে যাবে চারদিকে। কিন্তু কি ইলেকট্রন তরংগ, কি আলোক তরংগ অহরহ এমনিভাবে তো ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় না? তার উত্তরে বলা হয় আলোক তরংগ লম্বায় অত্যন্ত খাট। এবং ইলেকট্রন তরংগও দৈর্ঘ্যে সেইরূপ। তাই সাধারণ কোন বাধা পেলে ইলেকট্রন বা আলোক তরংগ বেঁকে যায় না। তাই তরংগ বহু হয়ে ছড়িয়ে যাবার সুযোগও পায় না। যদি বাধা খুব তীক্ষ্ণধার ও সূক্ষ্ম হয় তাহ'লে ছড়িয়ে পড়ে। তরংগ বিসরণ পরীক্ষা তা'র প্রমাণ। কিন্তু সাধারণত ইলেকট্রন বা আলোককে রশ্মির মত লাইন ক'রে যে চলতে দেখা যায় তার কারণ রশ্মিরূপে চলবার পথে তরংগগুলি দলে দলে জোট বেঁধে চলে। এই এক একটি তরংগ-জোটের ছোটবার গতিবেগ এক একটি স্বতন্ত্র তরংগের চেয়ে পৃথক। অতি সূক্ষ্ম তরংগশ্রেণীরা যখন এমনি জোট বেঁধে চলে তখন তরংগেরা কণার মত ব্যবহার করে। তাই আলোকের তরংগ জোটকে বলা হয় আলোক কণা বা ফোটন এবং ইলেকট্রনের তরংগ জোটকে বলা হয় ইলেকট্রন কণা।

কিন্তু এই উত্তরে ইলেকট্রনের কণা ও তরংগরূপের সমস্যা এত সহজে মিটে যায় না। ইলেকট্রন তরংগ জোট বেঁধে কণার মত চললেও তরংগ জোটের প্রান্তসীমা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বেই চারদিকে। ছড়িয়ে পড়বার পরিধি যদি হয় সুদূরপ্রসারিত এবং যে বস্তু থেকে তরংগ উত্থিত হবে সে বস্তু যদি পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে যূথবদ্ধ হ'য়ে থাকে তাহলে ইলেকট্রন তরংগ জোট অনেককাল পর্যন্ত জোট বেঁধে থাকতে পারে কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে যে সময় নেয় তা সুদীর্ঘ দিনের ব্যাপার। কণা ও তরংগরূপ সমস্যার এই যুক্তিই যদি যথার্থ তাহ'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জ জন্মলাভ করেছিল অজস্র জোট বাঁধা তরংগের সমষ্টিরূপে। বহুজন্মের ঐ কল্পনা সত্য হ'লে পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত এত যুগ অতিবাহিত হ'য়ে গেছে যে সেই প্রথম দিনের যূথবদ্ধ আদি তরংগ-জোটেরা নিশ্চয়ই এতদিনে জোট ভেংগে ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে।

কিন্তু তা'র ত' কোন চিহ্নও দেখা যায় না। আজো তো সেই আদি যুগের গাছপাতার প্রতিকৃতি পাথর হয়ে তেমনি জমে রয়েছে ফসিল রূপে,—একটু বিকৃতও হয়নি! পদার্থের মৌলিক উপাদান যদি তরংগরূপে ছড়িয়েই পড়ে তা'হ'লে কেন সেই অতিপ্রাচীন প্রতিকৃতি বিকৃত হ'ল না?

কণা ও তরংগরূপের সমস্যা জোটবদ্ধ তরংগের সহায়তায়ও তাই মিটল না। যে পরীক্ষায় ইলেকট্রনের তরংগরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে সেই পরীক্ষার পাশে যদি ইলেকট্রনের কণারূপের পরীক্ষাগুলি দাঁড় করান যায় তা'হ'লে সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে যায়। ইলেকট্রন প্রোটন প্রচণ্ডবেগে ছুটে গিয়ে ধাতব পাতের গায়ে আঘাত ক'রে যে আলোর ঝল্‌মলানি সৃষ্টি করে তা' দেখে অভ্রান্তভাবেই বলা যায় ইলেকট্রন প্রোটন নিশ্চয়ই আদিরূপে পদার্থ কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ নিখুঁত পরীক্ষায় ইলেকট্রন প্রোটনের যে তরংগরূপ প্রত্যক্ষ হয়েছে তা'তেও ত তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দ্বন্দ্ব বৈজ্ঞানিক বিচার জগতের এক অভিনব প্রশ্ন। তরংগ ও কণারূপ উভয়েই প্রত্যক্ষসত্য—অথচ একই পদার্থ অবলম্বন ক'রে পাওয়া দুই সত্যকে এক অবিচ্ছিন্ন সত্যরূপে সংযুক্ত করতে যাওয়ার অর্থ এতকালের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নীতির মূলসূত্র বিসর্জন দেওয়া। এবং সেই সংগে পদার্থের আদি রূপকে মানসচক্ষে চিরদিনের জন্য অকম্পনীয় করে তোলা। কারণ মানুষের কল্পনায় একই পদার্থকে একই সময়ে কণা ও তরংগরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। কণা ও তরংগরূপ যখন উভয়েই সত্য তখন এমন কোন পরীক্ষার উদ্ভাবন করা যায় না কি, যা দিয়ে একই পরীক্ষায় ইলেকট্রন প্রোটনের দ্বৈতরূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? এরূপ পরীক্ষার উদ্ভাবন করা কোন সময়েই সম্ভব নয়। কারণ তরংগ সংঘর্ষণের মূল কথা হ'ল যে আদি তরংগ বিভিন্ন সূক্ষ্মধার ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ ক'রে ঝাঁঝরা কাচের ওপারে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে সেই আদি তরংগকে একই সময়ে এবং একই দিকে মুখ করে প্রবেশ করতে হবে বিভিন্ন ছিদ্রের মধ্যে, তা' হ'লেই আদি তরংগ থেকে সৃষ্ট সমপ্রকৃতির অথচ বিভিন্নমুখী তরংগেরা পরস্পর সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের তরংগ পরিচয় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব করবে। কিন্তু তরংগ সংঘর্ষণের আগেই যদি কণারূপ পরীক্ষা করার জন্য আলোক ঝলমলের পরীক্ষাটি করা হয় তা' হ'লে ঝাঁঝরা কাচের যে ছিদ্রের মুখের কাছে আলোক ঝলমলের

পর্দাটি রাখা হবে, সে পর্দাতে আঘাত খেয়ে আদি তরংগের প্রকৃতি যাবে বদলে। একই আদি তরংগ বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে বিভিন্ন দিকে মুখ ক'রে প্রবেশ করবে, ফলে ছড়িয়ে পড়া তরংগের মধ্যে আর সংঘর্ষণ ঘটে নিস্তরংগ ও দ্বিগুণ তরংগের সারি সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না। সুতরাং কোনমতেই এরূপ উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় যাতে একই পরীক্ষায় একই সময়ে ইলেকট্রনের বা প্রোটনের তরংগরূপ এবং কণারূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। অথচ আদি পদার্থের তরংগরূপ ও কণারূপের সামঞ্জস্য বিধান করতেই হবে। কিন্তু তরংগবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কল্পনার সংগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণার সামঞ্জস্য হবে কি করে?

ঐ সমস্যা সমাধানের সন্ধান দেন বিজ্ঞানী ডি ব্রগলি এবং স্রোয়েডিংগার এবং হাইজেনবার্গ। তরংগ ও কণার পরস্পরবিরোধী দ্বৈত রূপের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিধান করে এঁরা প্রকাশ করেন নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী। [পদার্থের সংগঠন অধ্যায়ে কোয়াণ্টাম থিয়োরীর কথা বলা হয়েছে] এই নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী অনুযায়ী এই পদার্থের কণা ও তরংগরূপ মোটেই পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরস্পরের সম্পূরক। ইলেকট্রন কণাও বটে, তরংগও বটে। একই সময়ে ইলেকট্রন কণাও হতে পারে তরংগও হ'তে পারে। কোন পরীক্ষায় ইলেকট্রনের কণা রূপটি প্রত্যক্ষ হয় কোন সময়ে ইলেকট্রনের তরংগরূপ। কিন্তু ইলেকট্রনের এই দ্বৈত গুণ পরস্পরের সংগে গভীরভাবে সংযুক্ত ও নির্ভরশীল। জটিল অংকের সাহায্যে এই সম্বন্ধকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যে অংক এই সম্বন্ধকে নির্ধারিত করে তাকে কণার ভরবেগ (momentum) দিয়ে ভাগ ক'রে ইলেকট্রনের তরংগ দৈর্ঘ্য বের করা যায়। আবার তরংগদৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে ভর বের করা যায়। কিন্তু নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী অনুযায়ী এই দ্বৈতরূপের সামঞ্জস্য হ'লেও কল্পনায় ধারণা করা সহজসাধ্য নয়। একটা তুলনামূলক উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আগুনে আংগুল ছোঁয়ালে আগুনের উত্তাপ লাগে, কারণ আগুনের কণাগুলি আমাদের আংগুলের কণার চেয়ে দ্রুতবেগে ছোটাছুটি করে। আমরা শুধু উত্তাপটি অনুভব করি অগ্নিকণার দ্রুত ছোটাছুটির কোন খবরই জানি না। অথচ আমাদের অনুভূতিও সত্য, অগ্নিকণার ছোটাছুটিও সত্য। তেমনি কোন পদার্থ আমাদের গায়ে এসে আঘাত করলে পদার্থের কণারূপটি আমরা অনুভব করি, কিন্তু তরংগরূপের কোন সন্ধানই রাখি না। সুতরাং কল্পনায় এক সঙ্গে তরংগ ও কণার দ্বৈতরূপ দাঁড় করিয়ে দেখা সত্যই সহজসাধ্য নয়।

নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী বিজ্ঞানের এক অভিনব দান। এই থিয়োরী অনুযায়ী শুধুমাত্র ইলেকট্রনই একাধারে কণা ও তরংগ নয়, প্রোটন পরমাণু এমন কি আলোকরশ্মি পর্যন্ত একাধারে তরংগ এবং কণা। আলোকের কণারূপের বিশিষ্ট নাম হ'ল 'ফোটন'। কোয়াণ্টাম থিয়োরীর উদ্ভাবনে কণা ও তরংগরূপের সামঞ্জস্য হ'ল বটে কিন্তু এই নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী এতকালের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক নীতির মূলসূত্রে এনে দিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

অনিশ্চয়তাবাদ

নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরীর অবদানে ইলেকট্রন একই সময়ে তরংগ ও কণা। ইলেকট্রনের এই দ্বৈতরূপের একটি যুগ্ম চিত্র গ'ড়ে তোলবার আগ্রহে আমাদের মন স্বভাবতই উন্মুখ হ'য়ে উঠে। মানসচক্ষে ইলেকট্রনের একটি চিত্র এঁকে ভাবব আমরা তরংগ আপনার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর এই ছড়িয়ে পড়া ইলেকট্রন-তরংগ সমুদ্রে একাকী একটি ইলেকট্রন-কণা অকূলে ভেসে চলছে। যেন কোথা থেকে কোথায় ভেসে চলছে, কেমন করেই বা চলছে, কত দ্রুতবেগে ভেসে চলছে তাও আমরা দেখতে পারি আমাদের মানসচক্ষে। কিন্তু বাস্তবে মানসচক্ষেও কোনদিন তরংগ কণারূপ ইলেকট্রনের এমন একটি অখণ্ড চিত্র গড়ে তুলতে পারব না। তরংগের বুকে ইলেকট্রন এখানেও থাকতে পারে, সেখানেও থাকতে পারে, সর্বময় হয়ে থাকতে পারে কিন্তু খোঁজ করলে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন সময়েও পাওয়া যাবে না ইলেকট্রনকে। ইলেকট্রন থাকতে পারে তরংগের সর্বত্র কিন্তু কোন বিশিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে মিলবে না ইলেকট্রনের সন্ধান। কথাটি অদ্ভুত ঠেকছে। পদার্থের আদি উপাদানের আদি পরিকল্পনা এমনি অদ্ভুতই বটে। মানুষের মেধা কোনদিন তরংগ ও কণার একটি অখণ্ড মানসকল্পনা করতে পারবে না। তরংগের স্বভাবধর্ম বিচার করলে এ অসম্ভাবনার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

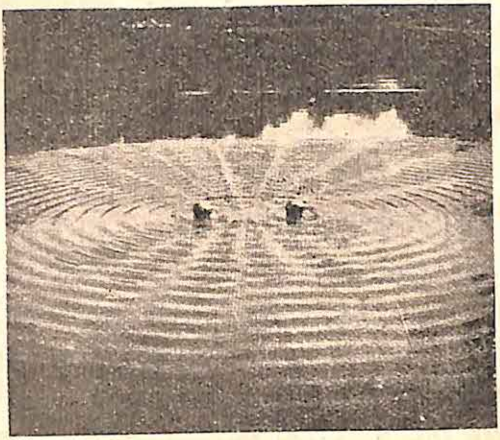
তরংগ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বটে। কিন্তু সাধারণত চলে অনেকগুলি তরংগ এক সংগে জোট বেঁধে এবং ইলেকট্রন কণাও অবস্থান করে এই তরংগ জোটের কোথাও। কিন্তু তরংগ-জোটের কোথায় রয়েছে ইলেকট্রন? সামনে? পেছনে? কেন্দ্রে? তরংগ-জোট খোঁজ ক'রে দেখা যাক কোথায় থাকতে পারে ইলেকট্রন? তরংগ-জোট চলবার সময় আশেপাশে ছড়িয়ে যায়

সুতরাং সুরুতে তরংগ জোটের যে পরিধির মধ্যে ইলেকট্রন কণা কোথাও থাকতে পারত। পরমুহূর্তে তরংগ ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে তরংগ জোটের পরিধি বেড়ে যায় এবং সংগে সংগে ইলেকট্রন কণার অবস্থানের জায়গাও হয়ে যায় প্রশস্ততর। ফলে ইলেকট্রন তরংগ জোট এবং ইলেকট্রন কণার এগিয়ে চলবার বেগ কোন সময়েই সমান হবে না। তরংগ জোটের চেয়ে কণা কোন সময়ে দ্রুততরও চলতে পারে আবার মন্থরগামীও হ'তে পারে। যদি এমন হয় যে কণাটি ইলেকট্রন তরংগ জোটের সামনের দিকে ছিল তা হ'লে তরংগ জোট চলবার সময় ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে কণা তরংগ জোটের চেয়ে আগে আগে এবং দ্রুতবেগে চলবে। অর্থাৎ কণা ও তরংগ জোটের গতিবেগ সমান থাকবে না। অথচ তরংগ জোটের গতিবেগ জেনেই তবে কণার গতিবেগ জানতে হবে। কারণ একমাত্র তরংগ জোটের গতিবেগই বলে দিতে পারে কণা কত বেগে ছুটে চলছে। নইলে তরংগ জোটকে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে কণার গতিবেগ জানবার কোন উপায় নেই। তরংগ জোটে তরংগের সংখ্যা হবে যত বেশি, তরংগ জোটের পরিধিও বাড়বে তত। তরংগ জোট সংখ্যায় ভারী হ'লে অবশ্য ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় নেবে। এতে একটা সুবিধা হবে এই যে ইলেকট্রন কণার গতিবেগের অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে কিন্তু তেমনি অসুবিধে হবে আবার আর একদিক দিয়ে—সংখ্যায় ভারী হওয়া তরংগ জোটের পরিধি বেড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কণা কোথায় কোথায় অবস্থান করতে পারে তার পরিধিও যাবে বেড়ে। ফলে কণার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করবার অনিশ্চয়তা যাবে অনেক বেড়ে। পক্ষান্তরে তরংগ জোটে তরংগ সংখ্যা যদি হয় কম, তা'হ'লে কণার অবস্থিতির পরিধি হবে সীমাবদ্ধ। ফলে কণার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের সম্ভাবনায় অনিশ্চয়তার মাত্রা যাবে কমে। কিন্তু তরংগ জোট সংখ্যায় কম হ'লে ছড়িয়ে পড়বে। আবার দ্রুততর বেগের ফলে তরংগ জোটে অবস্থিত কণার গতিবেগের অনিশ্চয়তাও যাবে বেড়ে। সুতরাং তরংগ ও কণার অখণ্ড চিত্র গড়তে গিয়ে কুল থাকে তো শ্যাম থাকে না, শ্যাম থাকে তো কুল থাকে না। তরংগ জোটের বুকে কণার বেগকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয় তো অবস্থিতি বাগ মানে না আবার অবস্থিতি বাগে আনার চেষ্টা হয় তো কণার বেগ হ'য়ে ওঠে বেসামাল।

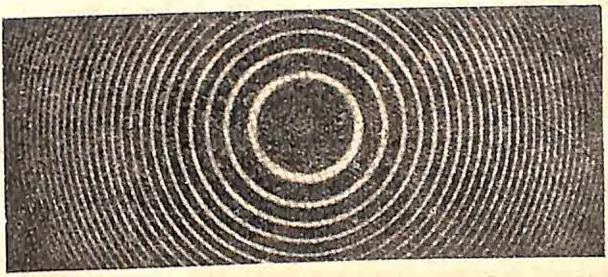
তরংগ ও কণারূপের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের নয়ারূপের ঐ চিত্রের বৈশিষ্ট্য

এই যে যদিও তরংগ ও কণা ইলেকট্রনের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তায় আলিংগনাবদ্ধ তথাপি ইলেকট্রন তরংগ জোটের কোথায় ইলেকট্রনকণা রয়েছে শত চেষ্টায় এবং কোন সময়েই নির্দিষ্ট করে জানা যাবে না বা ইলেকট্রন কণার গতিবেগই বা কত তা'ও জানা সম্ভব হবে না কোন দিন। এই অনিশ্চয়তার জন্যই, পরীক্ষায় তো নয়ই, কল্পনায়ও তরংগকণার সমন্বিত এক অখণ্ড ইলেকট্রনের চিত্র আঁকা কোনদিনই সম্ভব হবে না মানুষের পক্ষে। এই সিদ্ধান্ত সব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। ইলেকট্রন তরংগ জোটেই থাক আর বিস্তৃত তরংগের যে কোন জায়গায়ই থাক, বড় জোর আমরা সম্ভাবনার কথা বলতে পারি—কণা তরংগের এখানেও হ'তে পারে সেখানেও হ'তে পারে। অবশ্য তরংগ বিশেষভাবে জোট বেঁধে যে স্থানটিকে জোরাল করে তোলে, কণার অবস্থানের সম্ভাবনা সেই তরংগ জোটের মধ্যেই বেশি। সম্ভাবনার চেয়ে বেশি নিশ্চিত ভাবে বলবার মত অধিকার প্রকৃতি মানুষের হাতে দিতে রাজি নয়।

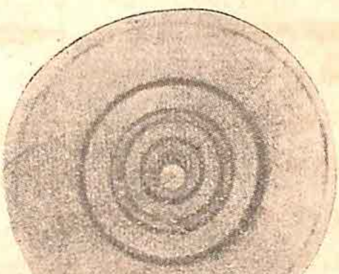
কোন পরীক্ষায়ই যে ইলেকট্রন তরংগ-কণার অবস্থান ঠিকানা নির্দেশ করা সম্ভব নয়, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। কল্পনা করা যাক্ একজন বিজ্ঞানী একটি ইলেকট্রন বা প্রোটন কণার ঠিকানা বার করবার জন্য গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। খালি চোখে ইলেকট্রন বা প্রোটন কাউকেই দেখা যায় না; তাই বিজ্ঞানীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। যদি কণা দেখবার কোন পদার্থের উপরে সূর্যালোক এসে পড়ে এবং সে পদার্থ থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে তবে আমরা সেই পদার্থটিকে দেখি। তেমনি সূর্যালোক কণার গায় প্রতিফলিত হয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচে গিয়ে পড়লে তবে কণাকে দেখা যাবে। কিন্তু ইলেকট্রন প্রোটন কণার তরংগ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোক তরংগের চেয়ে অনেক কম। ফলে সূর্যালোকে ইলেকট্রন কোন সময়েই দেখা যাবে না। কারণ যে আলোক দিয়ে অন্য পদার্থকে দেখতে হবে সেই আলোক তরংগের দৈর্ঘ্য দ্রষ্টব্য পদার্থের তরংগ-দৈর্ঘ্য থেকে ক্ষুদ্রতর না হ'লে কোন প্রকার দ্রষ্টব্য পদার্থ দৃশ্যমান হবে না। সুতরাং বিজ্ঞানীকে রঞ্জন রশ্মির ব্যবহার ক'রে নতুন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করতে হবে। কারণ রঞ্জন রশ্মির তরংগদৈর্ঘ্য ইলেকট্রন বা প্রোটনের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হ'তে পারে। যা'হো'ক বিজ্ঞানী ঐরূপ একটি নতুন অণুবীক্ষণ নিয়ে ইলেকট্রনেরা কোথায় আছে তা দেখবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু



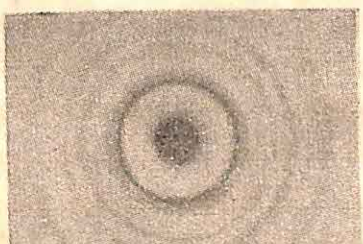
জলতরংগ বিসরণ



আলোকতরংগ বিসরণ



রঞ্জন রশ্মির বিসরণ



ইলেকট্রনের বিসরণ

তিনি আশ্চর্য হ'য়ে দেখেছেন যতবারই ইলেকট্রনকে দেখবার চেষ্টা করেছেন ততবারই ইলেকট্রন ধরা পড়বার আগেই ফসকে যাচ্ছে। কোন মতেই মুহূর্তের জন্যও ইলেকট্রনকে দেখা যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না? কারণ যে আলোকতরংগ ইলেকট্রনকে ধ'রে দেখাবে বিজ্ঞানীকে, সেই আলোক-তরংগই নিজের স্বভাবদোষে দূরে তাড়িয়ে দিচ্ছে ইলেকট্রনকে। আলোকেরও পদার্থের মতো চাপ দেবার ক্ষমতা আছে। এক বর্গমাইল জায়গায় যে সূর্যা-লোকপাত হয় তার চাপের পরিমাণ তিন পাউণ্ড। সূর্যালোক এবং রঞ্জন-রশ্মি ছুটে চলে সমান বেগেই। কিন্তু রঞ্জনরশ্মির তরংগ সূর্যালোক থেকে ছোট, তাই রঞ্জনরশ্মি স্পন্দিত হয় সূর্যালোকতরংগ থেকে অনেক বেশি দ্রুত-গতিতে। কিন্তু দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হওয়ার ফলে রঞ্জনরশ্মির চাপের পরিমাণও হয় বেশি। তাই রঞ্জনরশ্মি দিয়ে ইলেকট্রন দেখবার যে সম্ভাবনা ছিল রঞ্জনরশ্মির নিজ স্বভাবাদোষে তাও লোপ হয়ে গেল। রঞ্জনরশ্মি ইলেকট্রনকে ধরবার আগেই ইলেকট্রনকে চাপ দিয়ে দেয় তাড়িয়ে। সুতরাং ইলেকট্রনকে দেখবার আশা এবং তার ঠিকানা জানবার আশা বিজ্ঞানীকে চিরতরে বিসর্জন দিতে হ'ল।

এমনিতর যে কোন পরীক্ষার উদ্ভাবন করা হোক্ না কেন, প্রত্যেক পরীক্ষায় এমনি একটি অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় ঘ'টে যাবে যা'র ফলে ইলেকট্রন প্রোটনের অবস্থান এবং গতিবেগ নির্ধারিত করা কোন দিন কোন পরীক্ষায়ই সম্ভব হবে না।

ইলেকট্রন, প্রোটন, ফোটন বা পরমাণুর আকারের যে কোন পদার্থ কণারই অবস্থান ও গতিবেগ নির্ধারণ করা কোন সময়েই কোন পরীক্ষায়ই সম্ভব হবে না। কণার অবস্থান থাকবে চির অনির্ধারিত, চির অনিশ্চিত। কণার প্রকৃতিবিচারে এই অনিশ্চয়তাকে প্রথম বৈজ্ঞানিক সূত্ররূপে আখ্যাত করেন বিজ্ঞানী হাইডেলবার্গ। তিনি বলেন পরমাণুর আকারের কণা নিয়ে যে সকল ক্রিয়া ঘটবে সে সকল ক্রিয়ার ফলে অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে। একই সময়ে নির্ভুলভাবে ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতিবেগ কোনদিনই নির্ধারিত করা সম্ভব হবে না—গতিবেগের সন্ধান যদি হয় তবে ইলেকট্রনের অবস্থান রইবে অজ্ঞাত। তেমনি অবস্থান যদি যায় জানা, তবে গতিবেগ রইবে আবার অজানা—অর্থাৎ ইলেকট্রনের পূর্ণ পরিচয় সব সময়েই থাকবে অজ্ঞাত। এই অনিশ্চয়তা প্রকৃতিরই দান—ইলেকট্রন প্রোটন নিয়ে পরীক্ষার কোন ত্রুটি এর

জন্য দায়ী নয়। নিখুঁতভাবে পরীক্ষা হ'লেও এই প্রকৃতিদত্ত অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

সকল পদার্থই ইলেকট্রন প্রোটন দ্বারা গঠিত। কিন্তু প্রতিটি ইলেকট্রন প্রোটন কণার অবস্থান ও গতিবেগ নিশ্চিতরূপে জানা যাবে না কোন সময়েই। সুতরাং বলা যায় বস্তুমাত্রের চালচলনেই সব সময়ে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। অবশ্য পরমাণবিক আকারের প্রতিটি কণার চালচলন স্বতন্ত্রভাবে বলা যাবে না বটে কিন্তু অজস্র কণা একজোট হয়ে যে কাজ করবে তা'র গড়পড়তা ফলে অনিশ্চয়তার মাত্রা হবে নগণ্য। তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্র থেকে অবিরাম আলফা কণা ও বিটা কণা নির্গত হবে এবং গড়পড়তা ক'টি ক'রে কণা একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু থেকে ছিটকে বেরুবে তার গড়পড়তা হিসাব নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, কিন্তু রেডিয়ামের কেন্দ্রে অবস্থিত ৮৮ প্রোটনের মধ্যে কোন প্রোটনটি কখন ছিটকে বেরুবে তা নিশ্চয় ক'রে বলা যাবে না কোন দিন।

নির্ণয়বাদ ও কার্যকারণবাদ

পদার্থের কণা তরংগরূপের নয়া পরিকল্পনা করতে গিয়ে প্রকৃতির বিধানে যে অনিশ্চয়তার সন্ধান পাওয়া গেল তা'তে এতকালের প্রতিষ্ঠিত হেতুবাদের গোড়ায় পড়ল প্রচণ্ড আঘাত। পঞ্চাশ বছর আগেও, কার্য ঘটলেই তার পেছনে কারণ থাকবে এই যে কারণবাদ, এবং বর্তমান জানা গেলেই ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা যাবে এই যে ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের বিশ্বাস, চিরন্তন সত্য ব'লে স্বীকৃত হ'ত নয়া কোয়াণ্টামবাদের প্রবর্তনের ফলে সে চিরন্তনতার দাবী আর টিকল না। তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন কারণবাদের শৃঙ্খলে সমস্ত বস্তুজগৎ বাঁধা—এক তিলও এদিক সেদিক যাবার উপায় নেই। যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন তা'র পেছনে একটা কারণ থাকবেই। কোন কাজই খামখেয়ালের বশে হ'তে পারে না। বস্তুর বর্তমান অবস্থাটি জানতে পারলে ভবিষ্যতে বস্তুটি কি করবে তা'ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। অর্থাৎ বস্তু জগতের যা নিয়ম তাই মেনে চলতে হবে। জড়পিণ্ড, জীবজগৎ এবং মনোজগতের কারো এই বাঁধা ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই নেই। কারণবাদের এই বৈজ্ঞানিক সমর্থন পেয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জড়দর্শন বিশ্ব-জগতের চরম সত্যের মূলে যান্ত্রিকতার আমদানী করেছিল। এমন কি বিজ্ঞানী

লাপ্‌লাস সগর্বে বলেছিলেন—আমাদের পৃথিবী আদিম অবস্থায় যেদিন নীহারিকা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছিল আকাশে, সেই দিনের সেই নীহারিকার প্রতিটি বাষ্পকণার ওজন বেগ, প্রকৃতি ইত্যাদি মেপে জোপে যদি জানা যেত তা'হ'লে একজন মেধাবী অংকশাস্ত্রী দিনরাত অঙ্ক ক'ষে রাম না হতে রামায়ণের মত লিখে রাখতে পারতেন বস্তুপৃথিবীর ও মানবজাতির জন্মমৃত্যুর সম্পূর্ণ ইতিহাসের ঠিকুজী। তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এই বস্তুজগৎ তার জীব ও উদ্ভিদ ইলেকট্রন, প্রোটন ও পরমাণুরূপ পদার্থকণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিদিন মানুষের জীবনে, উদ্ভিদে, বস্তুজগতে যে ঘটনা ঘটছে তা এই অজস্র কণাসমষ্টির ক্রিয়া প্রক্রিয়ারই ফল। বিভিন্ন অবস্থায় ইলেকট্রন, প্রোটন ও পরমাণুরা নানাভাবে মিলে মিশে সংগঠিত হয়। এই মৌলিক কণা সংগঠনের আকার ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সকল প্রকার বস্তুজগৎ এমন কি মনোজগতের রূপান্তর। কণা সংগঠনের বর্তমান আকার দেখে, ভবিষ্যতে কণাসংগঠন কি আকার ধারণ করবে এবং তার ফলে কি পরিবর্তন হবে তাও আগাম ব'লে দেওয়া যায়। এমন কি মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়ও এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। মস্তিষ্কের পদার্থকণার বর্তমান সংগঠনের আকারের উপর নির্ভর ক'রে রয়েছে ভবিষ্যৎ মনের চিন্তা। তাই বর্তমানে মস্তিষ্কের পদার্থকণার আকার যদি পুংখানুপুংখরূপে জানা যায় তবে মন ভবিষ্যতে কি চিন্তা করবে তাও আর অজানা থাকবে না। সুতরাং অভ্রান্তরূপে প্রতিটি কণার অবস্থান ও প্রকৃতি, গতিবেগ এবং ওজন যদি জানা যায়—এই পদার্থকণাগুলি কি বিধানে চালিত হয় সেই মৌলিক সূত্রগুলিও যদি জানা যায়, তা' হ'লে অংক ক'ষে ভবিষ্যতে ব'লে দেওয়া তেমন আর অসম্ভব কি? ভবিষ্যতের ছক তো বাঁধাই রয়েছে, শুধু অংক ক'ষে ভবিষ্যতের আগাম খবরটি জেনে নেবার অপেক্ষা। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলতেন—কবে সূর্যগ্রহণ হবে, কবে হ্যালির ধূমকেতু উঠবে আকাশে, এমনিতর জ্যোতির্বিজ্ঞানলোকের কত খবরই তো একটু অংক ক'ষেই বলে দেওয়া যায়। তেমনি আরেকটু ব্যাপক ভাবে অংকের ক্ষেত্রটি বাড়িয়ে দিলে বস্তুজগতের সব কিছুর ভবিষ্যতেই জানা সম্ভব। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের মতে ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের জন্য বা কোন সম্ভাব্য ঘটনার মূলকারণ জানবার জন্য মাত্র কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। প্রথম প্রয়োজন মূল প্রাকৃতিক বিধানগুলি জানা এবং এই বিধানগুলিকে আংকিক সূত্রে লিপিবদ্ধ করা। বিজ্ঞানী

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি এবং আলোকতরংগবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হ'লে বিজ্ঞানীরা মনে করলেন পৃথিবীর মূল বিধানগুলি পর্যাপ্ত ভাবে আয়ত্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই বিধানগুলিকে প্রতিটি পদার্থ-কণার উপর প্রয়োগ করা। কিন্তু এই বিধানগুলিকে প্রতিটি পদার্থকণার উপরে প্রয়োগ করবার আগে একান্ত ভাবে জানা প্রয়োজন প্রতিটি পদার্থকণার ওজন, গতিবেগ ও অবস্থান। পদার্থকণার এই গুণগুলি জানবার জন্য আবার প্রয়োজন পাকা যন্ত্রের—যে যন্ত্রের সাহায্যে নির্ভুল ভাবে মাপা যাবে এই আবশ্যকীয় তথ্যগুলো। এই তথ্যগুলি 'অংকের ফরমূলা'য় ফেলে পদার্থের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের জন্যে আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই তৃতীয় প্রয়োজন হ'ল দেশকালের (space & time) নিরপেক্ষ (absolute) সত্তায় বিশ্বাস করা, যেন দেশকালের বুকে বস্তুকণা-রাশির যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলছে তা চলছে এক বড় অবিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহে। যেন কোথাও ছেদ নেই—কোথাও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না, খণ্ডিত হচ্ছে না পদার্থ-কণাশ্রয়ী ঘটনার প্রবাহ। যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছে, যে যন্ত্রের সাহায্যে পদার্থকণার তথ্য সংগ্রহ করছে, সে ব্যক্তি বা যন্ত্রও প্রভাব বিস্তার ক'রে বিন্দুমাত্রও বাধা সৃষ্টি করছে না এই ঘটনা প্রবাহে।

এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা হয়ে গেলে বস্তুজগতের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার আবর্তগুলি অনুধাবন করা এবং প্রতিটি পদার্থকণার অংশ লক্ষ্য করার কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা করার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। এই পর্যবেক্ষণের কাজ থেকে যে তথ্য পাওয়া যাবে সেগুলিকে অংকের ফরমূলায় যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বস্তুরাশির ভবিষ্যৎ জানার পক্ষে আর কোন বাধাই থাকবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করা যাক—একজন বিজ্ঞানী ধনুক থেকে একটি তীর ছুঁড়ে মারলেন আকাশে—তীরটি কোথায় গিয়ে পড়বে? কখন পড়বে? কতখানি মাটিই বা ভেদ করবে? তীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করবার জন্যে কয়েকটি তথ্যের প্রয়োজন। তীর কোথা থেকে ছোঁড়া হয়েছে অর্থাৎ তীরের প্রাথমিক অবস্থান ছিল কোথায়, তীরের বেগ কত, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কত, বাতাসের বাধা দেবার কেমন ক্ষমতা, মাটির কাঠিন্য কত—এই সব তথ্য জানা গেলে গতিবিজ্ঞানের সূত্র থেকে অংক ক'ষে অনায়াসে ব'লে দেওয়া যাবে তীরের ভবিষ্যৎ। প্রশ্ন হ'তে পারে ভবিষ্যৎ নির্ণয় এমনি ভাবেই যদি সম্ভব হয় তা' হ'লে বস্তুজগতের ভাগ্য ও মনের ইতিহাসের আগাম ঠিকুজী তৈরী করেন

না কেন বিজ্ঞানীরা। উত্তরে সে যুগের বিজ্ঞানীরা বলতেন—যুক্তি ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে ঠিকুজী তৈরী করবার কাজটি অসম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞান এখনও এমন সব পাকা যন্ত্র তৈরী করতে পারেনি যা দিয়ে বস্তুজগতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিকে পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রে নির্ভুল তথ্য গ্রহণ করা যায়, এবং মানুষের মধ্যেও এমন কোন অংকশাস্ত্রী জন্মান নি যিনি এরূপ অজস্র ও জটিল তথ্যগুলিকে অংকের ফরমূলায় প্রয়োগ ক'রে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করতে পারেন। যে দিন এমনি পাকাযন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হবে এবং মানুষের আংকিক মেধা এমনি প্রখর হবে সে দিন ভবিষ্যৎ নির্ণয় ক'রে ঠিকুজী তৈরী করা আর কষ্টসাধ্য থাকবে না।

সে দিনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের গোড়ায়ই যে গলদ ছিল সে খবর তখনো ধরা পড়েনি। গতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন প্রকৃতির মূল বিধানগুলি আংকিক সূত্রে আয়ত্ত করা হয়ে গেছে। নিউটন তাঁর গতিবিজ্ঞানের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছিলেন জ্যোতিষ্কলোকের গ্রহতারকার রীতিনীতি পর্যালোচনা ক'রে। এ কথা তখনও ধরা পড়ে নি যে পদার্থকণার সমষ্টিগত ও গড়পড়তা চালচলন থেকে তিনি গতিবিজ্ঞানের যে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুরাশির উপরে প্রয়োগ করা চলতে পারে কিন্তু এক একটি স্বতন্ত্র বস্তুকণার বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। কারণ সমষ্টিগতভাবে বস্তুপুঞ্জ যেরূপ নিয়ম পালন করে, স্বতন্ত্র ভাবে এক একটি পদার্থ-কণা তা মেনে চলে না। নিউটনের উদ্ভাবিত নিয়ম বা সূত্রগুলি প্রকৃতির মৌলিক বিধান নয়। শুধুমাত্র সমষ্টিগত ভাবে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুরাশির ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় যে ব্যবহার করে সে ব্যবহারিক নির্ণয়ের গড়পড়তা নিয়ম। তাই সে যুগের বিজ্ঞানীরা গতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কার ক'রে প্রকৃতির মূল বিধান আয়ত্ত করেছিলেন ব'লে যে কল্পনা করেছিলেন তার গোড়াতেও রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা। কোয়ান্টাম থিয়োরী অনুযায়ী প্রকৃতির বিধানে প্রতিটি কণা, কি পদার্থকণা, কি ফোটন, ভবিষ্যতে কি করবে সে সম্ভাবনার কতগুলি ইংগিত পাওয়া যায় মাত্র, নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না।—অনিশ্চয়তা প্রকৃতির বিধান। তথ্য সংগ্রহের কথায়ই এর পর আসা যাক্। ফোটন ও পদার্থকণার প্রকৃতি পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে পরমাণুর আকার, গঠিত কোন পদার্থকণার অবস্থান ও গতিবেগ একই সময় নির্ধারণ করা অসম্ভব। যন্ত্রের প্রভাবনিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ কোন সময়েই করা যাবে না। পদার্থকণার প্রকৃতি সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য

সংগ্রহ করতে গেলে সব সময়েই একটা ভুলের অংক থেকে যাবে। যন্ত্রকে বাদ দিয়ে প্রতিটি পদার্থকণার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই যন্ত্রের প্রভাব এসে পড়ে পদার্থকণার উপর। ফলে প্রতিটি পদার্থকণা সংক্রান্ত তথ্য একান্ত নির্ভুল হয় না কোন সময়েই।

তৃতীয়ত, বস্তুরাশির ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় দেশ কালের বুকে ঘটনার প্রবাহ কোন সময়েই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে না। কালেরও কোন স্বতন্ত্র এবং পরম সত্তা নেই। কাল আপেক্ষিক। কালের বুকে যে ব্যক্তি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষকারীকে বাদ দিয়ে কালকে মাপা যায় না। কালের পরিমাপও পর্যবেক্ষণকারীর উপর নির্ভরশীল। তা' ছাড়া ইলেকট্রন, প্রোটন, ফোটনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে এবং খণ্ডে খণ্ডে। ঘটনারাশি একটানা লয়ের মতো অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ঘটে না। তাই বিজ্ঞানীকে দেশ ও কালের বুকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ঘটনা ঘটবার কল্পনাকেও চিরতরে বিসর্জন দিতে হ'ল। অনিশ্চয়তাবাদের গোড়ার ইতিহাস রূপে ব'লে রাখা যায় যে বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় কার্যকারণের নিয়ম ও নিশ্চয়তাবাদ সম্বন্ধে সন্দেহের প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। তাপ বিকিরণ ও জড় পদার্থের ভিতর শক্তি আদান প্রদান সম্পর্কে নিউটন ও ম্যাকস্‌ওয়েলের নিয়মগুলি থেকে যা সিদ্ধান্ত করা হয়, পরীক্ষায় দেখা গেল তার বিপরীত। বিকিরণ ও পরমাণুর ভিতর শক্তির আদান প্রদানে গতিবিজ্ঞান ও বিদ্যুৎ-তরংগের নিয়মগুলি যখন বিফল ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল—তখন এদের পশ্চাতে যে কার্যকারণপরম্পরায় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তাবাদ এবং শক্তির অবিচ্ছিন্ন রূপের পরিকল্পনা রয়েছে সেই মূল বিশ্বাস ও মতবাদে গভীর সন্দেহ এসে উপস্থিত হয়। কোয়ান্টাম থিয়োরীও সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হয় নি।

নয়া কোয়ান্টাম থিয়োরী এবং হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদের অবদানে এতকালের প্রতিষ্ঠিত নির্ণয়বাদ ও কারণবাদকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিবার প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু তথাপি যাঁরা নির্ণয়বাদকে তখনও আঁকড়ে থাকতে চান সেই সব বিজ্ঞানীরা বলেন যে নির্ণয়বাদকে পরিত্যাগ করবার মত জ্ঞান তখনও মানুষের করায়ত্ত হয় নি। এখনও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার অপূর্ণ এবং এখনও মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে। ভবিষ্যতে যে দিন সত্যিকার জ্ঞানের সন্ধান মিলবে সে দিন দেখা যাবে নির্ণয়বাদই সত্য, ভবিষ্যৎ মানুষের জানার বাইরে নয়। কিন্তু কোয়ান্টাম থিয়োরীতে বিশ্বাসী ও বিজ্ঞানীরা প্রত্যুত্তরে বলেন মানুষের

মেধা কোনদিন এরূপ জ্ঞানই লাভ করতে পারবে না। কারণ প্রকৃতির বিধানেই রয়েছে অনিশ্চয়তার নিদান। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদে অনিশ্চয়তার পরিমাণ নির্দেশ করা যায় বটে, কিন্তু পরিমিত আয়তনবিশিষ্ট পদার্থের ব্যবহারে অনিশ্চয়তার পরিমাণ এতই কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সে জন্য সাধারণ ব্যবহারিক জগতে যেখানে স্থূল ও পরিমিত আয়তনের বস্তু নিয়েই আমাদের কারবার, মোটের উপর সেখানে কার্যকারণের নিয়ম প্রয়োগ করা চলে। অনিশ্চয়তার আশংকাও সেখানে অল্প। কিন্তু সূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বা শক্তিকণার স্থানকালগত বর্ণনা দিতে গেলেই অনিশ্চয়তা হয় অনেক বেশি।

কোয়াণ্টাম থিয়োরীর অবদানে 'কারণবাদ' বা হেতুবাদ বর্জনের প্রয়োজন বোধ করেছেন বটে বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন না এখনো প্রকৃতির বিধানে কোন প্রজ্ঞা (intuition) বা মুক্ত এষণার (free-will) অস্তিত্ব আছে কিনা। কারণ এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতামত প্রকাশের মতো প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ এখনও সম্ভব হয় নি। মুক্ত এষণার আলোচনার ক্ষেত্র তাই এখনও দর্শনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় বলা যায়—"নির্ণয়বাদ মানুষকে নিষ্প্রাণ যন্ত্ররূপে কারণবাদের নিগড়ে আবদ্ধ ক'রে ভাগ্যের শরনার্থী হ'তে বাধ্য করেছিল। নয়া কোয়াণ্টাম বাদ সেই অসাধ্য আদর্শের স্থানে একটি প্রণিধানযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে এবং অনেকখানি বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নয়া কোয়াণ্টাম থিয়োরী প্রকৃতির লীলা অনুধাবনের সাধনা বিশেষ ভাবে এগিয়ে দিয়েছে। ....আমাদের যুক্তি ও দর্শন প্রকৃতির উপরে চাপিয়ে দেওয়া চলে না, বরং আমাদের দর্শন ও যুক্তি বাস্তবের অন্তস্তল হ'তে উদ্ভূত হয়ে ক্রমশ বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে।........."

পরমাণুর নব পরিকল্পনা

পদার্থের তরংগপ্রকৃতি আবিষ্কার হওয়ার ফলে পদার্থপরমাণুর নতুন পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হল। বিজ্ঞানী নিল্‌স্‌বোর-এর (দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) পরমাণু পরিকল্পনা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে আর স্বীকার করা সম্ভব হ'ল না। পরমাণুর চিত্র আঁকতে গিয়ে বিজ্ঞানী বোর শুধু পদার্থের কণারূপেরই পরিচয় দিয়েছেন। বোরের পরিকল্পনায় পদার্থপরমাণুর পরিচয় তাই আংশিক, সম্পূর্ণ নয়। বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ ও শ্রডিন্‌গার পদার্থের

তরংগ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে পরমাণুর নব পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের পরমাণুর পরিকল্পনা দুর্বোধ্য অংকের জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, পরমাণুর এই নব চিত্রের কল্পনা মানসচক্ষেও করা সম্ভব হবে না কোনদিন। সে চিত্র অংকের সীমানায়ই থাকবে আবদ্ধ, মানুষের ধারণায় বাস্তব হয়ে উঠবে না শত চেষ্টায়ও। মানুষ প্রস্থ, লম্ব ও দৈর্ঘ্য এই তিনটি মাত্রারই (dimension) কল্পনা করতে পারে। কিন্তু তরংগ প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে পরমাণুর সংগঠনের নক্সা আঁকতে হ'লে এমনিতর বহুমাত্রার দেশের (multi-dimensional space) অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। যে পরমাণুতে দু'টি ইলেকট্রন আছে তার সংগঠনের জন্য প্রয়োজন ছয় মাত্রার দেশের, তিনটির জন্য নয় মাত্রার দেশের এবং চারটির জন্য বারো মাত্রা দেশের কল্পনা। কিন্তু লম্ব, প্রস্থ, দৈর্ঘ্য এই তিন মাত্রা দেশের অধিক কোন বহুমাত্রা দেশের কল্পনা করা মানুষের ধারণার পক্ষে সম্ভব নয়। এরূপ বহুমাত্রার দেশের কল্পনা শুধু আংকিক সত্য, বাস্তবিকই তার অস্তিত্ব রয়েছে কিনা, প্রকৃতিতে মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনা-জ্ঞান সে প্রশ্নের মীমাংসা কোনদিনই করতে পারবে না। তাই শ্রডিন্গারের পরমাণুমডেল অংকের জগতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, মানুষের ধারণায় কোনদিনই বাস্তব চিত্রে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠ্বে না। লাটিমের মত ঘুরে ঘুরে অহরহ প্রোটনের চারপাশে ইলেকট্রন পরিক্রমণরত হাইড্রোজেন পরমাণুর চিত্রের বদলে কণাতরংগরূপী প্রোটনের চারদিকে তরংগজোট বেঁধে অবিরাম একটি ইলেকট্রন ঘুরছে এবং কুয়াশার মত আবছায়ারূপী একটি গোলকের সৃষ্টি করছে, মানসচক্ষে পরমাণুর কল্পনা করতে চাইলে এর বেশি স্পষ্ট চিত্র আঁকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হাইড্রোজেন পরমাণুকে কল্পনায় মূর্তিমন্ত করতে চাইলে কল্পনায় বড় জোর ভেসে উঠবে কুয়াসাচ্ছন্ন একটি ঘুরন্ত গোলকের চিত্র।

বিজ্ঞানী বোরের পরমাণু-সংগঠনের পরিকল্পনা ধারণা করবার পক্ষে এখনও বিশেষ কার্যকরী। তরংগ প্রকৃতির কয়েকটি গুণকে প্রকাশ করবার অক্ষমতা, পদার্থপরমাণুর অনেকখানি বাস্তব পরিচয় মিলে বিজ্ঞানী বোরের পরিকল্পনা থেকে। ইলেকট্রন প্রোটনকে কণারূপে কল্পনা ক'রে পদার্থপরমাণুর মডেল গ'ড়ে তুললে, পদার্থের গুণাগুণের পরীক্ষালব্ধ ফলের সংগে এই মডেলের খুব অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সামান্য ত্রুটিকে উপেক্ষা ক'রে বলা যায় বিজ্ঞানী বোরের পরমাণু-পরিকল্পনা পদার্থের অনেকখানি বাস্তব পরিচয় দেয়, যদিও

সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। পদার্থপ্রকৃতির রহস্যভেদের পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করে ; যদিও পদার্থের গোটা বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে পারে না। তরংগ-প্রকৃতির প্রকাশ প্রয়োগে শ্রডিন্গারের পরমাণু-মডেল কোনদিন মানুষের কল্পনায় ধরা পড়বে না, কিন্তু বোরের মডেল আংশিক সত্য হ'লেও মানুষের ধারণার যোগ্য। তাই পদার্থের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বিচারের জন্য, আলোকের জন্মবৃত্তান্ত জানবার জন্য এখনও বোরের পরমাণু-মডেল বিজ্ঞানীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত।

শক্তি ও পদার্থ

প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে আমাদের বিশ্বজগতের মূল উপাদান দু'টি— শক্তি ও পদার্থ। শক্তি ও পদার্থের অজস্র সমন্বয়ে লীলাময় হয়ে রয়েছে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ। কিন্তু শক্তি ও পদার্থের পার্থক্য কোথায় ? শক্তির কোন ভর (mass) নেই, জাড্যভাব (inertia) নেই, শক্তির উপর মাধ্যাকর্ষণের টানও কার্যকরী হয় না। পক্ষান্তরে পদার্থ মাত্রেরই ভর আছে। ভর ছাড়া পদার্থের কল্পনা করাও যায় না। পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে সব সময়েই আকর্ষণ করে। পদার্থের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী। ভর ও মাধ্যাকর্ষণের টান মিলেই পদার্থের ওজন। তাই একই পদার্থের ওজন পাহাড়ের চূড়ায় মাপা হ'লে হবে একরকম, খনির অভ্যন্তরে মাপা হ'লে হবে তার চেয়ে বেশি। পৃথিবীতে একতাল লোহার ওজন যদি হয় এক মণ, সূর্যালোকে সেই লোহার তালটির ওজন হবে আটাশ মণ। কারণ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ ভারী। ভর ও ওজনের সংগে পদার্থের মধ্যে একটি প্রবল জাড্যভাব রয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চল হয়ে যদি থাকে পদার্থ, তবে সে অনাদিকাল পর্যন্ত নিশ্চল হয়েই থাকবে যতক্ষণ না অন্য কোন প্রভাব এসে জোর ক'রে চালিয়ে দেয় সেই নিশ্চল জড়পিণ্ডকে। আবার পদার্থপিণ্ড যদি চলতে থাকে তবে কোন বাধা এসে জোর ক'রে না থামিয়ে দিলে পদার্থের চলা থামবে না কোনদিন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভর, ওজন (ভর × মাধ্যাকর্ষণের টান) ও জাড্যভাব এই ত্রিগুণে গুণান্বিত ক'রে বিজ্ঞানীরা পদার্থকে শক্তি থেকে পৃথক ক'রে রেখেছিলেন। সেই সংগে একথাও বলেছিলেন শক্তির নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য সব সময়ে একটি বাহন চাই।

পদার্থই শক্তির সেই বাহন। বাতাস যদি না থাকত তা'হ'লে জীবজন্তুর বাস শুধু শোভাই হ'ত—শব্দ ব'লে কোন অনুভূতির বোধই হ'ত না। ধ্বনিশক্তিকে চলতে হয় বাতাসকে বাহন ক'রে। আলোক ও তাপশক্তির চলনদার হ'ল ইথার। (অবশ্য বিজ্ঞানীরা ইথারকে কল্পনা করেছেন এক বিচিত্র পদার্থরূপে, সাধারণ পদার্থের গুণাগুণের সংগে যার কোন সামঞ্জস্যই নেই।) কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শক্তি ও পদার্থের এই পার্থক্য মুছে গেছে। বিজ্ঞানীর কাছে পদার্থ থেকে শক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। শক্তি থেকেও পদার্থের কোনও আলাদা সত্তা নেই। শক্তি ও পদার্থ উভয়েই বিশ্বশক্তির বিভিন্ন প্রকাশভংগী মাত্র। ঐ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাক্।

এই পদার্থময় বিশ্বজগৎ শক্তির স্পর্শ পেয়েই, শক্তির স্পন্দন পেয়েই নিত্য পরিবর্তনশীল। আলোক, তাপ, বিদ্যুৎ, ধ্বনি ব্যতীত শুধু প্রকৃতিজগৎই নয়, মানুষের সভ্যজগৎও হ'ত অসম্ভব। পদার্থের গতি স্থিতিতে শক্তির যে প্রকাশ তার অভাবে সমস্ত জগৎ ও জীবন হয়ে যেত নিশ্চল। যান্ত্রিক সভ্যতার জন্মই হ'ত না কোনদিন। এই বিশ্বজগতে চলন-শক্তির (kinetic energy) প্রকাশ সর্বত্র। অণুপরমাণুর থেকে অতিকায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জের কেউই নিশ্চল হয়ে নেই। পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন প্রোটন অবিরাম আবর্তিত হচ্ছে। অণুর মধ্যে পরমাণু সদা স্পন্দমান। নক্ষত্র থেকে প্রতিটি জ্যোতিষ্ক চিরসঞ্চরণশীল। গতির মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ তাই চলনশক্তি। ছুটন্ত ঢিলকে থামাতে হ'লে জোর খাটান প্রয়োজন। ছুটন্ত ঢিলে যতখানি চলনশক্তি আছে ঠিক ততখানি শক্তি প্রয়োগ করা হ'লে তবে একেবারে নিশ্চল হবে ঢিলটি। বেগের বর্গগুণের সঙ্গে ভরের গুণফলের অর্ধেক হবে চলনশক্তির মাপ, অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ ভর × (বেগ)^2 = চলনশক্তি। নিশ্চল অবস্থায় পদার্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে স্থিতিশক্তি (potential energy)। পদার্থকে ভূতল থেকে শূন্যে তুলতে হলেও শক্তির প্রয়োজন। কারণ স্থির অবস্থায়ও পদার্থে রয়েছে শক্তি। পদার্থের এই স্থিতিশক্তি মাপা হয় পদার্থের ভর ও যতদূর পদার্থকে স্থানান্তরিত করা হয় সেই দূরত্বের গুণফল দিয়ে। অর্থাৎ ভর × দূরত্ব = স্থিতিশক্তি। গতি ও স্থিতিশক্তির প্রকাশ আমরা দেখছি সর্বত্র।

ধ্বনিশক্তির বিকাশ পদার্থের গায় তরংগ সৃষ্টি ক'রে। বাতাসে শব্দ

সৃষ্টি করলে বাতাসের কণাগুলি স্পন্দিত হয় এবং এই স্পন্দন তরংগাকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই তরংগ জীবজন্তুর কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে এবং সমপ্রকৃতির স্পন্দন সৃষ্টি করে কানের পর্দায়। সংগে সংগে অনুভূতি জন্মায় সেই শব্দের। কঠিন পদার্থের গায়ে আঘাত করলেও পদার্থের গায়ে অণুপরমাণুগুলি স্পন্দিত হয়ে শব্দের সৃষ্টি করে। ট্রেন যখন চোখে দেখা যায় না তখনও লাইনে কান পাতলে দূর থেকে আগত অদৃশ্য ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। কঠিন পদার্থে ধ্বনির স্পন্দন খুব বড় ক'রে উঠানামা করতে পারে না। তাই আওয়াজ খুব চড়া হয় না। কিন্তু গ্যাসীয় বাতাসে স্পন্দন খুব বড় ক'রে উঠা নামায় বিস্তারিত হ'তে পারে ব'লে, বাতাসে স্বরগ্রাম খুব উচ্চ থেকে উচ্চতর করা যায়। সব ধ্বনিই আমরা কিন্তু শুনতে পাই না। ৩৫ ফিট থেকে ⅔ ইঞ্চি পর্যন্ত ধ্বনিতরংগের যে দৈর্ঘ্য আমরা একমাত্র সেই ধ্বনিই শুনতে পাই। ধ্বনিতরংগের বেগ বা দৈর্ঘ্য এর চেয়ে বেশি বা কম হ'লে আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু মানুষের অশ্রুত এমন অনেক ধ্বনিতরংগ কুকুর ও কীটাণু সহজেই শুনতে পায়। ধ্বনিশক্তির উচ্চ নীচ স্বরগ্রাম নির্ভর করে স্পন্দন সংখ্যার উপর। এক সেকেণ্ডে ধ্বনিতরংগ ৩২ থেকে ৩২,০০০ পর্যন্ত স্পন্দিত হ'তে পারে। বাতাসে ধ্বনির তরংগবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,১০০ ফিট, জলে ৫,০০০ ফিট, লোহায় ১৫,০০০ ফিট। তরংগদৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন, বড় ছোট সব আকারের তরংগ কিন্তু সর্বত্র সমান বেগে ধেয়ে চলে। নইলে সংগীত ত' সংগীত হ'ত না—হ'ত বিশৃংখল হৈ চৈ আর গণ্ডগোল। সংগীতের মাধুর্য ত' নির্ভর করে বিভিন্ন আকারের শব্দতরংগ সৃষ্টি ক'রে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার ওপর। কিন্তু এই বিভিন্ন আকারের ধ্বনিতরংগ যদি আগে পিছে ছুটত তা' হ'লে আমরা শুনতাম সংগীতের বদলে কতগুলো কাটা কাটা স্বরগ্রাম। পদার্থের বাহন ছাড়া ধ্বনিতরংগ এক পাও চলতে পারে না। তাই জ্যোতিষ্কলোকের ধ্বনিও আমরা শুনতে পাই না এবং পদার্থবর্জিত অগাধ শূন্য আকাশ বেয়ে পৃথিবীর শব্দও বিশ্বজগতের আর কোথাও শ্রুত হয় না।

আলোক ও শক্তির প্রকাশ এক মহা বৈচিত্র্যের বিষয়। যে রশ্মিতে আমাদের দৃষ্টিশক্তি নির্ভর করে তাকেই আমরা বলি আলো। যেমন সূর্যের আলো, প্রদীপের আলো। কিন্তু এই দৃশ্যমান আলোও বিশুদ্ধ নয়, সাত রঙের আলোকতরংগের মিশ্রণ। বৃষ্টির দিনে জলকণার গায়ে সূর্যালোক প'ড়ে

যে বিচিত্র সাতরঙা রামধনুর সৃষ্টি করে, অথবা ত্রিশিরা কাচের (prism) গায়ে আলো ফেলে পর পর সাজান লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, অতি নীল এবং বেগুনী রংএর সাতটি আলোকতরংগে বিশ্লেষিত ক'রে যে বর্ণালীর সৃষ্টি করা যায় এ ত' সকলেরই জানা আছে। কিন্তু দৃশ্যমান আলোকই একমাত্র আলোকশক্তি নয়, বেতার তরংগ, তাপ তরংগ অতিবেগুনি তরংগ, রঞ্জনরশ্মি তরংগ, গামারশ্মি তরংগ, কসমিক বা মহাজাগতিক তরংগ ইত্যাদিও আলোক-তরংগ। বিজ্ঞানে এই একই জাতের বিভিন্ন আলোকশক্তির নাম দেওয়া হয়েছে তেজশক্তি। একই তেজশক্তির তরংগগুলি লম্বায় ছোট বড় হয়ে সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আলোকতরংগ। আমরা চোখে যে সাতটি বিভিন্ন আলোকতরংগ দেখতে পাই, লম্বায় সেই তরংগগুলি এক ইঞ্চির দশলক্ষ ভাগের আটশ' ভাগ হ'তে চোদ্দ ভাগের সমান, অর্থাৎ লাল আলোর তরংগ দিয়ে যদি একটা মালা গাঁথা যায় তা' হ'লে প্রায় তেত্রিশ শত তরংগ লাগবে মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা একটি লাল তরংগের মালা গাঁথতে। লাল আলোর তরংগের চেয়ে লম্বায় বড় হ'লে অথবা বেগনি আলোর তরংগের চেয়ে লম্বায় খাটো হ'লে তরংগগুলি আর আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু ফটোগ্রাফের প্লেটে অনেক সহজেই ধরা পড়ে। লাল আলোকতরংগের চেয়ে বড় তাপশক্তির তরংগগুলি এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের বার ভাগ থেকে এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের আটাশ ভাগের মধ্যে যে সকল তরংগের দৈর্ঘ্য সে সকল তরংগই তাপশক্তির তরংগ। তাপশক্তির তরংগের চেয়ে দীর্ঘতর তরংগদের বলা হয় বেতারতরংগ। কারণ বেতারবার্তার ডাক পিয়নের কাজ করে এই বেতারতরংগরাই। বেতারতরংগ লম্বায় পাঁচ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হ'তে পারে। বেতারতরংগ তাপতরংগের মত দৃশ্যমান আলোকতরংগের চেয়ে আকারে দীর্ঘতর, কিন্তু দৃশ্যমান আলোকতরংগের চেয়েও ক্ষুদ্রতর তেজতরংগ আছে অনেক। ক্রমান্বয়ে তাদের নাম অতিবেগুনী, রঞ্জন, গামা, কসমিক তেজতরংগ। কসমিক তেজশক্তির তরংগগুলি এত ছোট যে ইলেকট্রন-তরংগেরাও এর চেয়ে ছোট নয়—কসমিক তেজশক্তির চেয়ে খাটো তরংগ বোধ হয় আর এই বিশ্বজগতে দেখা যায় না। পঞ্চাশ হাজার কোটী কস্‌মিক্ তরংগের যদি একটি মালা গাঁথা যায় তবে সে মালা লম্বায় হবে মাত্র এক ইঞ্চি। বুঝবার সুবিধার জন্য তেজশক্তির বিভিন্ন তরংগের একটি তালিকা দেওয়া হল :—

নাম	তরংগ দৈর্ঘ্য
বেতার তরংগ—	৫ মাইল থেকে ১২/১০০০ ইঞ্চি
তাপ তরংগ—	১২/১০০০ ইঞ্চি থেকে ২৮/১০,০০০০০ ইঞ্চি
দৃশ্যমান আলোক তরংগ—	২৮/১০,০০০০০ ইঞ্চি থেকে ১৪/১০,০০০০০ ইঞ্চি
অতি বেগুনী তরংগ—	১৪/১০,০০০০০ ইঞ্চি থেকে ৫২/১০০,০০০০০০ ইঞ্চি
রঞ্জনরশ্মি তরংগ—	১৮০/১০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি থেকে ৪/১০০০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি
গামারশ্মি তরংগ—	৪/১০০০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি থেকে ২২৪/১০০০০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি
কসমিকরশ্মি তরংগ—	২৭/১০০০০০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি থেকে ১৬/১০০০০০০০০০০০০০০০০ ইঞ্চি



বিভিন্ন তরংগের কল্পনা-চিত্র

ক=বেতার তরংগ। খ—উত্তাপ তরংগ। গ=লাল আলোকতরংগ। ঘ=সাধারণ আলোকতরংগ। ঙ=অতিবেগুনী তরংগ। চ=রঞ্জন তরংগ। ছ=গামা তরংগ।

বেতারতরংগ থেকে কসমিক-রশ্মি-তরংগগুলির সব কয়টি যদি পর পর গেঁথে একটি মালা গাঁথা যায় তা' হ'লে সে মালার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ শুধু মানুষ চোখে দেখতে পারবে। বাকী উনচল্লিশ ভাগই থাকবে অদৃশ্য। এত অল্প পরিসরের আলোতে বিশ্বজগৎ আমাদের চোখে সহস্র বর্ণে কি রূপময় হয়েই না দেখা দেয়! কিন্তু তেজশক্তির তরংগগুলির সব কয়টিই যদি আমাদের দৃষ্টিকে সাহায্য করত তা' হ'লে এই বিশ্বজগৎ আরও কত বিচিত্র হয়েই না দেখা দিত আমাদের চোখে!

তেজতরংগগুলি আকারে বড় ছোট হ'লেও সবাই কিন্তু চলে সমান বেগে। তেজতরংগমাত্রেরই বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে তেজতরংগ অনায়াসে আমাদের পৃথিবীকে সাত বার প্রদক্ষিণ করতে পারে। শুধু তেজতরংগের বেগই সমান নয় এদের প্রকৃতিপরিচয়ও একই বংশে। তেজতরংগমাত্রই বিদ্যুৎ-চুম্বকী-তরংগ (electro-magnetic waves)। তাদের বেশির ভাগেরই জন্ম ইলেকট্রনের দ্রুত কম্পনে। কসমিক রশ্মির জন্ম অবশ্য সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নি এখনও। পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে, খনিতে খন্দরে সর্বত্র এই কসমিক রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র এদের অবাধ প্রবেশাধিকার, কিন্তু কোন সুদূর বিশ্বজগৎ থেকে যে এসে উদয় হয় এই রশ্মি তার জন্মস্থান এখনও জানতে পারে নি বিজ্ঞানীরা। প্রতিটি তেজতরংগের চলবার বাহন ইথার, কিন্তু তেজতরংগ যে বেগে ছুটে চলে সেই দুরন্ত বেগের সংগে সামঞ্জস্য রেখে অকম্পনীয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হওয়া কোন জড় পদার্থের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই ইথারকে এমন একটি পদার্থরূপে কল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা যার মধ্যে ভর, ওজন এবং আকর্ষণশক্তি, অর্থাৎ পদার্থের কোন গুণ নেই। তাই ইথার এমন একটি বস্তু যার প্রত্যক্ষ পরিচয় বিজ্ঞানীরা এখনও পান নি। কিন্তু ইথারের মতো কোন বস্তুকে বাহন ক'রে না চলতে পারলে তেজতরংগের চলার বেগ তো নির্দিষ্ট হতে পারত না—তাই পদার্থের গুণ না থাকলেও ইথারকে এক অভিনব পদার্থরূপে কল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইথারের জ্যামিতিক কল্পনাটুকু মাত্র স্বীকার করেন, কিন্তু ইথারের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইলেকট্রনের স্পন্দনের ফলে যে বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরংগের জন্ম হয় তা যে কি ক'রে স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় তার কারণ বিশ্লেষণের জন্য পূর্বে ইথারের কল্পনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় ইথারের কল্পনা অনেক প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করায় আধুনিক বিজ্ঞান ইথারের কল্পনাকে বর্জন করেছে।

শক্তির রূপান্তর

পদার্থ সহজে রূপান্তরিত হয় না। পদার্থপরমাণুদের একটিকে অন্যে রূপান্তরিত করা তো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এক শক্তিকে অপেক্ষাকৃত সহজেই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। কোন শক্তিই চিরকালের জন্য অপরিবর্তনশীল নয়। এই বিশ্বজগতে বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর অহরহই

চলছে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র প্রকাশ সম্ভব হয়েছে শক্তিরই নিরন্তর পরিবর্তনশীলতায়। স্থিতিশক্তি জন্ম দিচ্ছে চলনশক্তির। চলনশক্তি আবার জন্ম দিচ্ছে আলোক ও তাপশক্তির। দুরন্তবেগে ঢিল ছুঁড়ে মারলে, ঢিলটি হয়ত গিয়ে অন্য পদার্থের গায়ে আঘাত করল। আহত পদার্থের গা থেকে হয়ত বেরিয়ে এল এক ঝলক আলো। সংগে সংগে সেই আহত স্থানটি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বিজ্ঞানী কি দেখলেন এই ঘটনাটিতে?

দেখলেন, স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয়ে জন্ম দিল সমপরিমাণের চলনশক্তির। চলনশক্তি আবার রূপান্তরিত হ'ল সমপরিমাণের তাপ, আলোক এবং স্থিতিশক্তিতে। শক্তির রূপান্তরের আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কল্পনা করা যাক—একটি অন্ধকার ঘর এবং ঘরের মধ্যে এক হাত লম্বা ও পাতলা একটা ইস্পাত কাঠি এক মাথায় ধ'রে অপর মাথাটি সামনে পিছে কাঁপান হচ্ছে। স্থির ইস্পাতের কাঠিটাকে কাঁপানর ফলে স্থিতিশক্তি চলনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এক সেকেণ্ডে যদি ষোলবার কাঁপান হয় কাঠিটিকে তা'হ'লে কাঠির কম্পন থেকে ভস্ ভস্ ক'রে শব্দ বেরুতে থাকবে। কম্পন দ্রুত ক'রে ক'রে প্রতি সেকেণ্ডে কম্পনসংখ্যা যদি চল্লিশ হাজার পর্যন্ত তোলা যায়, তা'হ'লে ভস্ ভস্ আওয়াজ থেকে তীক্ষ্ণ বাজখাই আওয়াজ পর্যন্ত ধ্বনির সমস্ত স্বরগ্রামই শোনা যাবে সেই কম্পনের ভস্‌ভসানিতে। এমনি ক'রে চলনশক্তি রূপান্তরিত হবে ধ্বনিশক্তিতে। তারপর ধ্বনিসৃষ্টির পর ইস্পাতের কাঠিটি যদি আরো দ্রুতবেগে কাঁপান যায় তা'হ'লে যে শব্দতরংগের সৃষ্টি হয়ে তার স্পন্দন এত দ্রুত হবে যে সেই শব্দ আর আমরা শুনতে পাব না। কিন্তু কাঠিটিকে যদি আরো দ্রুততর কাঁপান যায় এবং স্পন্দনসংখ্যা যদি আরো বাড়ান যায় তা'হ'লে ক্রমশ তাপশক্তির উদয় হ'তে দেখা যাবে, এবং ইস্পাতের কাঠিটি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এমনি ক'রে কাঠিটিকে কাঁপানর বেগ বাড়িয়ে কম্পনসংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে যদি চার হাজার কোটী পর্যন্ত তোলা যায় তা'হ'লে উত্তাপশক্তি রূপান্তরিত হবে আলোকশক্তিতে এবং কাঠিটি লাল টকটকে হয়ে উঠবে। কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে আট হাজার কোটী পার হয়ে গেলে ইস্পাতের কাঠি থেকে যে আলোকতরংগ বিচ্ছুরিত হবে, আমরা আর সে আলোকে চোখে দেখতে পাব না। কিন্তু দৃশ্যমান আলোকতরংগের পরে সৃষ্টি হবে রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন অতি বেগুনি আলোর তরংগ। এরপরও যদি কম্পন-সংখ্যা দ্রুত করা যায় তা'হ'লে ইস্পাতের কাঠির দোলন থেকে বিদ্যুৎশক্তির

সৃষ্টি করাও অসম্ভব হবে না। একটি ইস্পাতের কাঠির কম্পনের কল্পনা থেকে শক্তির রূপান্তরের চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। দেখা গেল স্থিতির থেকে চলন, চলন থেকে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে তাপ, তাপ থেকে আলোক, আলোক থেকে রাসায়নিক, রাসায়নিক থেকে বিদ্যুৎশক্তির ক্রমাগত রূপান্তর হচ্ছে। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে পরিবর্তনশীল বহুরূপী প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনায় রয়েছে শক্তির এরূপ রূপান্তরের সাক্ষ্য।

শক্তি সংরক্ষণ

রূপান্তরের পথে শক্তির কি বিনাশ হয় না কখনও? শক্তি চির অবিনাশী, শক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে সৃষ্টির আদি দিনে যে পরিমাণ শক্তি ছিল আজও সর্বসাকল্যে সেই পরিমাণ শক্তিই রয়েছে। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্তও তাই থাকবে। একটুও কম বেশি হবে না। এক সের অদৃশ্য জলীয় বাষ্প জমিয়ে যদি কঠিন বরফে রূপান্তরিত করা যায় তা'হ'লেও বরফের ওজন যেমন এক সেরই থেকে যায়, তেমনি এক শক্তি অপর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বটে কিন্তু সমগ্র পরিমাণের লাঘবও হয় না একটু, বৃদ্ধিও হয় না একটুও। বিশ্বজগতের সমগ্র শক্তি অক্ষয় ও অব্যয়। নতুন শক্তি জন্মানও যায় না বিনাশ করাও যায় না। বিশ্বজগতের সমগ্র শক্তি চিরদিন সংরক্ষিত থাকে। বিজ্ঞানে এই নীতিই শক্তিসংরক্ষণনীতি (Law of conservation of energy) নামে বিখ্যাত। বিজ্ঞানী লোথারমেয়ার এই নীতির প্রথম আবিষ্কর্তা। সূর্যালোকের তাপ ও রশ্মি ভূতলের বিভিন্ন স্থানে কমবেশি ক'রে পতিত হয়ে জন্ম দিচ্ছে বায়ুপ্রবাহের। এই বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগান হচ্ছে পাল তুলে নৌকা-চলাচলের ব্যাপারে, বায়ুকলের পাখা-ঘোরানর কাজে; আবার এই তাপই নদী, হ্রদ, সমুদ্র থেকে বাষ্পকণার জন্ম দিয়ে আকাশে মেঘরূপে স্থিতি-শক্তির সৃষ্টি করছে। মেঘ জল হয়ে গড়িয়ে গিয়ে সৃষ্টি করছে নদীর স্রোত। নদীর স্রোতের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে তৈরী করা হচ্ছে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি। এই বিদ্যুৎ থেকে যন্ত্রশক্তির জন্ম দিয়ে চালান হচ্ছে যন্ত্র, জ্বালান হচ্ছে আলোক। সূর্যালোকের তাপ ও রশ্মি পেয়ে সমস্ত প্রাণিজগতের প্রাণরক্ষা হচ্ছে, আহার্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং দেখা যায় সূর্যালোক থেকে প্রক্ষিপ্ত তেজশক্তি কত বিচিত্র শক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে পৃথিবীতে, কিন্তু বিনষ্ট হচ্ছে না। শুরুর সেই তেজশক্তি শত প্রকারের

বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে বটে কিন্তু সর্বসাকল্যে র'য়ে যাচ্ছে চিরসংরক্ষিত। বিজ্ঞানী হেলম্ হোথ্যস (Helm holtz)-এর মতে আমাদের আদিম সূর্যের মধ্যে যে শক্তি সংরক্ষিত ছিল আজকের দিনের সূর্যে তার চারশ চুয়ান্ন ভাগের এক ভাগ শক্তি সংরক্ষিত আছে। বাকী চারশ' তিপ্পান্ন ভাগের সবটুকুই রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন শক্তিরূপে।

পদার্থের সংরক্ষণ

শক্তির যেমন জন্ম-মৃত্যু নেই পদার্থেরও তেমনি জন্ম-মৃত্যু নেই। পদার্থ সৃষ্টিও করা যায় না বিনাশও করা যায় না। এই নীতিকেই বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার পদার্থের সংরক্ষণ নীতি (Law of conservation of matter) নাম দিয়েছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে নতুন নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাতে পদার্থের মূল উপাদানের ওজনের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দুই গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস এবং ষোলো গ্রাম অক্সিজেন গ্যাস একত্র ক'রে অদৃশ্য গ্যাসকে দৃশ্যমান তরল জলে রূপান্তরিত করলে হুবহু আঠার গ্রাম জল পাওয়া যাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে। এক তিলও কমবেশি হবে না জলের পরিমাণে। মোম জ্বালিয়ে নিঃশেষ ক'রে ফেললেও মোমের মূল উপাদান কারবন ও হাইড্রোজেনের এক বিন্দুও বিনষ্ট হয় না, শুধু বাতাসের সংগে মিশে কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি করে। মানুষের শরীরের প্রায় এক হাজার কোটী কোটী কোটী $১০^{২৭}$ পরমাণু দিয়ে গড়া। কিন্তু মানুষের মৃতদেহ যখন পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তখনও এই পরমাণুগুলির একটিও বিনষ্ট হয় না, শুধু বিভিন্ন গ্যাসরূপে মিলে যায় আকাশে এবং বাকী কিছুটা পড়ে থাকে ছাইরূপে। কিন্তু প্রতিটি পরমাণু থাকে অবিকৃত ও সংরক্ষিত।

শক্তির জড়াত্মক গুণ

১৯০১ সালে বিজ্ঞানী হেসেনওরল (Hasenoral) প্রথম আবিষ্কার করেন তেজশক্তিরও পদার্থের মতো চাপ দেবার ক্ষমতা আছে। পদার্থের উপর রশ্মিপাত ক'রে তেজশক্তিও পদার্থের গায়ে চাপ দেয়, যেন তেজশক্তিরও ভার আছে। কিন্তু আলোকের যদি কোন ভর না থাকে, ওজন না থাকে, তা হলে কোন বস্তুর গায়ে আলোকপাত হ'লে কেন বস্তুটি অনুভব করবে যে

ভারের চাপে সে নিষ্পেষিত হচ্ছে? আলোকশক্তির যদি চাপ দেবার ক্ষমতা থাকে তা হলে আলোকের ভরও আছে। এবং আলোকের যদি ভর থাকে তা হ'লে পদার্থের আকর্ষণ (Gravitation) আলোকের ওপর কার্যকরী হবে না কেন? অর্থাৎ আলোকেরও ওজন থাকবে না কেন? বস্তুত আলোক-শক্তির চাপ দেবার ক্ষমতা বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে ধরা পড়েছে। এই চাপের পরিমাণ খুব অল্প বটে কিন্তু চাপ দেবার ক্ষমতা যে আলোকশক্তির রয়েছে তা'তে তো কোন সন্দেহ নেই। এক বর্গ মাইল স্থান জুড়ে আলোকশক্তি যে চাপ দেয় তার পরিমাণ দেড়সের। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের মাত্র এক বর্গ ইঞ্চি স্থান জুড়ে যে চাপ দেয় তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে সাত সের। তুলনায় আলোকের চাপ দেবার ক্ষমতা নগণ্য বললেও চলে। কিন্তু পরিমাণ যাই হোক, আলোকশক্তি যে পদার্থের মতো চাপ দিতে পারে এইটিই বিজ্ঞানের একটি বিশেষ আবিষ্কার। চাপ দেবার ক্ষমতার প্রত্যক্ষতা থেকে প্রমাণিত হ'ল আলোকশক্তির ভরও আছে। কিন্তু ভর যদি থাকে আলোকশক্তির, তা'হলে মাধ্যাকর্ষণ আলোকশক্তির উপর কার্যকরী হবে না কেন?

আলোকশক্তির ভর এত নগণ্য যে আমাদের পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের ফলে আলোকরশ্মি সত্যি সোজা পথ ছেড়ে বেঁকে যায় কিনা তা লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের দূর নক্ষত্র থেকে আসা আলোকরশ্মির বেলায় আলোকের বক্রগতি লক্ষ্য করা সম্ভব। দূর নক্ষত্রের যে আলোকরশ্মি সূর্যের প্রায় গা ঘেঁষে এসে পতিত হয় পৃথিবীতে, সূর্যের দেহপিণ্ডের টান লেগে সেই আলোকরশ্মি যে বেঁকে যাবে এটাই সম্ভব। সূর্যালোকের তীক্ষ্ণতায় সূর্যের পার্শ্ববর্তী নক্ষত্র দেখা যায় না ব'লে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যালোকের চারপাশের নক্ষত্রের ফটো নিয়ে দেখা গেছে যে বাস্তবিকই নক্ষত্র থেকে আসা আলোকরশ্মি সূর্যের গা ঘেঁষে চলার সময় সোজাসুজি চলতে পারে না, সূর্যের দিকে একটু বেঁকে যায়। সূর্যের মহাকর্ষের ফলে আলোক-শক্তি সূর্যের দিকে বেঁকে যায় প্রায় সোয়া দুই ইঞ্চি (২·৩")। বাঁকবার পরিমাণ এত অল্প ব'লেই সচরাচর আলোকের বেঁকে যাওয়া লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষায় জানা গেল আলোকের চাপ দেবার ক্ষমতাও আছে—মহাকর্ষের টানে বেঁকেও যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহেই বলা যায় আলোকের ভরও আছে ওজনও আছে—মধ্যাকর্ষের টানেও কাবু হয় আলোকরশ্মি। শুধু তাই নয়, বাধা না পেলে যখন আলোকরশ্মি চিরকালই সমান বেগে চলতে পারে, তখন

নির্ভুল ভাবেই বলা যায় আলোকশক্তির জাড্য ভাবও আছে। আলোক-শক্তি অর্থাৎ তেজশক্তির যখন ভর আছে, ওজন আছে এবং জাড্য ভাবও আছে তখন আলোকের শক্তির সঙ্গে পদার্থের পার্থক্য রইল কোথায়? ভর, ওজন ও জাড্য ভাব—এই ত্রিগুণে ভূষিত হ'লেই তো বস্তুকে পদার্থ বলা হয়। তেজশক্তিও যখন এই ত্রিগুণের অধিকারী তখন তেজশক্তিকে পদার্থের নামান্তর বলা যাবে না কেন?

এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে (Theory of relativity) তিনি বলেন চলনশক্তিরও ভর আছে। এই সিদ্ধান্তটিকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, কোন পদার্থপিণ্ড যখন চলতে থাকে তখন তার ভর বেড়ে যায়। আইনষ্টাইনের গবেষণায় এত কালের প্রচলিত নিউটনের গতিবিজ্ঞানের মূল সূত্রই উল্টে দেওয়া হ'ল। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল পদার্থপিণ্ডের ভরের কোন হ্রাস বৃদ্ধি নেই, নিশ্চল বা সচল অবস্থায় সব সময়েই পদার্থের ভর এক এবং অপরিবর্তনীয় থাকে। কিন্তু আইনষ্টাইনের গবেষণায় জানা গেল গতিবৃদ্ধির সংগে পদার্থ-পিণ্ডের ভরেরও পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। শুধুমাত্র গতির জন্যই তো পদার্থপিণ্ডের পরমাণুর সংখ্যা বাড়তে পারে না?—সুতরাং পদার্থের ভরবৃদ্ধির জন্য দায়ী শক্তি এবং চলনশক্তির ভর।

চলনশক্তির ভরের পরিমাণ এত অল্প যে সাধারণ কোন চলন্ত পদার্থ-পিণ্ডের ভরের তারতম্য লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না। একমাত্র যে পদার্থের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি বা প্রতি সেকেণ্ডে একশ' ছিয়াশী হাজার মাইলের কাছাকাছি, অর্থাৎ অতি বেগের জন্য চলনশক্তির পরিমাণ যদি হয় খুব বেশি তা' হ'লেই ভর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা সম্ভব। এরূপ দুরন্ত বেগে এই পৃথিবীর বুকে ছুটতে পারে এমন কোন পদার্থ-পিণ্ডের সন্ধান নিউটনের যুগে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের ফলে এরূপ দুরন্ত বেগে ছোটা পদার্থকণার সন্ধান পাওয়া গেছে। রেডিয়াম থেকে যে ইলেকট্রন কণা নির্গত হয় তার বেগ প্রায় তেজরশ্মির বেগের কাছাকাছি। চলন্ত ইলেকট্রনের ভর মেপে দেখা গেছে বাস্তবিকই চলার সংগে সংগে ইলেকট্রনের ভর বৃদ্ধি হয়। ইলেকট্রনের গতিবেগ যদি হয় প্রতি সেকেণ্ডে তিরানব্বুই হাজার মাইল অর্থাৎ আলোকের অর্ধেক, তা'হ'লে ইলেকট্রনের ভর এক সপ্তমাংশ ($\frac{১}{৭}$) বৃদ্ধি পাবে। এই বেগ বাড়িয়ে

যদি প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৭,৪০০ মাইল অর্থাৎ আলোকের নয় দশমাংশ করা যায়, তা'হ'লে ইলেকট্রনের ভর বেড়ে হবে আড়াইগুণ। বেগ আরও বাড়িয়ে যদি আলোকের বেগের একশ ভাগের নিরানব্বুই ভাগ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৪,১৪০ মাইল পর্যন্ত তোলা যায়, তা'হ'লে ইলেকট্রনের ভর শতগুণ বেড়ে যাবে। এর পরও যদি ইলেকট্রনের বেগ বাড়ানো যায় তা'হ'লে হাজার হাজার গুণ বাড়তে থাকবে ইলেকট্রনের ভর। এবং যখন ইলেকট্রনের বেগ আলোকের বেগের সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল হবে, তখন ইলেকট্রন হবে অনন্ত পরিমাণ ভরের অধিকারী। কোন অংক দিয়ে, এমন কি কোন কল্পনা দিয়েও এই অনন্ত ভরের পরিমাণ মাপা সম্ভব হবে না। অনন্ত (infinite) ভরের পরে ইলেকট্রনের ভর বৃদ্ধি আর সম্ভব নয়। কারণ অনন্ত ভারীর চেয়েও ভার আরও অধিকতর বৃদ্ধি করা সম্ভাব্যের বাইরে। আলোকরশ্মির বেগে ইলেকট্রনের অনন্ত ভার বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটিই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায় এই ভাবে— তেজরশ্মির বেগই বিশ্বজগতের চূড়ান্ত বেগ। কোন শক্তি বা কোন পদার্থ তেজরশ্মির গতিবেগের চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটতে পারবে না কোন সময়। বেগের চূড়ান্ত মাত্রা হ'ল তেজরশ্মির বেগ।

বেগের সঙ্গে ভরবৃদ্ধি হয়—ইলেকট্রন নিয়ে পরীক্ষা ক'রে যখন এ সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হ'ল তখন নিঃসন্দেহে বলা চলে চলনশক্তিও পদার্থের মতোই ভরের অধিকারী। সাধারণতঃ চলতে গিয়ে ভর বৃদ্ধি হলো কিনা তা' আমরা টের পাই না। কারণ অল্পবেগে চলনশক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে তা'র কোন প্রভাবই লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন মানুষ দৌড়োতে দৌড়োতে যদি আলোকের বেগের কাছাকাছি গিয়ে পৌছুতে পারত, তা'হ'লে নিজেই টের পেত তার শরীরের বাড়তি ওজনের। আর যদি আলোকের সমান বেগে সে ছুটতে পারত তা'হ'লে মানুষের ক্ষুদ্র কলেবর হয়ে উঠত অনন্তভার। বিশ্বজগতের কোন পাল্লা বাটখারা দিয়েই সেই অনন্তভার মানুষটির ওজন নেওয়া সম্ভব হ'ত না।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে নির্ভুল ভাবে জানা গেল স্থিতি-শক্তি, চলনশক্তি, তেজশক্তি, তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি যে কোনরূপেই শক্তির প্রকাশ হ'ক না কেন, শক্তি মাত্রেরই ভর আছে। শুধু যে ভর আছে তাই নয়, শক্তির ওজনও আছে। শক্তির উপর মহাকর্ষের প্রভাব প'ড়ে জন্ম দেয় পদার্থের ওজনের। মহাকর্ষের টানের ফলে শক্তির যে ভর বৃদ্ধি হয় তার পরিমাণ

খুবই অল্প। আদি ভরের পাঁচ কোটী ভাগের এক ভাগ ভর মাত্র বাড়ে মহাকর্ষের টানে। শক্তি মাত্রেরই ভর এবং ওজন ছাড়া জাড্য ভাবও রয়েছে। শক্তির এই ত্রিগুণের আবিষ্কারের ফলে পদার্থ থেকে শক্তিকে পৃথক করবার কোন উপায়ই আর রইল না! ভর, মধ্যাকর্ষ আর জাড্য ভাব এই ত্রিগুণের উপর কায়েমী অধিকারের বৈশিষ্ট্যেই পদার্থকে শক্তি থেকে স্বতন্ত্র ক'রে কল্পনা করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর এই বিচিত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে শক্তি ও পদার্থের সকল ভেদাভেদই মুছে গেল। শক্তি ও পদার্থ, পদার্থ ও শক্তি—এই বিশ্বজগতে পুঞ্জ-পুঞ্জ যত পদার্থ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে তারা শক্তিরই সংহত রূপ। যেন বিশ্বসৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কোন অজ্ঞাত কারণে শক্তির মহাসাগর জমে জমে দৃশ্যমান ও স্পর্শকাতর বস্তুরাশিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মহা আবিষ্কারের ফলে বিশ্বজগতের মূল উপাদানের অসামঞ্জস্যও দূর হয়ে গেল। শক্তিও পদার্থ ব'লে দু'টি স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকার করবার প্রয়োজন আর রইল না। জানা গেল এই বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান হ'ল একটি শক্তি। এক বহুরূপী মহাশক্তি যেন শতশক্তির বিচিত্ররূপে, কখনও তেজশক্তিতে, কখনও তাপশক্তিতে, কখনও বিদ্যুৎশক্তিতে, রূপান্তরিত হয়ে বহুরূপে আপনার পরিচয় দিচ্ছে। কখনও আবার রাশি রাশি স্থূল বস্তুতে সংহত হয়ে জাহির করছে আপনার বিচিত্র প্রকাশ প্রতিভা। মহাশক্তির অনন্ত প্রতিভায় জড় ও শক্তির স্বাতন্ত্র্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে জানিয়ে দিল সেই চিরন্তন সত্য যে এই বিশ্বজগতের সনাতন উপাদান বহু নয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শক্তি ও পদার্থের সম্বন্ধ

শক্তি ও পদার্থের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হওয়ার ফলে পদার্থের ওজনের স্থিরতা আর রইল না। যখনই পদার্থের অবস্থান্তর হয় তখনই পদার্থকে বাহন ক'রে শক্তিরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ফলে পদার্থের ওজনেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন বস্তু যদি চলতে থাকে, যদি উত্তপ্ত হয়, আলোক যদি শোষণ করে, বিদ্যুৎ যদি সঞ্চারিত হয় পদার্থের গায়ে, তা'হলে যে পরিমাণে শক্তির সঞ্চার হবে বস্তুতে ঠিক সেই পরিমাণে ওজনও বাড়বে বস্তুপিণ্ডে। পক্ষান্তরে তপ্ত বস্তু যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যদি আলো বিকীর্ণ করে, যদি চলতে চলতে থেমে যায়, তা'হ'লে যে পরিমাণ শক্তির হ্রাস হবে ঠিক সেই পরিমাণ ওজনেরও হ্রাস হবে বস্তুপিণ্ডটির। শক্তির ওজন এত কম যে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধিতে পদার্থের

ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি সাধারণত অনুভব করা সম্ভব হয় না। রেডিয়াম থেকে অবিরাম তাপশক্তি নির্গত হয়, কিন্তু এক বছর পরে দশলক্ষ কেলরি তাপশক্তি বিচ্ছুরিত ক'রে একগ্রাম রেডিয়ামের ভর ক্ষয় হয় মাত্র এক গ্রামের বিশকোটী ভাগের এক ভাগ ($\frac{১}{২০০০০০০০০}$)। বিরাটবপু সূর্য তেজবিচ্ছুরণের ফলে যে শক্তি ক্ষয় করে তা কিন্তু কম নয়। সূর্যদেহের একবর্গ ইঞ্চি স্থান থেকে যে পরিমাণ তেজশক্তি বিচ্ছুরিত হয় সেই শক্তি দিয়ে অনায়াসে পঞ্চাশ ঘোড়ার একটা চলন্ত গাড়ীকে থামিয়ে দেওয়া যায়। প্রতি বছর সূর্যদেহ থেকে যে তেজশক্তির অপচয় ঘটে তার ফলে সূর্যের যে ওজন হ্রাস হয় তার পরিমাণ প্রায় তিন হাজার আটশ কোটী টন। এত বিপুল শক্তি ক্ষয় ক'রেও কিন্তু সূর্য আরও আশীহাজার কোটী বৎসর এমনি প্রবল ভাবে তেজ দান করতে পারবে।

পদার্থ শক্তির সংহতিমাত্র—এই মন্তব্যের সংগে সংগে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে একখণ্ড পদার্থপিণ্ডের মধ্যে কতখানি শক্তি সংহত থাকতে পারে? খুব একটা সাধারণ অংক দিয়ে শক্তি ও পদার্থের সম্বন্ধটির হিসাব জানা যায়। একখণ্ড পদার্থের ওজনের সংগে আলোকের বেগের বর্গগুণসংখ্যাটি পূরণ করলে যে বিরাট সংখ্যা পাওয়া যাবে তাই হবে সংহত শক্তির মাপ, যাকে অংকের ভাষায় লেখা যায়—

$$\text{শক্তি} = \text{ওজন} \times (১৮৬,০০০ \times ১৮৬,০০০)$$

কেউ যদি শক্তির ভর মাপতে চায় তা'হ'লে শক্তির পরিমাণ জেনে তাকে ($১৮৬,০০০ \times ১৮৬,০০০$) সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করলেই পাওয়া যাবে শক্তির ভর। এই বিরাট সংখ্যা দিয়ে যে কোন শক্তির পরিমাণকে ভাগ করলে তার ভাগফল যে কত কম হবে তা' সহজেই অনুমান করা যায়। তাই সচরাচর পদার্থের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পদার্থের যে ভর বৃদ্ধি হয় তা'ও সহজে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। খুব জোর কদমে সাইকেল চালিয়েও আমরা নিজেদের দেহের ওজন বৃদ্ধি অনুভব করি না।

শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরিত করলে তার পরিমাণ খুব বেশি হয় না কিন্তু পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে তার পরিমাণ হবে বিরাট। একসের বালুকে পিষে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হ'ত তা'হলে বালু থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ পাওয়া যেত এককের ওজনের সংগে $১৮৬,০০০ \times$

১৮৬,০০০ সংখ্যার গুণফলের সমান। সুতরাং পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হ'লে কি বিপুল শক্তিরই না উদ্ভব হওয়া সম্ভব! নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন হয়তো সূর্যের তেজশক্তি এমনি ভাবে পদার্থের রূপান্তর থেকেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর গবেষণাগারে পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার উপায় উদ্ভাবন করা যদি কোন দিন সম্ভব হয় তা'হ'লে তেল ও কয়লা পুড়িয়ে শক্তি বা 'পাওয়ার' সৃষ্টি করার প্রয়োজন আর পড়বে না। পৃথিবীর খনিতে কয়লা নিঃশেষ হয়ে গেলে জ্বালানী কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়েও মানুষকে আর ভাবতে হবে না। যদি পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় তা'হ'লে ২৫,০০০ টন কয়লা পুড়িয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, যে কোন পদার্থের এক গ্রাম বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে সেই পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক গ্রাম কয়লা থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে পাঁচ গাড়ী বোঝাই কয়লা পুড়িয়েও মাত্র সেই পরিমাণ শক্তিই পাওয়া যাবে। পদার্থ থেকে এরূপ বিপুল শক্তির জন্মের কথা অদ্ভুত মনে হ'লেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ খুবই সত্য। এক গ্রাম মাটিকে শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে একটা সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে কলকাতা থেকে টোকিও যেতে পারবে। আধসের বালু পিষে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা' দিয়ে সমস্ত বাংলা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে মানুষের কাজে লাগাবার সম্ভাবনা এখনও কল্পনার সীমানাতেই আটকা প'ড়ে আছে, কার্যকরী কোন উপায়ই উদ্ভাবন করা এখনও সম্ভব হয় নি। পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজ কত দুঃসাধ্য তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। পদার্থপরমাণুকে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় বিজ্ঞানী কক্রফট (Cockcroft) ও ওয়ালটন (Walton) প্রোটন দিয়ে লিথিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত ক'রে দু'টি কৃত্রিম হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন। এই রূপান্তরে একটি পরমাণু ও একটি প্রোটন মিলিত হয়ে আবার ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি করে দু'টি হিলিয়াম পরমাণু। লিথিয়াম ও প্রোটনের সংযুক্ত পরমাণবিক ওজন ৮'০১৭৬ এবং দু'টি হিলিয়াম পরমাণুর যুক্ত ওজন ৮'০০২২। কিন্তু সংযুক্ত লিথিয়াম ও প্রোটন যদি রূপান্তরিত হয় হিলিয়ামে তা'হ'লে বাকী '০১৫৪ পরমাণবিক ওজনের পদার্থের কি হ'ল? কৃত্রিম রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ফরমূলায় লেখা যায় এই ভাবে—

লিথিয়াম + প্রোটন = হিলিয়াম + হিলিয়াম + মুক্তপদার্থ

৭·০১০৪ + ১·০০৭২ = ৪·০০১১ + ৪·০০১১ + ·০১৫৪

অর্থাৎ ·০১৫৪ পরমাণবিক ওজনের পদার্থ কৃত্রিম রূপান্তরের সময় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই শক্তি সদ্য উৎপন্ন হিলিয়াম পরমাণুর প্রত্যেককে যুগিয়েছে আশীলক্ষ ইলেকট্রন ভোল্টের চলনশক্তি। স্বভাবতই মনে আশা জাগতে পারে একটি মাত্র লিথিয়াম পরমাণুকে রূপান্তরিত ক'রেই যখন এরূপ বিপুল চলনশক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব, তা'হ'লে এক গ্রাম লিথিয়াম, যার মধ্যে কোটী কোটি লিথিয়াম পরমাণু রয়েছে, তা' শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে কী বিপুল শক্তিরই না উদ্ভব হ'ত! কিন্তু বস্তুত এই রূপান্তর প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। পাঁচ লক্ষ ভোল্ট শক্তির জোরে যদি প্রোটনকে লিথিয়ামের কেন্দ্রে আঘাত করার জন্য ছুঁড়ে মারা যায় তা'হ'লে একশ কোটি প্রোটনের মধ্যে মাত্র একটি গিয়ে লিথিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র ভেদ করতে পারবে—বাকী সবগুলিই লিথিয়াম পরমাণুর এদিক সেদিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যায় পরমাণুর কৃত্রিম রূপান্তরের উপায়ে পদার্থকে বিচূর্ণ ক'রে যে শক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব, প্রায় সেই পরিমাণ শক্তি কৃত্রিম রূপান্তরের কাজ সমাধা করার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে লাভের অংক থেকে খরচের অংক বাদ দিয়ে শক্তি আর উদ্বৃত্ত থাকে না মোটেই।

শক্তি ও পদার্থের রূপের ঐক্য আবিষ্কারের ফলে পরমাণুজগতের অনেক রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন হ'ল ৪·০০৩৮৪। পদার্থের মূল উপাদান ও পরমাণবিক সংগঠন আবিষ্কার হওয়ার ফলে জানা গেছে যে একটি হিলিয়াম পরমাণু দু'টি প্রোটন, দু'টি নিউট্রন ও দু'টি ইলেকট্রন নিয়ে সংগঠিত। সুতরাং হিলিয়ামের পরমাণবিক ওজন হবে প্রোটন নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংযুক্ত ওজনের সমান, অর্থাৎ

২ প্রোটন + ২ নিউট্রন + ২ ইলেকট্রন = হিলিয়াম।

কিন্তু দেখা যায় যদিও হিলিয়ামের ওজন হওয়া উচিত ৪·০৩৪১৮ কিন্তু বাস্তবিক হিলিয়াম পরমাণুর ওজন পাওয়া যায় ৪·০০৩৮৪। তা'হ'লে বাকী ·০৩০৩৪ পরমাণবিক ওজনের পদার্থ হারিয়ে গেল কোথায়? হিলিয়ামপরমাণু সংগঠনের সময় ·০৩০৩৪ পরমাণবিক ওজনের পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন পরস্পরে জমাট বেঁধে একটি হিলিয়াম-পরমাণুদানা সংগঠনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তার যোগান দেয় এই সদ্য

উদ্ভূত পদার্থশক্তি। পরমাণুরূপে জমাট বাঁধবার জন্য হিলিয়ামের বেলায় এত শক্তির ব্যয় হয় ব'লেই হিলিয়ামপরমাণু বিশেষভাবে স্থায়ী ও মজবুত। কৃত্রিম উপায়েও হিলিয়ামপরমাণুকে বিচূর্ণ করা তাই দুঃসাধ্য কাজ।

সমঘর পদার্থের পরমাণবিক ওজনের বেলায়ও যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তার কারণও পদার্থের রূপান্তর। পরমাণুসংগঠনে দানা বাঁধবার জন্য কিছু কিছু তেজশক্তি, চলনশক্তি, ইত্যাদি ব্যয় করার প্রয়োজন পড়ে সব সময়েই—পরমাণু নিজেই কিছু পরিমাণ পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে সেই শক্তির চাহিদা মিটিয়ে নেয়।

পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন—এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শক্তিসংরক্ষণ ও পদার্থসংরক্ষণ নীতি নামে দু'টি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক নীতি স্বীকারের প্রয়োজন আর রইল না। দু'টি নীতিই সমন্বিত হয়ে গেল বিশ্বশক্তি সংরক্ষণের একটি নীতিতে। এই নয়া নীতি অনুযায়ী—শক্তিই এই মহাবিশ্বের একমাত্র মূল উপাদান। এবং এই বিশ্বের চারি সীমায় যা কিছু ছড়িয়ে আছে সবই শক্তির বিশিষ্ট রূপ মাত্র। এই মহাবিশ্বের মোট শক্তি অবিনাশী। শক্তি বিচিত্র রূপে রূপান্তরিত হ'তে পারে, কিন্তু মোট শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না কোন কালেই। সৃষ্টির আদি দিনেও এই মহাবিশ্বে যে মোট শক্তি ছিল আজও তাই আছে, ভবিষ্যতেও তার বিনাশ হবে না।

বিশ্ব পদার্থের মোট পরিমাণ

পদার্থের মৌলিক উপাদানের সন্ধান এবং সে উপাদানের আদি প্রকৃতির পরিচয় অনেকখানি জানা হ'লে স্বভাবতই বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগবে —এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিপুল পদার্থ রাশির মোট পরিমাণ কত? পদার্থ যখন শক্তিরই স্থূল সংহতি তখন জিজ্ঞাসাটিকে আরও সোজা প্রশ্নের আকারে বলা যায়— দিগন্তব্যাপী এই মহাবিশ্বশক্তির মোট পরিমাণ কত? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে মহাদেশের (space) বুকে বিশ্বশক্তিরাশি ছড়িয়ে আছে সেই মহাদেশ কি সীমার বন্ধনে আবদ্ধ? না, মহা অসীমে পরিব্যাপ্ত?

যে মহাদেশের বুকে এই বিশ্বশক্তি ছড়িয়ে আছে সে দেশ যদি সসীম না হয়ে অসীম হয়, তা'হ'লে এই অসীম দেশের বুকে ছড়িয়ে থাকা অসীম বিশ্বশক্তির কোন হিসেব করা কি সম্ভব? অসীমকে তো সীমার মাপে বাঁধা যায় না!

সসীম দেশ

আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন যে দেশের কল্পনা করেছেন সে দেশ শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিন মাত্রাতেই আবদ্ধ নয়, চতুর্মাত্রার ক্রমন্বয়তায় পরিব্যাপ্ত। ত্রিমাত্রিক দেশের কল্পনা আমরা মনে মনে গড়তে পারি কিন্তু চতুর্মাত্রিক দেশের কল্পনা মানব-ধারণার অগম্য। একমাত্র গণিতের সাহায্যে চতুর্মাত্রিক দেশকে মূর্তিমন্ত করা সম্ভব। আপেক্ষিক তত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুর্মাত্রিক দেশ কখনও অসীম হতে পারে না। দেশেরও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। দেশের সীমা আছে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান প্রত্যক্ষপরীক্ষা দ্বারা করা সম্ভব নয়। তাই ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে জটিল অংকের যুক্তি জাল দিয়ে।

আকাশের পানে চেয়ে আইনষ্টাইনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—দেশ কি সত্যই অসীম ? যদি তাই হয় তবে অসীম মহাদেশের বুকে সমভাবে ছড়িয়ে থাকা জ্যেতিষ্কমণ্ডলী রাত্রির আকাশকে আরও জ্যোতির্ময় ক'রে তোলে না কেন ? রাত্রির আকাশে যে জ্যোতির প্লাবন দেখা যায় সে জ্যোতির তেজ তো পর্যাপ্ত ব'লে মনে হয় না। সৌরমণ্ডলের গতি-সাম্যের নিদর্শন তাঁর মনে আরও গভীর চিন্তা জাগিয়ে প্রশ্ন তোলে—অসীম দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে জ্যোতিষ্করা ইতস্ততভাবে আকর্ষণ করছে পরস্পরকে, কিন্তু এই বিপুল শক্তির আকর্ষণে সদা সঞ্চরমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কেউ কেউ উদগ্র চঞ্চল হয়ে উঠছে না কেন ? সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবেগ ছাপিয়ে কেন কোণে কোণে জ্যোতিষ্ক অপরিসীম বেগে ছুটে চলছে না ? পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে কোন কোন নক্ষত্রের গতিতে অপরিসীম বেগ সঞ্চার হওয়া উচিত কিন্তু শত অনুসন্ধানেও দুর্দান্ত গতিবেগে কোন জ্যোতিষ্ককে ছুটতে দেখা যায় না কেন ? বরং সৌরমণ্ডলী নীহারিকামণ্ডলীর অন্তর্গত গ্রহ ও নক্ষত্ররাজির মধ্যে বিশেষ গতি-সাম্যের নিদর্শনই পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অসীম দেশের বুকে জ্যোতিষ্করাজির সংখ্যা যদি হয় সীমাবদ্ধ, তা'হ'লে প্রতিটি জ্যোতিষ্ক অসীম দেশের অনন্ত সীমার কোণে কোণে হারিয়েই বা যাবে না কেন ? এমনিতর কতগুলি প্রশ্নের কোন সমাধান না পেয়ে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন জটিল অংকের যুক্তিতে সিদ্ধান্ত করেন যে দেশ অসীম নয়, সসীম। কিন্তু দেশ সসীম হ'লেও সান্ত নয় অনন্ত। সিদ্ধান্তটি দুর্বোধ্য ও পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই সিদ্ধান্তটি

দুর্বোধ্য ও মানব-কল্পনার অনধিগম্য। ঐ সিদ্ধান্তের অধিগমন শুধু অংকের সীমানাতেই আবদ্ধ। সসীম বা শেষের কল্পনা করা মানবমনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যখন বলি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম সীমা ইউরাল পর্বত—সংগে সংগেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে ইউরোপের ছবি। যদি বলি উত্তর মেরু সীমা—অমনি মনে জাগে মেরুর ওপারে তেজশক্তি-ছড়ান আকাশ এবং সেই আকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্কের কথা। সুতরাং আমাদের সীমার কল্পনাটি আপেক্ষিক। যার পেছনে কিছু নেই, এমন কি শূন্যময় আকাশ পর্যন্ত নেই, বিশ্ব জগতের এরূপ কোন চরম বা একান্ত সীমার কল্পনাও মানুষের ধারণার অতীত। তবু একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিয়ে সসীম ও অনন্তের সম্বন্ধ বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কমলালেবুর মতো আমাদের পৃথিবী একটি ঘন গোলক। ঘন গোলক এই পৃথিবী সসীম, কিন্তু পৃথিবী পরিক্রমণ করতে চাইলে ওই পরিক্রমণের অন্ত হবে না কোনদিন। অবিরাম পারবেষ্টন ক'রে চললেও শেষ পাওয়া যাবে না পৃথিবীর সীমার। তাই পৃথিবী সসীম বটে কিন্তু আবার অনন্তও। তেমনি চতুর্মাত্রিক দেশের ঘন গোলকেরও সীমাবদ্ধ আয়তন আছে বটে কিন্তু শেষ নেই। তাই দেশ সসীম হ'লেও অনন্ত। বোঝবার একটু সাধারণ চেষ্টা ছাড়া এই চতুর্মাত্রার ঘন গোলকের অবতারণাকে একটা কাল্পনিক চিত্রে খাড়া করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই। কারণ এই চতুর্মাত্রার ঘনগোলক আংকিক পরিকল্পনা মাত্র, ঘটনার পরিবেশে এর মূর্তি আঁকা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

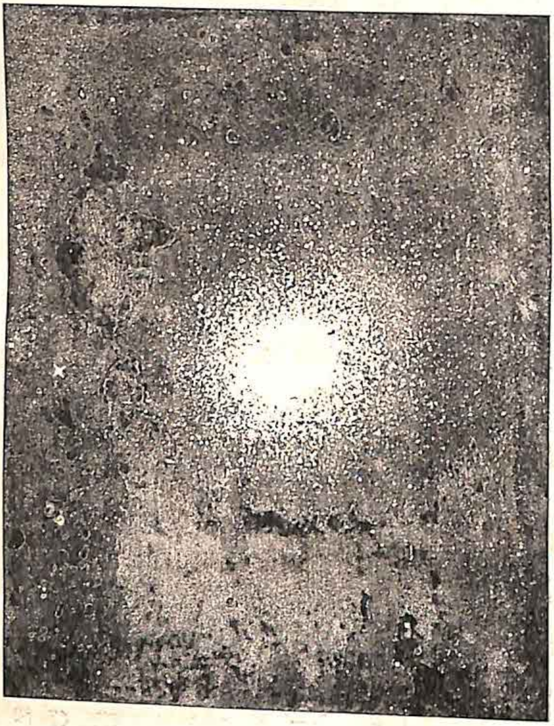
জ্যোতিষ্ক লোক

এই সসীম বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে মহাশক্তি— কোথাও তেজ-শক্তিরূপে কোথাও শক্তির সংহতিরূপে। যে আকাশকে আমরা শূন্যময় বলে কল্পনা ক'রে থাকি, তার সবটুকুই তেজশক্তির তরংগপ্রবাহে প্লাবিত। এই প্লাবিত তেজশক্তির মহাসাগরে দ্বীপের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে পুঞ্জ পুঞ্জ শক্তির সংহতি। এই এক একটি শক্তির সংহতিই পদার্থময় জ্যোতিষ্কজগৎ। এই মহাবিশ্বের বুকে ছড়িয়ে-থাকা জ্যোতিষ্কজগতের মোট পদার্থের পরিমাণ যদি আমরা জানতে পারি, তা'হ'লেই বিশ্বের সমগ্র পদার্থের একটা মোটামুটি হিসেবের অংক দাঁড় করান সম্ভব। কারণ এই বিপুল বস্তুরাশির তুলনায় আকাশের সমগ্র তেজশক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে বিশ্বপদার্থের সংগে এই

নগণ্য পদার্থের পরিমাণ যোগ করলেও বিশ্বপদার্থের বিরাট ওজনসংখ্যার তিলমাত্র তারতম্যও হবে না।

বিশ্বজগৎ সসীম হ'লেও মানুষের কল্পনায় এর পরিধি 'সীমার মধ্যে অসীমের' মতই বিরাট ও ব্যাপক। কত কোটি কোটি যোজন দূরে ছড়িয়ে আছে এক একটি জ্যোতিষ্কলোক। আগুনের পিণ্ড এই সবিতৃদেব, যার জ্যোতির দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে আমাদের পৃথিবী, বেঁচে আছে আমাদের জীবন ও প্রাণ; এই সবিতৃদেবের দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে ন' কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল। কিন্তু বিশ্বজগতের দূর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দূরত্বের তুলনায় সূর্যকে আমাদের পাশের বাড়ীর পড়শীও বলতে পারি। মহাবিশ্বলোকের বাসিন্দারা যখন আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে দূরে অবস্থান করছে তখন কি উপায়ে মাপব এদের দূরত্ব, এদের ওজন? মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অসহায়ত্ব দূর করছে আলোকতরংগ। আলোকতরংগ এই বিশ্বলোকের সংবাদদাতা। বিশ্বের কোণে কোণে অবস্থিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জ থেকে যে আলোকতরংগ আমাদের পৃথিবীতে আসে, তাকে বন্দী ক'রেই বিজ্ঞানীরা খবর করেন সেই সব জ্যোতিষ্কলোকের। জ্যোতিষ্কলোক থেকে পাওয়া আলোকতরংগগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে যে বর্ণালী পাওয়া যায় সেই বর্ণালীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে পরীক্ষা ক'রে আলোকপ্রেরক জ্যোতিষ্কের দূরত্ব, ওজন, আয়তন ও তার দেহতাপ নির্ধারণ করা হয় বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণাগারে। কিন্তু দূর জ্যোতিষ্কের যে ক্ষীণ আলোকতরংগ এসে পৌছোয় আমাদের পৃথিবীতে, তার সাহায্যে আমরা বেশির ভাগ নক্ষত্ররাশিকেই খালি চোখে দেখতে পাই না। তাই দূর জ্যোতিষ্ক থেকে বিচ্ছুরিত আলোকতরংগের সংবাদ জানার জন্য প্রয়োজন পড়ে বিরাট আকারের দূরবীণের। দূরবীণের দৃষ্টিশক্তি যত প্রখর করা যাবে তত দূরের জ্যোতিষ্করা ধরা দেবে আমাদের দৃষ্টিতে। সুতরাং বিশ্বলোকের প্রতিটি বাসিন্দার অস্তিত্ব ও ওজন জানবার চেষ্টায় বিজ্ঞানীকে গোড়াতেই নির্ভর করতে হয় আলোকতরংগের বেগের ওপর আর দূরবীণের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার ওপর। আলোকবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল, কিন্তু বিশ্বলোকের কোন প্রান্ত সীমায় এমনও তো জ্যোতিষ্ক থাকতে পারে যার আলোক আকাশের মহাসাগর পার হয়ে আজও এসে পৌছতে পারে নি আমাদের পৃথিবীতে। অথবা কোটী কোটী বৎসর আকাশ পথে বিচরণ ক'রে যখন কোন জ্যোতিষ্কের আলোক আমাদের পৃথিবীতে

এসে পৌঁছল তখন হয়ত সেই জ্যোতিষ্কের প্রকৃতি ও ওজনের কতই না রূপান্তর হয়ে গেছে, হয়ত অন্য কোন জ্যোতিষ্কের সংগে সংঘর্ষ ঘটিয়ে মহাকাশে তেজশক্তিরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এমনিতর কোন পরিবর্তন বা দুর্ঘটনা যদি ঘ'টে থাকে কোন জ্যোতিষ্কলোকে তা'হ'লে সেই খবর জানবার জন্য আমাদের কোটী কোটী বৎসর অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আলোকতরংগ সেই খবর আমাদের এনে দিলে তবে তো আমরা সেই দুর্ঘটনার সংবাদ জানব। এ ছাড়া দূরবীণের প্রখরতার বিষয়টিও কম প্রণিধানযোগ্য নয়।



গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ
(হিরাকুল নক্ষত্রলোকের অন্তর্গত)

কোটী কোটী নক্ষত্র নিয়ে কুণ্ডলী নীহারিকাগুলি গঠিত, কিন্তু এই নীহারিকাগুলি আবার এক একটি মহাজ্যোতিষ্কমণ্ডলী রূপে সংগঠিত হয়ে গ'ড়ে তুলেছে এক একটি নক্ষত্রের পরিবার। এমনিতর একশত কুণ্ডলী নীহারিকার সমষ্টিরূপে একটি মহাজ্যোতিষ্কমণ্ডলী দেখা যায় ধ্রুব নক্ষত্রের

দিকে। এই জ্যোতিষ্কলোকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। সুদূর নীহারিকা থেকে যে আলোক এসে পড়ে পৃথিবীতে, তার বর্ণালীর রেখাগুলিকে লাল আলোকতরংগের রেখার দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়। কেন এমন হয়? কারণ কোন আলোকময় পদার্থ যখন খুব দ্রুতবেগে বিচ্ছুরিত হয়, সে তরঙ্গ দীর্ঘতর হয়ে যায়, যার ফলে বর্ণালীর রেখাগুলি লাল আলোকের রেখার দিকে ঝুঁকতে থাকে। নীহারিকা থেকে আসা আলোকরশ্মির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে সুদূরের নীহারিকাগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক হাজার থেকে দশ হাজার মাইল বেগে দূরে স'রে যাচ্ছে। নীহারিকাদের এরূপ নিরন্তর দূরে স'রে যেতে দেখে বিজ্ঞানী এডিংটন অনুমান করেছেন আমাদের বিশ্বজগৎ আপনার গণ্ডীবদ্ধ সীমায় বন্দী হয়ে নেই। অবিরাম তার পরিধি বেড়ে চলেছে। এমনি ক'রে বেড়ে বেড়ে এই বিশ্বজগতের আয়তন যে কি বিরাট অতিকায় রূপ ধারণ করবে তা' কে বলতে পারে?

এই মহাজ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সীমানায় পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে দূরবীণের প্রখর দৃষ্টি। এর পরও কি আছে জ্যোতিষ্কলোকের বিস্তৃতি? দূরবীণের প্রখরতা না বাড়া পর্যন্ত এর যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত যত জ্যোতিষ্কের পরিচয় জানা গেছে তারা সকলেই (একমাত্র সৌরমণ্ডলের কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া) এক একটি জলন্ত গ্যাসীয় বস্তুর পিণ্ড। বিজ্ঞানী দি-সিটার (De-Sitter) এই সব জলন্ত বস্তুপিণ্ডগুলির মোট ওজনের একটা হিসেব করেছেন। আকাশের মহাসমুদ্রে দ্বীপের মত ছড়ান এই জ্যোতিষ্কগুলির তিনি সংখ্যা নির্ণয় করেছেন এবং গড় হিসেবে ধরছেন যে প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক ওজনে প্রায় সূর্যের সমান। সূর্যের ওজন ২ × ১০ গ্রাম। এই হিসেবে তিনি মহাবিশ্বের মোট পরিমাণ নির্ণয় ক'রে জানিয়েছেন যে আজ পর্যন্ত যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরিচয় জানা গেছে তাদের মোট ওজন সূর্যের প্রায় দশলক্ষ কোটী কোটী গুণ। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব পদার্থের মোট পরিমাণ প্রায় $২\cdot৫ \times ১০^{৫৫}$ গ্রাম। বিশ্ব-পদার্থের এই কল্পনাটিকে সুন্দর একটি তুলনা দিয়ে বোঝান যায়। একজন সাধারণ মানুষ একটি ইলেকট্রনের চেয়ে কোটী কোটী কোটী কোটী গুণ ভারী। সূর্য আবার মানুষের চেয়ে কোটী কোটী কোটী কোটীগুণ ভারী। দৃশ্যমান বিশ্বের ওজন আবার সূর্যের দশ লক্ষ কোটী কোটীগুণ ভারী। বিপুলাকার পৃথিবীর কাছে এক কণা বালুর অস্তিত্ব যেমন তুচ্ছ তেমনি এই অতিকায় মহাবিশ্বের

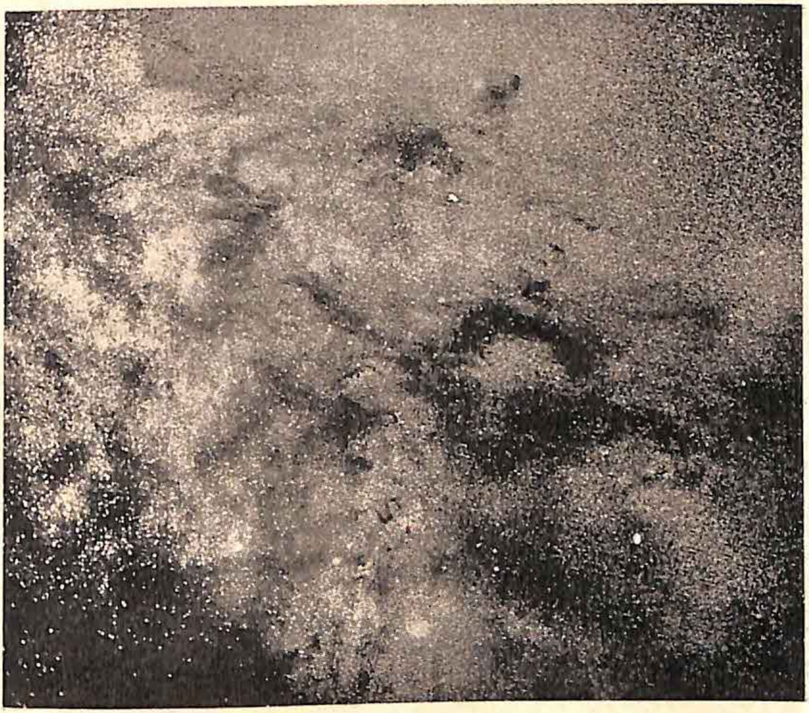
মোট পদার্থপুঞ্জের তুলনায় আমাদের বিরাট পৃথিবীর অস্তিত্বকে স্বীকার না করলেও কিছু আসে যায় না।

পদার্থের জন্ম ও মৃত্যু

বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত অতিকায় মহাবিশ্বের পরিচয় পেয়ে মানুষের ধারণাশক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। চির পুরাতন সেই প্রশ্নটি মানুষ আবার সাগ্রহে বিজ্ঞানীর কাছে তুলে ধরেছে। এই মহাবিশ্বের জন্ম হ'ল কি ক'রে? কবে হ'ল তার জন্ম? এই প্রশ্নের উত্তর আদি দিনেও যেমন রহস্যময় ছিল, আজও তেমনি রহস্যময় রয়ে গেছে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী বর্তমান কালের বিজ্ঞানীদের কাছে। একটা তুচ্ছ পরমাণুর জন্ম কি ক'রে হ'ল তা'ও যেমন বলতে পারেন না বিজ্ঞানীরা, তেমনি তাঁরা বলতে পারেন না বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ-রহস্য। অথচ বিশ্ব যে অনাদিকাল থেকে এমনি বিস্ময় জাগিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে মহাদেশের কোলে সে কথা মানতেও বিজ্ঞানীরা রাজি নন। গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকার সংগঠন যে ক্রমবিবর্তনের ধারায় নিত্য রূপান্তরিত হয়ে চলছে সেই চিরন্তন ধারার নীতিবৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলে একথা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না যে এই বিবর্তনের কোন আরম্ভকাল ছিল না। বিবর্তন যেদিন আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টির জন্মও সুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু কেমন ক'রে এই সৃষ্টির সূচনা হ'ল? আপনিই কি কোন মহাশক্তি স্বতঃস্ফূর্তিতে সংহতি লাভ ক'রে এই বিশিষ্ট আকার ও বিশিষ্ট সংগঠনের পদার্থময় জ্যোতিষ্কলোকে রূপান্তরিত হয়েছে? বিশ্বসৃষ্টির এরূপ স্বতঃজন্মের কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। বিশ্বজগৎ যদি স্বতঃজাত না হয় তা' হ'লে কি শক্তি-উত্তর কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব রয়েছে এই বিশ্বজগতে? সেই চৈতন্যই কি শক্তিকে রূপান্তরিত করছে পদার্থময় জ্যোতিষ্কলোকে? এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না বিজ্ঞান। কারণ বিজ্ঞানের এলাকা পদার্থ ও শক্তির জগৎ। পদার্থ ও শক্তির অন্তরালে চৈতন্যের অস্তিত্ব আছে কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা যায় নি। তাই সৃষ্টির জন্মতত্ত্ব আজও দর্শনের চার সীমানায় আটকা রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র জ্যোতিষ্কলোকের যে পরিধির মাপ সম্ভব হয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হিসেবে, বিংশ শতাব্দীতে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন বিরাট দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সেই বিশ্বের পরিধি শত শত গুণ প্রশস্ততর হয়ে গিয়েছে।

আজকের সব চেয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দূরবীণেও আমাদের সৌরলোকের গ্রহের মত গ্রহ অন্য কোন নক্ষত্রলোকে আছে কিনা তা ধরা পড়ে না। ভবিষ্যতে আরো তীক্ষ্ণ দূরবীণ আবিষ্কৃত হ'লে হয়ত দেখা যাবে বিশ্বলোকের বাসিন্দার সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়াছে—পরিধি আরও বিস্তৃততর হয়েছে। সুতরাং বিশ্বপদার্থের হিসাব নির্ণয় করতে যাওয়ার চেষ্টার গোড়াতেই কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। দূরবীণের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি এবং আলোকের সীমাবদ্ধ গতিবেগই এর জন্য দায়ী।



ছায়াপথ

জ্যোতিষ্কলোকের পরিচয় জানতে হ'লে প্রথমে শুরু করতে হবে আমাদের পৃথিবী থেকে। আমাদের পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত—সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যের মতো এমনি কোটি কোটী নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে আকাশে। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্র তার নাম প্রক্সিমা সেঞ্চুরি (Proxima Centuri), এবং পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব

৪·২৭ আলোক বৎসর। পৃথিবী থেকে যে নক্ষত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় তার নাম সিরাস। সিরাস পৃথিবী থেকে ৮·৬৫ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত।

জ্যোতিষ্কলোকের বাসিন্দারা কোটী কোটী যোজন দূরে অবস্থিত হওয়ায় তাদের দূরত্ব মাইল হিসেবে মাপা হ'লে এক একটি দূরত্বসংখ্যার পিঠে শূন্যের যে বোঝা বসবে তার হিসেব রাখা হবে এক দুরূহ ব্যাপার। তাই জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপা হয় মাইলে নয়, আলোক-বৎসরে। যেমনতর ক'লকাতা থেকে নিউইয়র্কের দূরত্ব মাপা হয় ইঞ্চিতে নয়, মাইলে। আলোক এক সেকেণ্ডে চলতে পারে ১৮৬,০০০ মাইল রাস্তা—সুতরাং এক বৎসরে চলতে পারে



কুণ্ডলী নীহারিকা

আটান্ন হাজার পাঁচশ কোটী মাইল (৫৮,৫০০০০০০০০০০ মাইল)। এই দূরত্বটিকে ধরা হয় এক আলোক-বৎসর রাস্তা। জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্ব মাপা হয় এই আলোক-বৎসরের পরিমাণ দিয়ে। আলোক-বৎসর কথাটির সংগে বৎসর শব্দটি থাকলেও এতে সময় বোঝায় না, বোঝায় দূরত্ব।

আলোক-বৎসরের দূরে দূরে অবস্থিত কোটী কোটী নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে আবার এক একটি নক্ষত্র পরিবার। সর্পকুণ্ডলীর মতো নক্ষত্রগুলি কুণ্ডলীর আকার পাকিয়ে রয়েছে ব'লে নক্ষত্রপরিবারের অনেকের নাম দেওয়া হয়েছে কুণ্ডলী নীহারিকা (spiral nebulæ)। আবার কোন কোন গোষ্ঠীর নক্ষত্রগুলি ভিড় ক'রে রয়েছে বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ (globular star cluster)। এক একটি নীহারিকার ব্যাস প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বৎসর। এবং প্রতিটি নীহারিকা গড়ে প্রায় ত্রিশকোটী সূর্য নিয়ে সংগঠিত। আমাদের পৃথিবী থেকে গড়ে তাদের দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ আলোক-বৎসর। সবচেয়ে দূরে যে নীহারিকা তার দূরত্ব প্রায় এককোটী চল্লিশ লক্ষ আলোক-বৎসর। এমনিতর লক্ষ লক্ষ নীহারিকা ছড়িয়ে আছে মহাদেশের বুকে। আমাদের সৌরমণ্ডল যে ছায়াপথে (milky way) অবস্থিত সেই ছায়াপথও একটি কুণ্ডলী নীহারিকার অন্তর্গত। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নীহারিকার দূরত্ব দশ লক্ষ আলোক-বৎসর। নাম তার এ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা।

গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জেও নক্ষত্রের সংখ্যা কম নয়। এক একটি পুঞ্জে রয়েছে গড়ে প্রায় দশলক্ষ নক্ষত্র এবং এদের ব্যাস প্রায় কয়েক শত আলোক-বৎসর। এই নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আমাদের ছায়াপথ থেকে প্রায় বিশ হাজার আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত।

এই মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্কপুঞ্জের অবিরাম বিবর্তনের ধারায় রূপান্তরিত হ'য়ে চলছে। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় একথা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বিবর্তনের কথা স্বীকার করলে, পরিণতির কথা কল্পনা করাও অসম্ভব নয়। জীবদেহের মত পদার্থময় জ্যোতিষ্কলোকের দুয়ারেও কি একদিন মৃত্যু এসে হানা দেবে? এ প্রশ্নটিই অবান্তর; কারণ জ্যোতিষ্কলোকের পদার্থ 'শক্তি'র সংহতি মাত্র। বিশ্বের মূলশক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তাই বিবর্তনের পরিণতিতে বিশ্বপদার্থের চিরবিনাশ হয়ে যাবারও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শক্তির চিরবিনাশ না হ'লেও লীলাময় বিশ্বজগতের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে বিশ্ব যে একদিন নিশ্চল পংগু হয়ে যাবে না তার কোন প্রমাণ নেই। পদার্থের পরিবর্তন ও রূপান্তরের আদি কারণ পদার্থ-অংগের বিভিন্ন ভাগের তাপবৈষম্য। এই তাপবৈষম্য দূর হয়ে যদি পদার্থের সমস্ত অংগে তাপ-সমতা এসে যায় তা হ'লে বিশ্ব নিশ্চল হয়ে পংগু হয়ে যাবে। এই বিশ্বের

তেজশক্তি অবিরাম দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। যেদিকে তাপ কম সেই দিকেই ছুটে চলছে তাপপ্রবাহ। এই নিয়ত তাপবিচ্ছুরণের ফলে বিশ্বজগৎ সুনিশ্চিত ভাবেই ক্রমশ তাপ-সাম্যের দিকে এগিয়ে চলছে। এই তাপ-সাম্যের প্রয়োগ যখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে—বিশ্বের কোন অংগেই তখন আর তাপবৈষম্য থাকবে না। বিশ্বজগৎ নিশ্চল হয়ে চিরদিনের মত পংগু হয়ে যাবে। কোন বিকারই থাকবে না লীলাময় বিশ্বপ্রকৃতির। প্রয়োজনের সংজ্ঞায় বিশ্বজগতের সে দিন মৃত্যু হবে : শুধু অবশিষ্ট থাকবে তাপসাম্যে নির্বিকার বিশ্বের সমগ্র মূলশক্তি। কিন্তু কোন্ কল্পনাতীত সুদূর ভবিষ্যতে আসবে বিশ্ব পদার্থের সেই চরম নিশ্চলতার দিন তার হিসেব দেওয়া আজও সম্ভব নয় বিজ্ঞানীর পক্ষে।

অজানা পদার্থ

ইতিহাসের আদি দিন থেকেই মানুষ পদার্থের স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেছে। নিতান্ত অসংস্কৃত মনেও প্রশ্ন জেগেছে—পদার্থের চরম স্বরূপ কি? কি দিয়ে গড়া এই মাটি জীব জন্তু উদ্ভিদ্‌ময় পৃথিবীর পদার্থ? মননশক্তির সংস্কৃতির সংগে সংগে মানুষের তীক্ষ্ণ মেধা বিচার ক'রে বলেছিল মাটি-জল-বাতাস-অগ্নি-আকাশ এই পঞ্চভূতে গড়া আমাদের অনুভূতি-গ্রাহ্য এই পদার্থময় জগৎ। বহু যুগ ধ'রে মানুষ পদার্থের আদি উপাদানরূপে এই পঞ্চভূতের অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে এসেছে। পঞ্চভূতের অণু পরমাণুই বিভিন্নরূপে সংঘবদ্ধ হয়ে গ'ড়ে তুলেছে এই বিচিত্র প্রকৃতি জগৎ। ইতিহাসের দীর্ঘকালের যাত্রাপথে মাত্র সেদিন বিজ্ঞ'নীর প্রত্যক্ষ গবেষণায় ধরা পড়েছে এই পঞ্চভূতের যথার্থ পরিচয়। পাঁচটি ভূত বা মৌলিক পদার্থে নয়, বিরানব্বুই মৌলিক পদার্থে গড়া এই বস্তু জগৎ। এই বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুই বহুরূপে সংগঠিত হয়ে বৈচিত্র্যের অজস্রতায় রহস্যময় ক'রে তুলেছে এই জগৎ ও প্রকৃতি।

বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থই বস্তুজগতের আদি উপাদান এই সংবাদ বিজ্ঞানলোক থেকে প্রচারিত হলে মানব মনীষা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল অন্তত একটা সত্যের সীমান্তে আসা গেল। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই মৌলিক পদার্থ আপনাদের কৌলীন্য ফেলল হারিয়ে। বিজ্ঞানীর অতৃপ্ত বীক্ষণে ধরা পড়ল বহু নয়, একটি মাত্র মূল উপাদান রয়েছে এই পদার্থময় জগতের সর্বাংগে। এই মূল উপাদান হ'ল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ দুটি বিপরীত

প্রকৃতিতে বিযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে পদার্থের মৌলিক স্বরূপ। এই বিপরীত প্রকৃতি—পজিটিভ বিদ্যুৎ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ—এর মৌলিক কণার নামকরণ হ'ল ইলেকট্রন, প্রোটন ও পজিট্রন ও মেসন। বিজ্ঞানলোকে আজ একথা সর্ববাদিসম্মত যে এই পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণাই পদার্থের আদি উপাদান। বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন সংগঠনে সন্নিবিষ্ট হয়ে এই পজিটিভ, নেগেটিভ বিদ্যুৎকণাগুলি গড়ে তুলেছে বিরানব্বইটি নমুনার পরমাণু। বিরানব্বইটি পদার্থপরমাণুর গুণাগুণ, প্রকৃতি ও ওজনের মাত্রা বেঁধে দিয়েছে এই পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ও সংগঠন-সৌকর্য। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ও সংগঠনের দাক্ষিণ্যে বিরানব্বুই রকমের পদার্থপরমাণু যে মৌলিকত্ব লাভ করেছে সেই উপজাত মৌলিকত্বের হাতেই রয়েছে জগৎ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যরহস্যের চাবিকাঠি। এই বিরানব্বুই জাতের পরমাণুরা পরস্পর দুইয়ে, দশে, হাজারে মিলে গ'ড়ে তুলেছে স্থূল পদার্থের আণবিক সংগঠন। বস্তুজগতের অজস্র পদার্থরাশির যে বহুরূপী পরিচয় আমরা প্রথমে লাভ করি তা পদার্থের আণবিক সংঘেরই পরিচয়। আণবিক সংঘের বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ ও স্বতন্ত্র সংবাদ আমরা পাই না। কারণ সংঘের স্থূল সংগঠনে পদার্থের আদি উপাদান এমনভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে যে বাহ্যত তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও দেখা যায় না পদার্থে।

পদার্থের অন্তিম স্বরূপের অনেক প্রশ্ন অনুত্তর রইলেও পদার্থের মূল উপাদান যে বিদ্যুৎ এবং মূল উপাদানের আকৃতি যে কণার মতো এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিজ্ঞানীদের ঐ বিশ্বাসের ভিত্তিও টিকলনা। গবেষণায় জানা গেল পদার্থের আদি উপাদান শুধু কণা নয়, তরংগও বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হয়েও একই উপাদানে কি ক'রে তরংগ ও কণারূপের সমন্বয়সাধন সম্ভবপর হবে? তরংগের কোথায় আছে পদার্থকণা? বিজ্ঞানী বললেন তরংগের মহাসাগরে কণার কোন নির্দিষ্ট আবাস নেই। কণা তরংগের সর্বত্রই থাকতে পারে। কিন্তু আবাস অনুসন্ধান করতে গেলে কোথাও পাওয়া যাবে না তার চিহ্ন। পদার্থের এমনি হেঁয়ালিরূপের অর্থ কি? এর অর্থ, মনুষ্য-অনুভূতির অভ্যস্ত কল্পনায় পদার্থের আদি উপাদানের একটি চিত্র দাঁড় করান কোন সময়েই আর সম্ভব হবে না। তাই আদি পদার্থের কণা-তরংগের যুগলরূপ আমাদের মানসলোকে মূর্তিমন্ত হয়ে উঠবে না কোন দিন। পদার্থের আদিরূপ শুধু যে মানব কল্পনার

বাইরেই চিরনির্বাসিত হ'ল তাই নয়, পদার্থের নবপরিকল্পনা বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেল মানুষের মনে। পদার্থের আদি উপাদান যদি তরংগই হয় তা' হ'লে জলতরংগের মত পদার্থতরংগ মহাবিশ্বের বুকে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না কেন ? পক্ষান্তরে পদার্থতরংগগুলি পরস্পর জোট বেঁধে কি ক'রেই বা অনুভূতিগ্রাহ্য স্থূল পদার্থরূপে ধরা দেয় মানুষের কাছে ? পর্দায় পরমাণুর অন্তঃস্পন্দন থেকে জন্ম হয় তেজতরংগের। এই তেজতরংগের প্রকৃতি হ'ল বিদ্যুৎ-চুম্বকী। কিন্তু তেজতরংগের প্রকৃতি জানা গেলেও পদার্থতরংগের প্রকৃতি আজও রয়েছে রহস্যাবৃত।

পদার্থের স্বরূপ বিদ্যুৎ-কণারূপ থেকে রূপান্তরিত হ'ল কণা-তরংগের যুগল রূপে। কিন্তু কণা-তরংগ রূপে যুক্ত হয়েও পদার্থ তার নিজস্ব কৌলীন্যের শেষচিহ্ন পদার্থের পদার্থতাটুকুও রক্ষা করতে পারল না। বিজ্ঞানী আইন-স্টাইন জানিয়ে দিলেন শক্তি ও পদার্থ দু'টি আলাদা জিনিষ নয়। এ বিশ্বের সব কিছুই শক্তির প্রকাশ। শক্তি ও পদার্থকে বিশ্বজগতের দু'টি মূল উপাদান রূপে যে কল্পনা এতদিন করা হয়েছে, তার গোড়াতে কোন যথার্থতা নেই। এ বিশ্বের সমগ্র আয়তন অখণ্ড শক্তিময়। শক্তিই বিশ্বের আদি এবং একমাত্র উপাদান। সংগে সংগে প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিক শক্তিই যদি এই বিশ্বের একমাত্র মৌলিক উপাদান তা'হ'লে পদার্থের মূল উপাদান বিদ্যুৎও শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু যে অখণ্ড ও আদি শক্তি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি করেছে তার অন্তিম পরিচয় কি ? কি ক'রে এই মহাশক্তি রূপান্তরিত হ'ল বিচিত্র পদার্থপুঞ্জে ? শক্তির অন্তিম রূপ বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অজানা।—কেন যে এই মহাবিশ্বের সর্বাংগে প্লাবিত মহাশক্তি স্থূল পদার্থে রূপান্তরিত হ'ল এবং কি ক'রে যে এই রূপান্তর সম্ভব হ'ল তা'ও বলতে পারে না বিজ্ঞান।

বর্তমান কাল পর্যন্ত পদার্থের অন্তিম স্বরূপ জানা না গেলেও বিজ্ঞানীদের মনে একটা আশা ছিল বিজ্ঞানের দ্রুত প্রগতির ফলে একদিন হয়ত আজকের অজানার অন্ধকার জানার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। মাত্র দু'শ বছরের সাধনায় বিজ্ঞান যদি এরূপ বিরাট সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে তা' হ'লে অনাগত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের প্রখর দৃষ্টির সামনে কি পদার্থের অন্তিম স্বরূপ চির অজানা থাকতে পারবে ? যুক্তিটি এক সময় আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করলেও আজকে যেন সেই ক্ষীণ আশাটিও স্তিমিত হয়েছে। পদার্থের স্বরূপ জানতে না পারার কারণ বিজ্ঞানীর অক্ষমতা নয়,—প্রকৃতিরই বিধান। কণা ও

তরংগের অখণ্ড যুগ্মমূর্তিরূপে পদার্থের অন্তিম স্বরূপ কোনদিনই বিজ্ঞানী জানতে পারবে না। শুধু যে কণা ও তরংগের যুগল মূর্তি একত্র মানসলোকে অনুধাবন করা অসম্ভব তাই নয়, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় কণা-তরংগের স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টাও প্রতিবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে বাধ্য। অথচ কণা ও তরংগের দ্বৈতরূপ যদি একই সংগে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না হ'ল তা'হ'লে পদার্থের অন্তিম স্বরূপ জানা যাবে কি করে? পদার্থের সূক্ষ্ম স্বরূপ যেমন জানার বাইরে, তেমনি বিশ্ব পদার্থের সমগ্র স্বরূপ জানাও মানুষের সাধ্যের বাইরে। 'সীমার মাঝে অসীম' দেশের এই কল্পনা আংশিক সত্য বটে, কিন্তু মানব অনুভূতির সীমাবদ্ধ পরিধির আয়ত্তের বাইরে। এই সসীম অথচ অনন্ত দেশের বুকে এবং অসীম কালের স্রোতে যে বিপুল পদার্থরাশি ছড়িয়ে আছে তার সংবাদ পায় বিজ্ঞানীরা আলোকের সহায়তায়। আলোকের গতিবেগের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না কোন গতিবেগ। তাই মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্ক-লোকের স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টাও আলোকের গতিবেগ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কে জানে বিশ্বের অনন্ত প্রান্ত থেকে আলোকতরংগ আমাদের পর্যবেক্ষণাগারে কোন দিন এসে পৌছবে কি না? যদি কোন দিন আলোকতরংগ এসে পৌছোয়ও তখনও সেই তরংগের জনক জ্যোতিষ্কটি অপরিবর্তিত থাকবে কি না? প্রকৃতির খেয়ালের জন্যই পদার্থের সূক্ষ্ম ও বিরাট স্বরূপ মানুষের কাছে থাকবে চির অজানা। শুধু স্থূল পদার্থলোকের গড় হিসাবের নীতি ও প্রকৃতির তথ্য ও সুশৃঙ্খল সৌকর্য হবে মানুষের বাহ্য জ্ঞানের বস্তু।

বস্তুজগতের অন্তিম রহস্য জানাই বিজ্ঞানের সাধনা। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানীরা এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা ক'রে এসেছেন। বিজ্ঞানীরা বস্তুর অন্তিম রূপের নানা 'মডেল' গঠন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গড়া বস্তুজগতের এই মডেল বস্তুজগতের সত্যিকার প্রতিরূপ কিনা সে কথা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। বস্তুর অন্তিম পরিচয় কণা বা তরংগরূপে স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া যায় না। কণা বা তরংগের কোন রূপই সম্পূর্ণ নয়। কণারূপে যদি বস্তুর পরিচয় মিলে খণ্ড খণ্ড রূপে, তরংগরূপে পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় ক্রমান্বয়ের ধারায়। কণা ও তরংগের প্রকৃতি ও গুণাগুন বিপরীতধর্মী। তথাপি পদার্থের অন্তিমরূপ অনুধাবনের জন্য কণা-তরংগের সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া বিজ্ঞানীদের সামনে অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু কণা-তরংগের রূপও অংকের প্রতীকে অভ্রান্ত বটে কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আজকের বিজ্ঞানীরা

কণা-তরংগবাদের সহায়তায় বস্তুর যে মডেল গঠন করেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো অন্য রকম আংকিক মডেল গঠনও সম্ভব হবে। কিন্তু কোন মডেলই পদার্থের অন্তিম রূপের বাস্তব পরিচয় দেবে না। কণা বা তরংগ অথবা একই সংগে কণা-তরংগরূপ পদার্থের আদি পরিচয় কিনা, সে কথা জানার চেয়ে একথা বলা অনেক যুক্তিসংগত যে কণা বা তরংগের কল্পনা ক'রে পদার্থের অন্তিমরূপ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন মাত্র বিজ্ঞানীরা।

আধুনিক বিজ্ঞান পদার্থের স্বরূপ জানার প্রচেষ্টায় আজ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এক সীমা টেনে দিয়েছে। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুর অন্তিম রূপের সত্যিকার কোন মডেল বা মূর্ত্তি গড়া সম্ভব নয়। পদার্থের অন্তিম প্রকৃতি ও পরিচয় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে। কল্পনায়ও বস্তুর অন্তিম স্বরূপের চিত্র আঁকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 'প্রকৃতে'র সন্ধান নয়, 'প্রকৃতে'র প্রকাশ এবং পরিচয় জানাই বিজ্ঞানের কাজ। 'প্রকৃতে'র অন্তিম স্বরূপ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ধরা পড়বে না কোন দিন। বিজ্ঞানী শুধু প্রকৃতের প্রকাশভংগী এবং সে প্রকাশকে মানুষের কাজে লাগাবার সাধনায় গবেষণাগারে মগ্ন হয়ে থাকবেন।

পদার্থের স্বরূপ কি? এই আদি প্রশ্নের আবার নূতন ক'রে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন পড়েছে। এতদিন বস্তু বা পদার্থ অর্থাৎ ইংরেজী 'matter'এর যে কল্পনা ছিল আজকের বিজ্ঞান সে কল্পনাকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছে। পদার্থ বলতে মানুষের মনে যে কল্পনা জাগে সে কল্পনার আজ আর কোন মূল্য নেই। বস্তু এবং বস্তুবাদের কল্পনাও আজ তাই নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলবার প্রয়োজন পড়েছে। বিজ্ঞান আজ একথা স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছে যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তিম রহস্য জানা বিজ্ঞানীর পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান পদার্থের আদি স্বরূপ জানবার সাধনায় যে সমস্ত নূতন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে তা' শুধু বিজ্ঞান নয় দর্শনের ক্ষেত্রেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। নব বিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে দর্শনের ক্ষেত্রেও অনেক পুরোনো তত্ত্ব পরিত্যক্ত হবে এবং নূতন সত্যের সন্ধানলাভ সম্ভব হবে। অন্তিম স্বরূপ জানতে গিয়ে বিজ্ঞানী পদার্থের আজ এক অভিনব পরিচয় লাভ করেছেন। এই নব পরিচয় প্রকৃতির কোন্ অজানা দুয়ার খুলে দেবে বিজ্ঞানীর কাছে, কে জানে?